মাধ্যমিক
কম্পিউটার শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম–দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা

[নবম–দশম শ্রেণী]

রচনা
মোস্তফা জব্বার

সম্পাদনা
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য ‘‘শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স’’ গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাবিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায় এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

কম্পিউটার শিক্ষা অতি দ্রুত অগ্রসরমান একটি বিষয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়টিকে আমরা এমনভাবে উপস্থাপন করেছি যাতে শিক্ষার্থীরা এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে তাদের অর্জিত বিদ্যা কাজে লাগাতে পারে। এমন যদি হয়, যে কেউ মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি অধ্যায়ন করার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়, তবে তাও যেন সম্ভব হয় তার প্রতি লক্ষ রেখে বিষয়টির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।

কম্পিউটার প্রযুক্তি নিয়ত পরিবর্তনশীল। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের মুহূর্তেও কম্পিউটারজগতে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে যা এ পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি। এটি সম্ভবও নয়। কারণ কম্পিউটারের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অত্যন্ত কঠিন। এই কথাটি স্মরণ রেখে বিষয়টির শেখানোর সময় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সর্বশেষ তথ্যাদি প্রমাণের ব্যাপারে শিক্ষকরা যত্নবান হবেন বলে আমি আশা রাখি।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	কম্পিউটার ও কম্পিউটারের ইতিহাস	০১
দ্বিতীয়	কম্পিউটার সংগঠন	২১
তৃতীয়	কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেম	৩৬
চতুর্থ	সংখ্যা পদ্ধতি ও কম্পিউটার লজিক	৫৩
পঞ্চম	ওয়ার্ড প্রসেসিং	৭৫
ষষ্ঠ	স্প্রেডশিট এ্যানালাইসিস	৮২
সপ্তম	ডাটাবেজ	৮৮
অষ্টম	কম্পিউটার প্রোগ্রামিং	৯৩
নবম	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট	১১২
দশম	কম্পিউটারের প্রয়োগ ও মাল্টিমিডিয়া	১২৮

ব্যবহারিক অংশ

একাদশ	ব্যবহারিক	১৩৯
দ্বাদশ	অপারেটিং সিস্টেম	১৪১
ত্রয়োদশ	মাইক্রোসফট ওয়ার্ড	১৪৭
চতুর্দশ	স্প্রেডশিট এ্যানালাইসিস	১৭২
পঞ্চদশ	ডাটাবেজ	১৮৭
ষষ্ঠদশ	কম্পিউটার প্রোগ্রামিং	২০০

প্রথম অধ্যায়

কম্পিউটার ও কম্পিউটারের ইতিহাস

কম্পিউটার কী?

'কম্পিউট' (Compute) শব্দটি থেকেই কম্পিউটার (Computer) শব্দ তৈরি হয়েছে। বলা হয়, যে কম্পিউট করে সেই (মানুষ বা যন্ত্রই) কম্পিউটার। ১৩৭৫ থেকে ১৪২৫ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে 'কম্পিউট' (Compute) শব্দটির উৎপত্তি হয়। এই শব্দের প্রাচীন অর্থ হিসাব করা, পরিমাপ করা, গণনা করা ও ধারণা করা ইত্যাদি। সেই হিসাবে যিনি বা যে যন্ত্র গণনা, হিসাব, ধারণা ও পরিমাপ জাতীয় কাজ করে তাকে কম্পিউটার বলা যেতে পারে। এক সময়ে কম্পিউটার বলতে মানুষকে বোঝানো হত। পরে ক্যালকুলেটর বা গণনা করার যন্ত্র কম্পিউটার হিসেবে সমধিক পরিচিত হতে থাকে। তবে বর্তমানে কম্পিউটার বলতে আমরা একটি এমন ডিজিটাল যন্ত্রকে বুঝি যা প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। কম্পিউটার হলো "programmable digital electronic device." অন্যভাবে বলা হয়, A computer is a machine that manipulates data according to a list of instructions. বাংলাদেশের কপিরাইট আইনে কম্পিউটারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে, "কম্পিউটার অর্থে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক, ম্যাগনেটিক, ইলেকট্রোমগেনেটিক, ডিজিটাল বা অপটিক্যাল বা অন্য কোনো পদ্ধতির ইমপালস ব্যবহার করিয়া লজিক্যাল বা গাণিতিক যে কোনো একটি বা সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে এমন তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম" কে বোঝায়। সেই কারণে কম্পিউটার কেবলমাত্র গণনা, পরিমাপ বা হিসাব করার যন্ত্র নয়। কম্পিউটার কার্যত এখন সকল ধরনের কাজ করে বা কাজের প্রক্রিয়া করে।

কম্পিউটার ও এর কাজ করার বৈশিষ্ট্য

কম্পিউটারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, এই যন্ত্রটি প্রোগ্রামযোগ্য। একে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে সে নির্দেশ অনুসারে কাজ করে ও ফলাফল প্রদান করে। আমরা এক সময়ে গাণিতিক সংখ্যাকে ক্যালকুলেটরে প্রদান করে তার ফলাফল (যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ) বের করতাম। ক্যালকুলেটরের চেয়েও বড় হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করার জন্য কম্পিউটার যন্ত্রের ব্যবহার হতে শুরু করে। তবে এখন কম্পিউটার কেবল অঙ্কের হিসেব করে না। এই যন্ত্র সকল তথ্য উপাত্তকেই প্রক্রিয়া করে। কম্পিউটারের আরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এই যন্ত্রটি বহুমুখী কাজের, বহু কাজ একসাথে করার এবং অনেক যন্ত্রের একক বিকল্প হিসেবে কাজ করে। দিনে দিনে এটি আর কেবল যন্ত্র থাকছে না, এটি হচ্ছে প্রযুক্তি, যা অনেক যন্ত্র বা প্রযুক্তির অংশ হচ্ছে। ক্রমশ এটি হয়ে উঠেছে অপরিহার্য এক টেকনোলজি।

এই যন্ত্রটির কাজ করার প্রধান ৩টি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– ক. দ্রুত গতিতে কাজ করা, খ. নির্ভুলভাবে কাজ করা এবং গ. স্মৃতিতে কাজ জমা রেখে পরবর্তীতে সেই কাজ ব্যবহার করা বা জমা রাখা অসমাপ্ত কাজ পরবর্তীতে সমাপ্ত করা।

ক. দ্রুত গতিতে কাজ করা : একটি অঙ্ক বা হিসেবের কাজ যদি বড় এবং জটিল হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে হাতেকলমে এ রকম একটি অঙ্ক বা হিসেবের কাজ করতে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। এ ধরনের একটি অঙ্ক বা হিসেবের কাজ কম্পিউটার হয়তো এক সেকেন্ডের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে করে দিতে পারে।

আমরা সময়ের হিসাব করি সেকেন্ড, মিনিট এবং ঘণ্টার এককে। কিন্তু, কম্পিউটার এত দ্রুত কাজ করতে পারে যে শুধু সেকেন্ড হিসেবে এর গতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কম্পিউটার একটি কাজ এক সেকেন্ডের একশত কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে করতে পারে।

সেকেন্ডের ক্ষুদ্রতম একককগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ–

১ মিলি সেকেন্ড = ১ সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ।

১ মাইক্রো সেকেন্ড = ১ সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

১ ন্যানো সেকেন্ড = ১ সেকেন্ডের একশত কোটি ভাগের এক ভাগ।

১ পিকো সেকেন্ড = ১ সেকেন্ডের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ।

খ. নির্ভুলভাবে কাজ করা : কম্পিউটার কাজ করে তার ব্যবহারকারীর দেওয়া তথ্য, উপাত্ত এবং নির্দেশের ভিত্তিতে। ব্যবহারকারীর দেওয়া তথ্য, উপাত্ত এবং নির্দেশ সঠিক হলে কম্পিউটার নির্ভুল ফল প্রদান করবে। ব্যবহারকারী ভুল তথ্য প্রদান করলে কম্পিউটার সঠিক ফল দেবে না। যেমন– ব্যবহারকারী ৬-কে ২ দিয়ে গুণ করার নির্দেশ না দিয়ে ভুলক্রমে ভাগ করার নির্দেশ দিল। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটার ৬-কে ২ দিয়ে ভাগ করে ফল দেখাবে ৩। এ ভুলের জন্য ব্যবহারকারী নিজেই দায়ী। কম্পিউটারে কোনো প্রকার যান্ত্রিক ত্রুটি না থাকলে এবং ব্যবহারকারীর দেওয়া তথ্য, উপাত্ত এবং নির্দেশ সঠিক হলে কম্পিউটার অবশ্যই নির্ভুল ফল প্রদান করবে।

গ. স্মৃতি : কম্পিউটার ছাড়া অন্যান্য কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সীমিত স্মৃতি থাকে। কিন্তু, কম্পিউটারের স্মৃতির ধারণ ক্ষমতার সঙ্গে এ সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রের স্মৃতির তুলনা করা যায় না। কম্পিউটারের সহায়ক স্মৃতিতে বিপুল পরিমাণ তথ্য ধারণ করে রাখা যায়। বিপুল পরিমাণ লেখালেখির কাজ, হিসেব-নিকেশের কাজ, শব্দ ও ছবি, চলমান চিত্র বা ভিডিও, কার্টুন ইত্যাদি কম্পিউটারের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা যায় বা জমা করে রাখা যায়। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী স্মৃতিতে জমা করে রাখা এ সব বিষয় ব্যবহার করা যায়। স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা কোনো অসমাপ্ত কাজ পরবর্তীতে স্মৃতি থেকে তুলে এনে সমাপ্ত করে আবার স্মৃতিতে রেখে দেওয়া যায়। কম্পিউটারের সঙ্গে স্মৃতিশক্তি যুক্ত হওয়ার পর অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র থেকে কম্পিউটার বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠতে থাকে।

নির্বোধ যন্ত্র : কম্পিউটার অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে অনেক বড় এবং জটিল হিসেব-নিকেশের কাজ নির্ভুলভাবে করতে পারলেও কম্পিউটারের নিজের কিন্তু কোনো বুদ্ধি নেই। কম্পিউটার নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো কাজই করতে পারে না। মানুষের তৈরি করে দেওয়া নির্দেশমালা অনুসরণ করেই কম্পিউটার সব রকমের কাজ সম্পন্ন করে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া নির্দেশমালার অতিরিক্ত একটি কাজও কম্পিউটার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে করতে পারে না। কম্পিউটারের কিছু কিছু কাজ দেখে মনে হতে পারে এ সব কম্পিউটার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করছে। কিন্তু মোটেও তা নয়। যে সকল কাজ দেখে কম্পিউটারকে বুদ্ধিমান মনে হয় সে সব কাজের নির্দেশমালাও আসলে মানুষের তৈরি করে দেওয়া। একই রকম কাজ একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলেই কম্পিউটার আর করতে পারবে না। কারণ, মানুষের তৈরি করে দেওয়া যে সকল নির্দেশমালার ভিত্তিতে কাজ করে সে সব নির্দেশমালা কম্পিউটারের স্মৃতিতে জমা থাকে। স্মৃতিতে জমা থাকা নির্দেশমালার সঙ্গে মিল খুঁজে না পেলে কম্পিউটার কোনো তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারে না। কাজেই, অনেক গুণে গুণী হওয়া সত্ত্বেও কম্পিউটার অন্যান্য যন্ত্রের মতোই নির্বোধ।

কম্পিউটারের সঙ্গে অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের পার্থক্য

কম্পিউটারের সঙ্গে অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যে কোনো একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র দিয়ে প্রধানত একটিমাত্র কাজ করা যায়। পক্ষান্তরে, একটি কম্পিউটার দিয়ে অনেক রকম কাজ করা যায়। আমাদের পরিচিত ইলেকট্রনিক গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে টেলিভিশন, রেডিও, ভিসিআর, ভিসিডি, ক্যালকুলেটর, ফ্যাক্স ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

– একটি টেলিভিশনে শুধু বিভিন্ন টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা অনুষ্ঠান দেখা যায়।

– একটি রেডিওতে শুধু বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা অনুষ্ঠান শোনা যায়।

– একটি ভিসিডি প্লেয়ার দিয়ে শুধু ভিসিডিতে ধারণ করা বিষয় প্লে করা যায়।
– ভিসিআর দিয়ে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান রেকর্ড করা যায় এবং পরবর্তীতে দেখা যায়।
– একটি ক্যালকুলেটর দিয়ে শুধু গণনার কাজ করা যায়।
– একটি ফ্যাক্স মেশিন দিয়ে শুধু ফ্যাক্স প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

পক্ষান্তরে, একটি কম্পিউটারের সাহায্যে বর্ণিত সবগুলো কাজ করা যায় এবং এ সব ছাড়াও আরও অনেক প্রকার কাজ করা যায়।

কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের মধ্যে পার্থক্য

কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের মধ্যেকার পার্থক্য ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। মোবাইল ফোন শুরুতে তারবিহীন টেলিফোন হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে। আকারে ছোট হওয়ায় পকেটে বা হাতে নিয়ে চলাফেরা করা যায়। সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় এবং নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে দাম কমে আসায় মোবাইল ফোন আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে। এখন সকল শ্রেণীর মানুষের হাতেই মোবাইল ফোন দেখা যায়।

শুরুতে তারবিহীন টেলিফোন হিসেবে গুরুত্ব লাভ করলেও ক্রমান্বয়ে মোবাইল ফোনের সঙ্গে একটি একটি করে সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে। এখন মোবাইল ফোনে দেশে-বিদেশে কথা বলা ছাড়াও খবর দেখা ও শোনা যায়, বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, স্থির ও চলমান ছবি তোলা যায় ও দেখা যায়, গান রেকর্ড করা যায় ও শোনা যায়, গেম খেলা যায়, ছোট-খাটো হিসেবের কাজও করা যায়। কোনো কোনো মোবাইল সম্পূর্ণ কম্পিউটারের কাজ করতে পারে। মোবাইল ফোনের সঙ্গে নতুন নতুন সুযোগ যুক্ত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে পামটপ কম্পিউটার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ইংরেজি পাম (Palm) শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতের তালু। পামটপ কম্পিউটার হচ্ছে হাতের তালুতে রেখে ব্যবহারযোগ্য কম্পিউটার। কিন্তু, পামটপ কম্পিউটার বিদ্যমান কম্পিউটারের বিকল্প হিসেবে গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি। ফলে পামটপ কম্পিউটার তৈরি ও বাজারজাত করার উদ্যোগ তেমন সফল হয়নি। মোবাইল ফোন হয়তো এক সময় পামটপ কম্পিউটারের মতো একটি অবস্থানে পৌঁছতে পারে। অনেকে এসবকে পিডিএ ফোন বা স্মার্টফোন বলেন।

কম্পিউটারের কাজ করার পদ্ধতি

কম্পিউটার দিয়ে কোনো কাজ করানোর জন্য কম্পিউটারকে সেই কাজের তথ্য-উপাত্ত প্রদান করতে হবে। তথ্য-উপাত্ত দিয়ে কী করতে হবে সে বিষয়ে কম্পিউটারকে নির্দেশ দিতে হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তকে ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করে কম্পিউটার ফল প্রদান করে। অর্থাৎ, কম্পিউটারের কাজ করার ধাপ হচ্ছে ৩টি। ক. ব্যবহারকারীর দেওয়া তথ্য-উপাত্ত ও নির্দেশ গ্রহণ করা (Input), খ. তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করা এবং গ. প্রক্রিয়াজাত তথ্য প্রদান বা প্রকাশ করা (Output)। কম্পিউটারের এই তিন পর্বে বিভক্ত কাজের পদ্ধতি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন–

ক. ধরা যাক, একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাঁর টেবিলে বসে কাজ করছেন। পিয়ন এসে তাঁর বাম পাশের একটি পেপার ট্রেতে কিছু নথি, চিঠিপত্র বা অন্য কোনো কাগজ রেখে গেল। এটা হল ইনপুট (Input)।

খ. প্রধান শিক্ষক তাঁর বাম পাশের ট্রে থেকে ইনপুট হিসেবে প্রাপ্ত নথি, চিঠিপত্র নিয়ে পড়লেন, চিন্তা করলেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিচার-বিশ্লেষণ করলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতামত লিখলেন। অর্থাৎ তিনি প্রাপ্ত তথ্য (Input) প্রক্রিয়াকরণ (Processing)-এর কাজ করলেন। তিনি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মতামত প্রদানের কাজটি করলেন মাথা খাটিয়ে।

গ. প্রধান শিক্ষক তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতামত লিপিবন্ধ করার পর নথি বা চিঠিপত্র ডান দিকের পেপার ট্রেতে রেখে দিলেন। এটি হল আউটপুট (Output)।

- অসমাপ্ত কাজের নথিগুলো কক্ষের ফাইল কেবিনেটে তুলে রাখলেন।

ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যবর্তী পর্বে প্রধান শিক্ষকের মাথা খাটিয়ে কাজ করার অংশকে কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (Central Processing Unit=CPU)-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটকে সংক্ষেপে সিপিইউ (CPU) বলা হয়। CPU-এর প্রধান দুটি অংশ হচ্ছে র‍্যাম (RAM=Random Access Memory) বা অস্থায়ী স্মৃতি এবং রম (ROM=Read Only Memory) বা স্থায়ী স্মৃতি।

অস্থায়ী স্মৃতি যখন যে বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং যতটুকু সময় ধরে কাজ করে, তখন এবং ততটুকু সময়ের জন্যই ঐ বিষয়টি মনে রাখে। কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অংশের স্মৃতি একেবারে শূন্য হয়ে যায়। এজন্য একে অস্থায়ী স্মৃতি বলা হয়।

পক্ষান্তরে, স্থায়ী স্মৃতি পরিচিত কিছু দেখলেই তা শনাক্ত করতে পারে, পড়তে পারে এবং চেনা বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারে। স্থায়ী স্মৃতিতে বিদ্যমান কোনো বিষয় মুছে ফেলা যায় না। এ জন্যই একে স্থায়ী স্মৃতি বলা হয়।

কম্পিউটারের তথ্য-উপাত্ত ও নির্দেশ সরবরাহ করা হয় ইনপুট যন্ত্রের মাধ্যমে এবং ফল পাওয়া যায় আউটপুট যন্ত্রের মাধ্যমে।

কম্পিউটারের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা তথ্য-উপাত্ত এবং ফল হিসেবে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত জমা করে রাখা হয় ডিস্কে বা অন্যান্য মজুদ যন্ত্র বা স্টোরেজ ডিভাইসে (Storage Device)।

উপরের উদাহরণে ইনপুট হিসেবে আসা বা আউটপুট হিসেবে পাওয়া নথি বা চিঠিপত্র মজুদ (Storage) করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ফাইল কেবিনেট। ফাইল কেবিনেটে আবার কয়েকটি ড্রয়ার থাকে। একেক ড্রয়ারে একেক ধরনের নথি রাখা হয়। এতে পুনরায় কাজের সময় ঐ সব নথি খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। কম্পিউটার ডিস্কেও এভাবে তথ্য সাজিয়ে রাখতে হয়। কম্পিউটারে প্রতিটি নথিকে এক একটি ফাইল (File) হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং ড্রয়ারের ভূমিকা পালন করে ফোল্ডার (Folder)। একই ধরনের ফাইলগুলো একটি ফোল্ডারে রেখে দিলে প্রয়োজনে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।

কম্পিউটারের প্রকারভেদ ও তার বৈশিষ্ট্য

কাজ করার পদ্ধতির দিক থেকে কম্পিউটার মূলত তিন প্রকার। যথা– এনালগ কম্পিউটার (Analog Computer), ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer) এবং হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)।

এনালগ কম্পিউটার : এনালগ কম্পিউটার (Analog Computer) কাজ করে পরিমাপন (Measuring) পদ্ধতিতে। যেমন– বিদ্যুতের তারের ভোল্টেজের ওঠা-নামা, কোনো পাইপের ভেতরের বাতাস বা তরল পদার্থের চাপ কম-বেশি হওয়া, বাতাসের প্রবাহ ও চাপ পরিবর্তিত হওয়া ইত্যাদি পরিমাপনের ক্ষেত্রে এনালগ কম্পিউটার দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী কাজ করতে পারে। এনালগ কম্পিউটারের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হিসেবে গাড়ির গতিবেগ প্রদর্শনের কাঁটা বা মিটারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গাড়ির গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাটি উচ্চতর গতি নির্দেশক সংখ্যার

ঘরগুলো অতিক্রম করে যায়। আবার গাড়ির গতি কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাটি ক্রমান্বয়ে নিম্নতর গতি নির্দেশক সংখ্যার ঘরের দিকে নেমে আসতে থাকে। এটাই হচ্ছে এনালগ কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্য– পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করা। বিভিন্ন প্রকার শিল্প-কারখানায় তাপ, চাপ ইত্যাদি পরিমাপনের জন্য এনালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। এনালগ কম্পিউটারের ফলাফল প্রদর্শিত হয় পরিমাপন কাঁটা, প্রিন্টার, ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিটের মাধ্যমে। প্লটারের সাহায্যে মুদ্রিত আকারে এনালগ কম্পিউটারের কাজের ফলাফল পাওয়া যায়। এনালগ কম্পিউটারের প্রসেসর নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা হয়। ফলে, এক ধরনের কাজে ব্যবহৃত এনালগ কম্পিউটার দিয়ে সাধারণত অন্য ধরনের কাজ করা যায় না।

ডিজিটাল কম্পিউটার : ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer) কাজ করে বাইনারি সংখ্যার মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশ (Instruction)-এর ভিত্তিতে। ডিজিটাল কম্পিউটারের কাজ করার ধরন হচ্ছে অগ্রসরমাণ ও পর্যায়ক্রমিক (Progressive and Sequential)। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত মাইক্রোকম্পিউটার বা ডেস্কটপ কম্পিউটারগুলো হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার। ডিজিটাল কম্পিউটার দিয়ে বহুমুখী কাজ করা যায়। ডিজিটাল কম্পিউটার শূন্য (০) এবং এক (১) এ দুটি বাইনারি সংখ্যা দিয়ে লেখালেখি ও হিসেব-নিকেশের কাজ থেকে শুরু করে ছবি সম্পাদনা ও জটিল স্থাপত্য ও নির্মাণ কাজের নক্সা তৈরির কাজ পর্যন্ত করে থাকে। ডিজিটাল কম্পিউটারের ফলাফল সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয় মনিটরের পর্দায়। এ ফলাফল বা আউটপুট প্রিন্টারের সাহায্যে মুদ্রিত আকারে নেওয়া যায়, ইন্টারনেটে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়, বিভিন্ন প্রকার ডিস্কে কপি করে অন্য কোনো ব্যবহারকারী বরাবর সরবরাহ করা যায়।

হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer) : এনালগ কম্পিউটার এবং ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলির সমন্বয়ে গঠন করা হয় হাইব্রিড কম্পিউটার। হাইব্রিড কম্পিউটার হচ্ছে এনালগ এবং ডিজিটাল উভয় পদ্ধতির সমন্বয়। হাইব্রিড কম্পিউটারে সাধারণত উপাত্ত সংগৃহীত হয় এনালগ প্রক্রিয়ায়। সংগৃহীত উপাত্ত সংখ্যায় রূপান্তরিত করে ডিজিটাল অংশে প্রেরণ করা হয়। ডিজিটাল অংশ প্রাপ্ত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর ফলাফল প্রদান করে। উদাহরণ হিসেবে হাসপাতালে ব্যবহৃত হাইব্রিড কম্পিউটারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রোগীর রক্ত চাপ, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, শরীরের তাপ ইত্যাদির উপাত্ত এনালগ অংশের সাহায্যে গ্রহণ করার পর উপাত্তগুলি ডিজিটাল কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য সংখ্যা সংকেতে রূপান্তরিত হয়ে ডিজিটাল অংশে স্থানান্তরিত হয়। ডিজিটাল কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণ/বিশ্লেষণ করে রোগীর বর্তমান অবস্থা ফলাফল বা আউটপুট আকারে তুলে ধরে। এ ছাড়া ক্ষেপণাস্ত্র, নভোযান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও হাইব্রিড কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটারের শ্রেণী বিভাগ

কাজের দক্ষতা এবং আকারের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটার প্রধানত ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন– সুপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনিফ্রেম কম্পিউটার এবং মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার।

সুপার কম্পিউটার : সুপার কম্পিউটার (Super Computer) হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী, ব্যয়বহুল এবং সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন কম্পিউটার। সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং জটিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাজ করা যায়। এ ধরনের কাজ অন্য কোনো শ্রেণীর কম্পিউটারের সাহায্যে করা সম্ভব নয়। মহাকাশ গবেষণা, পরমাণু শক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক ও উন্নততর গবেষণার কাজ সুপার কম্পিউটার ছাড়া আশানুরূপভাবে পরিচালনা করা যায় না। বর্তমানে ব্যবহৃত সুপার কম্পিউটারগুলিতে কয়েক হাজার প্রসেসর একই সঙ্গে কাজ করে এবং প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি বৈজ্ঞানিক/গাণিতিক বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদন করে। আমেরিকা ও জাপানসহ বিশ্বের অনেক দেশ সুপার কম্পিউটার তৈরি করে থাকে।

আবহাওয়া গবেষণা ও আবহাওয়া বার্তা অনুধাবনের জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellite), বিমান ও ভূ-কেন্দ্রের মাধ্যমে ভূমন্ডলীর পরিবেশ (Atmosphere) এবং আবহাওয়ার উপাত্ত সংগ্রহ করে ইনপুট হিসেবে সুপার কম্পিউটারে প্রদান

করা হয়। সুপার কম্পিউটারে বিদ্যমান প্রোগ্রামের সাহায্যে এ সব উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ হয়ে ফলাফল বা আউটপুট প্রদর্শিত/মুদ্রিত হয়।

সুপার কম্পিউটার অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ কারণেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ সব কম্পিউটার ক্রয় বা ব্যবহারের কথা ভাবা যায় না। সরকারিভাবে এবং খুব বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কেবল সুপার কম্পিউটার ক্রয় ও ব্যবহার করা সম্ভব। বাংলাদেশে কোনো সুপার কম্পিউটার নেই। ভারত 'পরম' নামে একটি সুপার কম্পিউটার নিজেরাই তৈরি করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করছে।
জুলাই ২০০৮ সময়কালে বিশ্বের দ্রুততম সুপার কম্পিউটার ছিল আইবিএম রোডরানার। এটি আসলে ৪০টি প্রসেসর সংবলিত ৩২৪০টি কম্পিউটারের গুচ্ছ।

মেইনফ্রেম কম্পিউটার : সুপার কম্পিউটারের চেয়ে তুলনামূলক কম শক্তিশালী কম্পিউটার হচ্ছে মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer)। মেইনফ্রেম কম্পিউটার বিপুল পরিমাণ উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাত্ত বিশ্লেষণ ও গাণিতিক কাজ মেইনফ্রেম কম্পিউটারের সাহায্যে দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা যায়। তবে, অফিস-আদালত, বড় বড় শিল্প-কারখানা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ এবং জটিল তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজের জন্যই সাধারণত মেইনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

মেইনফ্রেম কম্পিউটার

মেইনফ্রেম কম্পিউটারে মূল কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের সঙ্গে অনেকগুলি টার্মিনাল যুক্ত করে একই সঙ্গে অনেক ব্যবহারকারী বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারেন। এ কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রকার এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায়। এ ছাড়া উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করেও প্রয়োজনীয় সব ধরনের কাজ করা যায়।
বাংলাদেশে প্রথম মেইনফ্রেম কম্পিউটার স্থাপিত হয় ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে। এরপরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মেইনফ্রেম কম্পিউটার স্থাপিত হয়। আইবিএম, ইউনিসিস, হিউলেট প্যাকার্ড ইত্যাদি কোম্পানি মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে।

মিনিফ্রেম কম্পিউটার : মিনিফ্রেম কম্পিউটারের ব্যবহার এখন আর নেই। মেইনফ্রেম কম্পিউটার এবং মিনিফ্রেম কম্পিউটার (Miniframe Computer)-এর মধ্যে কাজের ধরন ও প্রক্রিয়াগত দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। মেইনফ্রেম কম্পিউটারের চেয়ে মিনিফ্রেম কম্পিউটারের কাজের ক্ষমতা ও কাজের গতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কিন্তু মেইনফ্রেম কম্পিউটারের মতো মিনিফ্রেম কম্পিউটারেও একসঙ্গে অনেক ব্যবহারকারী কাজ করতে পারতেন। মিনিফ্রেম কম্পিউটারও ছিল বহুমুখী ব্যবহারের কম্পিউটার। অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ও বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মিনিফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করা হত। উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে শিল্পকারখানার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক-বীমার দ্রুত ও তাৎক্ষণিক হিসেব নিষ্পন্ন করার কাজে মিনিফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করা হত।

মাইক্রোকম্পিউটার : মাইক্রোকম্পিউটার (Microcomputer) হচ্ছে ছোট আকারের কম্পিউটার। এক ব্যক্তি একটি কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন। এ জন্য মাইক্রোকম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলা হয়। মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটারের ব্যবহার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার প্রযুক্তি সাধারণ স্তরের মানুষের ব্যবহারের আওতায় এসেছে। অফিস-আদালত, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত

প্রয়োজন ইত্যাদি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাজে এখন মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইক্রোকম্পিউটার প্রধানত একক প্রসেসর (Uniprocessor) বিশিষ্ট হয়। তবে সম্প্রতি মাইক্রোকম্পিউটারে মাল্টিপ্রসেসর যুক্ত হচ্ছে। মাইক্রোকম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রসেসরের ক্ষমতা অতি দ্রুত উন্নত থেকে উন্নততর হওয়ায় মিনিফ্রেম কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা ইতোমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। মিনিফ্রেম কম্পিউটার এখন আর ব্যবহৃত হয় না।
বিশ্বে এখন সর্বাধিক জনপ্রিয় মাইক্রোকম্পিউটারকে পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার বলা হয়।

টেবিলের উপর রেখে কাজ করা যায় বলে মাইক্রোকম্পিউটারকে ডেস্কটপ কম্পিউটার হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোকম্পিউটারের আকার ও ওজন কমে আসতে থাকে। বহনযোগ্য আকারের কম্পিউটারে মাইক্রোকম্পিউটারের সকল গুণাবলি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়। এ সব বহনযোগ্য কম্পিউটার ল্যাপটপ কম্পিউটার হিসেবে পরিচিত। ল্যাপটপের আকারও ছোট হচ্ছে। ল্যাপটপের চেয়েও ছোট আকারের কম্পিউটারও এখন জনপ্রিয় হচ্ছে। মোবাইল ফোনও হয়ে উঠছে মাইক্রোকম্পিউটার।

কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

হার্ডওয়্যার : কম্পিউটারের সকল প্রকার যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশকে হার্ডওয়্যার (Hardware) বলা হয়। কম্পিউটারের কোনো হার্ডওয়্যারই এককভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। হার্ডওয়্যারগুলোর পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে একটি কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ, স্থায়ী স্মৃতি, অস্থায়ী স্মৃতি, সহায়ক স্মৃতি, বিভিন্ন প্রকার কার্ড/এ্যাডাপ্টর বসানোর ঘর বা স্লট এবং পাওয়ার বোর্ড, হার্ডওয়্যার বা যন্ত্রাংশ বসানোর জন্য ব্যবহৃত সার্কিট বোর্ড বা মাদার বোর্ড ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে প্রতিটি যন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবল ও বিভিন্ন প্রকার খুচরা যন্ত্রাংশ।
কম্পিউটারের সঙ্গে বাইরে থেকে সংযুক্ত অনেক রকম ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়। বহুল ব্যবহৃত ইনপুট যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, গ্রাফিক্স ট্যাবলেট, ওসিআর, ওএমআর, ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, ভিসিআর/ভিসিপি ইত্যাদি। আর বহুল ব্যবহৃত আউটপুট যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মনিটর, বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টার, প্লটার, ডিজিটাল প্রজেক্টর, বিভিন্ন প্রকার ভিডিও টেপ, সিডি, ডিভিডি, ভিসিআর/ভিসিপি ইত্যাদি।

সফটওয়্যার : কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার হচ্ছে নিষ্প্রাণ দেহের মতো। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের প্রাণশক্তি হচ্ছে সফটওয়্যার। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার চলতে পারে না। সফটওয়্যার প্রধানত দুই প্রকার। যেমন– পূর্ব-লিখিত সফটওয়্যার (Prewritten Software) এবং বিশেষ প্রয়োজনে তৈরি করে নেওয়া সফটওয়্যার (Customized Software)। পূর্ব-লিখিত সফটওয়্যার আবার দুই প্রকার। যেমন– এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম (Application Program) এবং সিস্টেম সফটওয়্যার বা অপারেটিং সিস্টেম (System Software বা Operating System)।

ব্যবহারকারীদের সাধারণ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পূর্ব-লিখিত সফটওয়্যারগুলো উন্নয়ন করে এবং বাজারজাত করে। কিন্তু বাজারে প্রাপ্ত পূর্ব-লিখিত সফটওয়্যারের সাহায্যে যদি কোনো ব্যবহারকারীর চাহিদা পুরোপুরি মেটানো সম্ভব না হয়, তাহলে ব্যবহারকারীর নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী সফটওয়্যার তৈরি করে নিতে হয়। এই বিশেষভাবে তৈরি করে নেওয়া সফটওয়্যারকেই কাস্টমাইজড সফটওয়্যার (Customized Software) বলা হয়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসেব-নিকেশ, তথ্য ব্যবস্থাপনা বা অন্যান্য কাজের জন্য অনেক সময় বিশেষভাবে সফটওয়্যার তৈরি করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন হয়।

কম্পিউটারের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাচীন গণনাযন্ত্র : এ্যাবাকাস (Abacus) নামক গণনাযন্ত্রকে কম্পিউটারের ইতিহাসে প্রথম যন্ত্র হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ এ্যাবাকাস থেকেই কম্পিউটারের ইতিহাস শুরু। এ্যাবাকাস ছিল একটি ফ্রেমে সাজান অনেকগুলো গুটির স্থান পরিবর্তন করে গণনা করার যন্ত্র। যদিও এ্যাবাকাস কবে আবিষ্কৃত হয় সঠিকভাবে বলা যায় না। অনেকেই একে

প্রাচীন এ্যাবাকাস গণনাযন্ত্র — আধুনিক এ্যাবাকাস গণনাযন্ত্র — প্রাচীন নেপিয়ারের হাড় — আধুনিক নেপিয়ারের হাড় — পাস্কালেন যন্ত্র — স্লাইড রুল
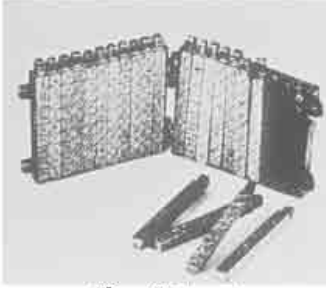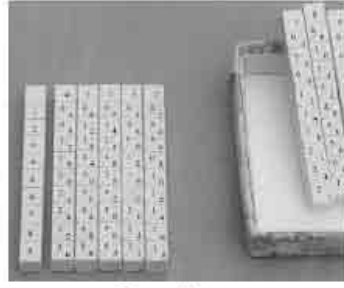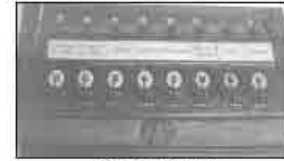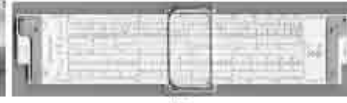
ব্যাবিলনীয় সভ্যতার তৈরি বলে মনে করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০/৫০০ অব্দে মিশর ও চীন দেশে গণনাযন্ত্র হিসেবে এ্যাবাকাস যন্ত্র তৈরি করা হয় বলে মনে করা হয়। বর্তমানের ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির যুগান্তকারী বিকাশের যুগেও চীন, জাপান, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, এখনও এ্যাবাকাস যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ঐতিহ্যের স্বাক্ষর হিসেবে এখনও তারা কয়েক হাজার বছরের পুরনো এ্যাবাকাস যন্ত্রের প্রচলন অব্যাহত রেখেছে।

এ্যাবাকাস প্রাচীন সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেও মধ্যযুগে এসে গণনা কাজের জন্য আরও উন্নততর যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে তা এতটাই বদলে যায় যে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। গণনার কাজকে সহজতর করার লক্ষ্য সামনে রেখে স্কটিশ গণিতবিদ জন নেপিয়ার ১৬১৪ সালে এলগরিদম পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিকে নেপিয়ারের হাড়ও বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে জার্মানির উইলিয়াম আউটরেট বৃত্তাকার স্লাইড রুল আবিষ্কার করেন। সেটি ছিল ১৬২২ সাল। এর পরের বছর উইলিয়াম শিকার্ড নামক আরেকজন জার্মান একাধিক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার গুণ করার জন্য চাকা বা গিয়ার চালিত একটি যন্ত্র তৈরি করেন।

১৬৪২ সালে ব্লেইজ প্যাস্কাল (Blaise Pascal) নামের এক ফরাসী যুবক এই যান্ত্রিক গণনা যন্ত্রটি তৈরি করেন। এই যন্ত্রটির নাম ছিল প্যাস্কালেন। পরবর্তীতে তাঁর সম্মানে কম্পিউটারের একটি আধুনিক প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা (Programming Language)-এর নাম দেওয়া হয়েছে প্যাস্কাল (Pascal)।

কম্পিউটারের প্রাথমিক যুগ : প্যাস্কালের পরে ১৬৭১ সালে এক জার্মান গণিতবিদ গটফ্রাইড ভন লিবনিজ (Gottfried Von Leibniz) প্যাস্কালের যন্ত্রের ভিত্তিতে আরও উন্নত যান্ত্রিক গণনাযন্ত্র তৈরি করেন। তাঁর এ যন্ত্রের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং উৎপাদক নির্ণয় করা যেত। তিনিই প্রথম পুনঃপুন যোগের মাধ্যমে গুণ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। স্টেপও রেকোনার নামের এই যন্ত্রটি তৈরির প্রায় একশ বছর পর ১৭৮৬ সালে জোহান হেলফ্রিক মুলার একটি গণনা যন্ত্রের ধারণা উপস্থাপন করেন। ১৮০১ সালে ফ্রান্সের জোসেফ মেরী জেকার্ড পাঞ্চকার্ড ব্যবহার শুরু করেন।

জোসেফ মেরী জেকার্ড

বর্তমান কম্পিউটারের অভিধারণা বিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় গণনা যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করেন অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) ১৮০১ সালে। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত যন্ত্রের নাম ঘোষণা করেন 'এ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন' (Analytical Engine)। চার্লস ব্যাবেজ তাঁর সময়ে একজন শীর্ষস্থানীয় গণিতবিদ হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

১৮২৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লুকাসিয়ান অধ্যাপক (Lucasian Professor) হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর আগে লুকাসিয়ান অধ্যাপকের সম্মান লাভ করেছিলেন বিজ্ঞানী নিউটন। কিছুটা রগচটা মেজাজের মানুষ ব্যাবেজ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন তখনকার জন্য অবিশ্বাস্য রকম একটি জটিল যন্ত্র তৈরির চেষ্টায়। তিনি এমন একটি যন্ত্রের কথা চিন্তা করেছিলেন, যে যন্ত্রে পাঞ্চকার্ডের সাহায্যে ইনপুট প্রদান করা হবে। ইনপুট ধারণের জন্য যন্ত্রটিতে থাকবে স্মৃতির ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াকরণের জন্য গাণিতিক অংশ বা মিল (Mill) এবং স্বয়ংক্রিয় আউটপুট মুদ্রণের ব্যবস্থা। প্রক্রিয়াকরণের কাজ পরিচালনার জন্য থাকবে পর্যায়ক্রমিক প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁর চিন্তাকে 'ব্যাবেজের মূর্খতা' (Babbage's Folly) বলে উপহাস করতেন। প্রকৃতপক্ষে চার্লস ব্যাবেজের চিন্তা ছিল শত বছরের আগাম চিন্তা। অর্থাৎ চার্লস ব্যাবেজের চিন্তার একশ বছর পর কম্পিউটার যে পর্যায়ে উপনীত হয়, সেইরূপ কম্পিউটারের চিন্তা তিনি একশ বছর আগে করেছিলেন। ১৮৩৩ সালে তার পরিকল্পিত 'এ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন'-এর ধারণাকে আধুনিক কম্পিউটারের সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

পাঞ্চকার্ড
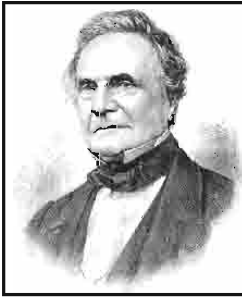
চার্লস ব্যাবেজ

চার্লস ব্যাবেজের পরিকল্পিত এ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের নক্সা প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন ঐ সময়ের আর একজন খ্যাতিমান গণিতবিদ, বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের কন্যা, লেডি এডা (Lady Augusta Ada Lovelace)। তাঁকেই বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তাঁর সম্মানের জন্য ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি আধুনিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের নাম প্রদান করে এডা (Ada)। চার্লস ব্যাবেজের যন্ত্রটি বাস্তব রূপ পায়নি। তাকে যে সরকারি সহায়তা দেওয়া হত সময়মতো কাজ সম্পন্ন করতে না পারায় তাও এক সময়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু চার্লস ব্যাবেজের পুত্র হেনরি ব্যাবেজ পিতার ধারণা অনুযায়ী একটি এ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন তৈরি করেন। ১৮৭১ সালে চার্লস ব্যাবেজের পরলোকগমনের পর থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী কম্পিউটারের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলতে গেলে থেমে থাকে। এ সময়ে
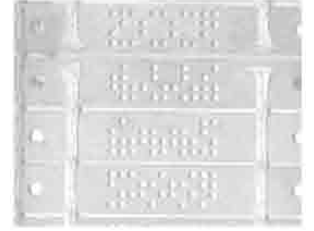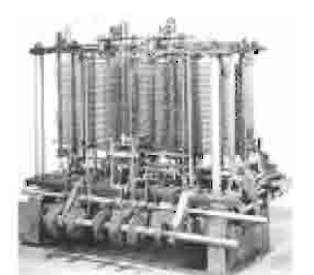
এ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন

পাঞ্চকার্ড দিয়েই উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সময়কালে যেসব যন্ত্র প্রচলিত হয় তার মাঝে রয়েছে ১৮৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডর ফেল্ট-এর কম্পোসিটার, ১৯৮৮ সালে প্রচলিত উইলিয়াম বারোস-এর এ্যাডিং এন্ড লিস্টিং মেশিন ইত্যাদি।

ইলেকট্রো মেকানিক্যাল যুগ : ১৮৮০ সালেও আমেরিকায় উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ করা হত কলম, পেন্সিল ও রুলারের সাহায্যে। কিন্তু ঐ সময় উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হাতে-কলমে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ফলাফলে প্রায় ভুল ধরা পড়ত এবং কাজের সময়ও লাগত অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমেরিকার ১৮৮০ সালের শুমারি (Census) শেষ করতে করতে প্রায় ১৮৯০ সালের শুমারির কাজ শুরু করার সময় পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, একই সময় উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য উন্নতমানের ও দক্ষ ইলেকট্রো মেকানিক্যাল পাঞ্চকার্ড যন্ত্র তৈরি হয়।

ডঃ হারম্যান হলেরিথ-এর শুমারি যন্ত্র

আমেরিকার শুমারি সমস্যা সমাধানের জন্য সেন্সাস ব্যুরো (Bureau of Census)-এর পরিসংখ্যানবিদ ড. হারম্যান হলেরিথ (Dr. Herman Hollerith) ১৮৮৭ সালে মেশিনের সাহায্যে পাঠযোগ্য অভিধারণা (Concept)-এর ভিত্তিতে 'সেন্সাস মেশিন' নামে একটি যন্ত্রের নক্সা প্রণয়ন করেন। পরীক্ষামূলক চালনায় দেখা যায় ড. হলেরিথের সেন্সাস মেশিনের সাহায্যে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য সময় লাগে পূর্বের তুলনায় মাত্র আট ভাগের এক ভাগ। ফলে হলেরিথের সেন্সাস মেশিনের সাহায্যেই আমেরিকার ১৮৯০ সালের শুমারির কাজ সম্পন্ন করা হয়।
১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সাল। এই দশকে আমেরিকার জনসংখ্যা ৫ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬ কোটি ৩০ লাখে দাঁড়িয়েছিল। হলেরিথের যন্ত্রের সাহায্যে ৩ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ১৮৯০ সালের শুমারির কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। ড. হলেরিথ ১৮৯৬ সালে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্র বাণিজ্যিকভাবে তৈরি ও বিক্রয়ের জন্য কোম্পানি গঠন করেন। পরবর্তীতে তাঁর কোম্পানি আরও কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে একীভূত হয়ে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন বা আইবিএম (IBM=International Business Machine) নামে কোম্পানি গঠিত হয়।

পাঞ্চকার্ডে বর্গাকার ছিদ্রের সাহায্যে তৈরি সংকেতায়নের মাধ্যমে উপাত্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর কার্ডগুলো ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্রে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এ যন্ত্র পাঞ্চকার্ডের উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে।

কিন্তু পাঞ্চকার্ডের ট্রে বদল করা, মেশিনে প্রবেশ করানো, মেশিন থেকে বের করা, কোনো মেশিন চালু করা, কোনোটি থামানো ইত্যাদি কাজগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই হাতে ধরে করতে হত। কম্পিউটার যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পরই এ সব কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইলেকট্রনিক যুগ : ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের চিন্তা প্রথম শুরু করেন পদার্থবিদ্যা ও গণিতের অধ্যাপক ড. জন ভিনসেন্ট আটানাসফ (Dr. John Vincent Atanasoff)। তাঁর গণনা কাজের জন্য উপযুক্ত যন্ত্র তখন পাওয়া যেত না। তাই তিনি নিজেই উন্নত ধরনের গণনা যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেন এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরি করেন। তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের নাম অনুসারে যন্ত্রটির নাম রাখা হয় আটনাসফ-বেরি কম্পিউটার (Atanasoff-Berry Computer), সংক্ষেপে এবিসি (ABC)। এবিসি কম্পিউটারেই প্রথম মজুদ (Storage) এবং গাণিতিক/যুক্তিমূলক কাজের জন্য ভ্যাকুয়াম টিউব (Vacuum Tube) ব্যবহার করা হয়। লন্ডন শহর থেকে ৪০ মাইল

দূরে সামরিক বাহিনীর কোড এন্ড গাইডার স্কুলে এই প্রকল্পের কাজ করা হয়েছিল। এবিসি কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছিল শুধুমাত্র গাণিতিক সমীকরণ জাতীয় কাজের বা সমস্যা সমাধানের জন্য। ড. আটানাসফ এবং বেরি ১৯৪০-১৯৪১ সালের মধ্যে জন মউসলি (John W. Mauchly)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের তৈরি যন্ত্র দেখান। জন মউসলি তখন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর স্কুল অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কর্মরত ছিলেন। জন মউসলি তখন বহুমুখী কম্পিউটার তৈরির চিন্তা শুরু করেন এবং চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে তাঁরই ছাত্র জে. প্রেসপার একার্ট (J. Presper Eckert)-এর সহযোগিতায় কাজ শুরু করেন।

এ বি সি কম্পিউটার

১৯৩৭ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের অধ্যাপক হওয়ার্ড আইকেন (Howard G. Aicken) স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হলেরিথের পাঞ্চকার্ড প্রযুক্তির সঙ্গে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি তাঁর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আইবিএম কোম্পানির প্রকৌশলীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ১৯৪৪ সালের মধ্যে তাঁর যন্ত্রটি তৈরি করতে সক্ষম হন। যন্ত্রটি মার্ক-১ (Mark-1) ডিজিটাল কম্পিউটার নামে প্রচলিত হয়। গণনা যন্ত্রটির অভ্যন্তরীণ কাজ বিদ্যুৎচুম্বকীয় রিলে (Electromagnetic Relay)-এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হত। গাণিতিক কাজ সম্পাদনের অংশ ছিল যান্ত্রিক (Machanical)। গঠন প্রকৃতির দিক থেকে মার্ক-১ ছিল ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কম্পিউটার।

মার্ক-১ ডিজিটাল কম্পিউটার

বৈশিষ্ট্যগতভাবে এর অনেক কিছুই চার্লস ব্যাবেজের পরিকল্পিত যন্ত্রের সঙ্গে মিল ছিল।

কম্পিউটারের প্রজন্ম বিভাগ

কম্পিউটারের যাত্রা শুরু গণনাযন্ত্র দিয়ে। সময়ের প্রয়োজনে ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করে কম্পিউটার বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বিকাশের একেকটি ধাপকে একেকটি প্রজন্ম (Generation) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রজন্ম বিভাগকে সঠিক দিন তারিখ ধরে সীমারেখা টানা যায় না। এক অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থায় উত্তরণের মাঝখানের সময়কে ক্রান্তিকাল (Transition Period) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বর্তমানে যে সব মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহার করা হয় এ সব কম্পিউটার হচ্ছে চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার। এর আগে আরও তিন প্রজন্মের কম্পিউটার পেছনে ফেলে কম্পিউটার বর্তমান প্রজন্মে উপনীত হয়েছে।

প্রথম প্রজন্ম (১৯৪৬-৫৯)

কম্পিউটারের প্রথম প্রজন্ম হচ্ছে ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করে তৈরি করা যন্ত্রসমূহের যুগ। এ প্রজন্মের কম্পিউটারে নানা প্রকার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা ছিল। তবুও এই যন্ত্রগুলোই পরবর্তী প্রজন্মের নতুন দিগন্তের ভিত্তি তৈরি করেছে। সামরিক বাহিনী সমর কৌশলের প্রয়োজনীয়তা প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার প্রযুক্তি বিকাশে ব্যাপক সহায়তা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সংকেতলিপির পাঠোদ্ধারের জন্য ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী ULTRA নামের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ব্রিটিশদের দ্বারা ১৯৭৪ সালে স্বীকৃত এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৪৩ সালে প্রথম কলোসাস নামের একটি কম্পিউটার তৈরি করা হয়।

১৯৪৬ সালে সমাপ্ত এনিয়াক ছিল বহুমুখী কাজের জন্য তৈরি কম্পিউটার। এ দিক থেকে এনিয়াক কম্পিউটার হচ্ছে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বা সফল ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এনিয়াক-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC). এনিয়াক কম্পিউটারে ১৮০০০ ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি 20x40 ফুট মাপের জায়গা জুড়ে স্থাপন করা হয়েছিল। এ যন্ত্রটির ওজন ছিল ৩০ টন। এই এনিয়াক কম্পিউটার সেকেন্ডে ৫০০০ যোগ এবং ৩০০ গুণের কাজ করতে পারত। ঐ সময়ের মার্ক-১ এবং অন্যান্য গণনা যন্ত্রের চেয়ে এনিয়াক ৩০০ গুণ বেশি গতিতে কাজ করতে পারত। তবে এনিয়াক কম্পিউটারের অভ্যন্তরে নির্বাহ সংকেত বা পরিচালনা নির্দেশ ধারণ করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বাইরে স্থাপিত প্লাগ বোর্ড ও সুইচের সাহায্যে পরিচালনা নির্দেশ বা নির্বাহ সংকেত প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করতে হত। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কাজে এনিয়াক কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।
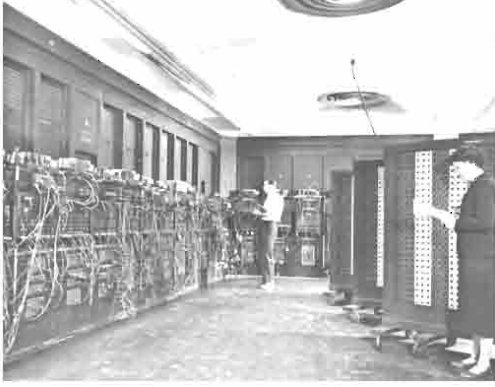
এনিয়াক-১ কম্পিউটার

১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে খ্যাতনামা গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান (John Von Neumann) এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, কম্পিউটার যন্ত্রের জন্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং যন্ত্রের অভ্যন্তরেই উপাত্ত ও নির্বাহ সংকেত মজুদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ ধারণা অবশ্য আটানাসফের এবিসি কম্পিউটারেই প্রথম কাজে লাগানো হয়েছিল। তিনি এ ধারণাটি লিখিত আকারে প্রকাশ করেন। তাঁর এ অভিধারণা সংরক্ষিত প্রোগ্রাম (Stored program) নামে খ্যাত এবং এই সংরক্ষিত প্রোগ্রামের ধারণার ভিত্তিতেই এডভ্যাক (EDVAC=Electronic Discrete Variable Automatic Computer) কম্পিউটার তৈরি করা হয়।

সংরক্ষিত প্রোগ্রামের সুবিধা হল, এতে আগের মতো প্রত্যেক বার নতুন প্রোগ্রামের শুরুতে অসংখ্য তার (Wire) ও সুইচ বিন্যস্ত করে এবং ব্যবহার করে নির্বাহ সংকেত প্রদানের ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হত না। উপাত্তের মতোই কম্পিউটারের স্মৃতিতে বা মজুদ অংশে (Storage area) নির্বাহ নির্দেশমালা প্রোগ্রাম আকারে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেত। ১৯৪৬-৫২ সালের মধ্যে মুর স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিজ্ঞানীরা এডভ্যাক কম্পিউটার তৈরি করেন। আমেরিকায় এডভ্যাক কম্পিউটার তৈরির সময়েই ব্রিটেনেও সংরক্ষিত প্রোগ্রামের অভিধারণার ভিত্তিতে আর একটি কম্পিউটার তৈরি হচ্ছিল। ১৯৪৯ সালের মে মাসে প্রথম প্রোগ্রাম নির্বাহের মধ্য দিয়ে এ কম্পিউটারটির ব্যবহার শুরু হয়। এডস্যাক (EDSAC=Electronic Delay Storage Automatic Calculator) নামে পরিচিত এ কম্পিউটার ১৫০০ মাইক্রোসেকেন্ডে যোগ এবং ৪০০০ মাইক্রোসেকেন্ডে গুণের কাজ করতে পারত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক গবেষণাগারে অধ্যাপক মরিস উইলকিস (Prof. Mauric Wilkes)-এর নেতৃত্বাধীন একদল বিজ্ঞানী এডস্যাক কম্পিউটার তৈরি করেন। প্রকৃতপক্ষে এডস্যাক কম্পিউটারকেই প্রথম সংরক্ষিত প্রোগ্রাম বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটার হিসেবে ধরা হয়। এডভ্যাক কম্পিউটার তৈরির কাজ বিলম্বিত হওয়ার কারণ ছিল প্রেসপার একার্ট এবং জন মউসলি ১৯৪৬ সালে তাঁদের নিজস্ব একটি কোম্পানি গঠন করেন এবং ইউনিভ্যাক (UNIVAC=Universal Automatic Computer) নামে কম্পিউটার তৈরির কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৫১ সালে প্রথম ইউনিভ্যাক-১ (UNIVAC-1) কম্পিউটারটি তৈরি করা হয় এবং সেন্সাস ব্যুরোতে স্থাপন করা হয়। সেন্সাস ব্যুরো এ কম্পিউটারটি প্রায় ১২ বছর ব্যবহার করে। ইউনিভ্যাকই ছিল প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার।

ইউনিভ্যাক-১ স্থাপন করার পর সেন্সাস ব্যুরো আইবিএম-এর পাঞ্চকার্ড যন্ত্রপাতি পরিহার করে। এ পর্যায়ে আইবিএম কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার পুত্র টমাস ওয়াটসন (Tomas Watson) কম্পিউটার ব্যবসায়ের জগতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে আইবিএম ৭০১ এবং ১৯৫৩ সালে আইবিএম ৬৫০ কম্পিউটার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি করেন।

ইউনিভ্যাক কম্পিউটার

আইবিএম কম্পিউটার

আইবিএম ৬৫০ সহস্রাধিক পরিমাণে বিক্রয় হয়। বাণিজ্যিকভাবে ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরি ও বিক্রয় এ সময় থেকেই উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয়। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটার ক্রয় করে। যদিও এসব কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বিজ্ঞানের বাইরের জগতের ব্যবহারকারীরা কম্পিউটারকে ব্যবসায়িক হিসেব-নিকেশের যন্ত্র হিসেবে মনে করত। তাঁদের চাহিদার কথা ভেবেই বেতন বিল তৈরি করার মতো কিছু কাজের জন্য প্রথম বাণিজ্যিক প্রোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়। এনিয়াক থেকে শুরু করে এ যাবৎ আলোচিত প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারগুলোতে ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহারের জন্য প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ হত। আর মেশিনের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করার কাজও ছিল কষ্টসাধ্য। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া মেশিনের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া ভ্যাকুয়াম টিউবগুলোর আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী। অনবরত টিউব নষ্ট হত এবং সেগুলো বদল করতে হত। প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

ক. ভ্যাকুয়াম টিউবের ব্যবহার

খ. পাঞ্চকার্ডের সাহায্যে ইনপুট-আউটপুট প্রদান

গ. চালনার সময় উচ্চ শব্দ হওয়া

ঘ. প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হওয়া

ঙ. প্রোগ্রাম রচনায় সংকেতের ব্যবহার করা

অসংখ্য ডায়োড ও ট্রায়োড, ভালভ, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি যন্ত্রাংশ ব্যবহার করার ফলে প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো বিশাল আকৃতির হত এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের কারণে কম্পিউটার যন্ত্র খুব তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়ে যেত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পানি ঢেলে উত্তপ্ত যন্ত্র ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করা হত। এ সব সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য ১৯৫৯ সাল থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার তৈরির যাত্রা শুরু হয়।

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৫৯-৬৫)

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের তুলনায় ছিল অনেক বেশি গতি সম্পন্ন, অনেক বেশি কাজের ক্ষমতা বিশিষ্ট এবং আকারে ছোট। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান পরিবর্তন ও অগ্রগতি হচ্ছে ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানসিস্টরের ব্যবহার। ট্রানসিস্টর ব্যবহারের ফলে দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের আকার ছোট হয়ে আসে।

আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরিতে ১৯৪৭ সালে জন বারডিন (John Bardeen), উইলিয়াম শকলে (William Shockley) এবং ওয়াল্টার ব্রাটেইন (Walter Brattain) ট্রানজিস্টর উদ্ভাবন করেন। ভ্যাকুয়াম টিউবের ব্যবহারে বিদ্যুৎ খরচ পড়ে অনেক কম, যন্ত্রাংশ গরম হয় না, কর্ম-সময় বেড়ে যায়। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে মডিউলার ডিজাইন ব্যবহার করা হয় এবং সার্কিটের প্রধান প্রধান অংশ ভিন্ন ভিন্ন বোর্ডে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার থেকেই উচ্চ স্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা ও ব্যবহার শুরু হয়। এ ছাড়া চৌম্বক কোরের ব্যবহারও এ প্রজন্মের কম্পিউটার থেকেই শুরু হয়। এ সময়ের জনপ্রিয় কম্পিউটার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে হানিওয়েল-২০০, আইবিএম-১৪০০, ১৬০০, আইবিএম ১৪০১, ১৬২০, সিডিপি ১৬০৪ আরসিএ ৩০১ ও ৫০১, এনসিআর-৩০০ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

ক. ট্রানসিস্টরের ব্যবহার

খ. ম্যাগনেটিক কোর মেমোরির ব্যবহার

গ. ফোরট্রান/কোবল ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও ব্যাপক ব্যবহার

ঘ. যন্ত্রপাতি ছোট হয়ে আসা

ঙ. কম উত্তপ্ত হওয়া

চ. কাজের গতি বৃদ্ধি

ছ. আস্থা ও নির্ভরশীলতা অর্জন।

তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৬৫-৭১)

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার চালু থাকা অবস্থায় নতুন ধরনের সার্কিট উদ্ভাবনের চেষ্টা শুরু হয়। অনেকগুলো ট্রানসিস্টর এবং অন্যান্য উপকরণ মিলিয়ে একীভূত সার্কিট (Integrated Circuit) তৈরি করে ক্ষুদ্র সিলিকন পাতের উপর স্থাপন করার মাধ্যমে এরূপ সার্কিট তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। উইলিয়াম শকলে (William Sockley) স্থাপিত শকলে সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানিতে এ সার্কিট তৈরির কাজ শুরু হয়। এ সময় রবার্ট নইসি (Robert Noyce) এবং আরও কয়েকজন শকলের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে নিজেরা ফেয়ারচাইল্ড সেমিকন্ডাক্টর নামে নতুন কোম্পানি গঠন করেন। রবার্ট নইসি ও তাঁর অন্য এক সহযোগী জ্যাক কিলবি (Jack Kilby) প্রথম সমন্বিত সার্কিট (Integrated Circuit) তৈরি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ফেয়ারচাইল্ড-এর ব্যক্তিদের অনেকেই পরে আরও অনেক কোম্পানি গঠন করেন।

সমন্বিত সার্কিট ব্যবহার করে তৈরি করা হয় তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার। ফলে কম্পিউটারের আকার আরও ছোট হয়ে আসে, দাম কমে যায় এবং কাজ করার ক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যায়। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের সঙ্গে আরও কিছু বাড়তি সুযোগ যুক্ত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুদ্রিত আকারে আউটপুট পাওয়ার জন্য লাইন প্রিন্টারের ব্যবহার। ১৯৪৬ সালে আইবিএম তার মেইনফ্রেম কম্পিউটার সিস্টেম/৩৬০ ঘোষণার মধ্য দিয়ে তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের সূচনা করে। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রসেসরে নির্দেশমালা (Instruction Set) বিল্ট-ইন থাকত। এ সব নির্দেশমালার অনেকগুলোই বৈজ্ঞানিক কাজ প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল। কাজেই তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার উভয় প্রকার কাজের জন্যই সমানভাবে উপযোগী ছিল। এ প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কম্পিউটারগুলো ছিল আইবিএম ৩৬০ ও ৩৭০ ও পিডিপি-৮ ও ১১ এবং জিই-৬০০ ইত্যাদি। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে তৈরি ও ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলোকে তৃতীয় প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়।

তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

ক. আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের ব্যবহার

খ. সেমি কন্ডাক্টর মেমোরির ব্যবহার

গ. হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজের ব্যবহার

ঘ. আউটপুটের জন্য ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট (VDU) এবং লাইন প্রিন্টারের ব্যবহার

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৭১-বর্তমান)

ক্ষুদ্রাকারের সিলিকন পাতের উপর ইলেকট্রনিক উপকরণ স্থাপন করে সমন্বিত সার্কিট তৈরির প্রক্রিয়া ১৯৬৫ সাল থেকে প্রতি বছর গড়ে দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অগ্রসরতার এক পর্যায়ে তৈরি হয় মাইক্রোপ্রসেসর। মাইক্রোপ্রসেসর চিপে কম্পিউটার পরিচালনার জন্য গাণিতিক/যুক্তিমূলক প্রক্রিয়াকরণের কাজ এবং নির্দেশ নির্বাহের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক কর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব সার্কিট স্থাপন করা থাকে। কম্পিউটারে ব্যবহৃত মাইক্রোপ্রসেসর তৈরির সূচনা হয় ক্যালকুলেটরের জন্য সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি চিপ উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। এই চিপের প্রধান ডিজাইনার ছিলেন ইনটেলের ফেডেরিকো ফ্যাগিন ও টড হফ এবং বুশিকমের মাসাটুশি সিমা। সেই সময়ে ইনটেলের এই উদ্ভাবন টিমের ব্যবস্থাপক ছিলেন লেসলি এল ভাডার্জ।

ইনটেলের প্রথম চিপটি ৪০০০ নামে পরিচিত ছিল। তবে ৪০০৪ প্রসেসরটি প্রথম বাজারে আসে। এটির প্রোগ্রাম এড্রেস ছিল ১২ বিট। এটি ২৩০০ ট্রানজিস্টর দিয়ে প্রস্তুত ছিল। এক বছরের মাঝে এতে ৩৩০০ ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হয়। ৪০০৪ চিপটি ১৯৭১ সালের ১৫ নভেম্বর বাজারজাত করা হয়। এই চিপের চতুর্থ সংস্করণ ৮০৮০ দিয়েই কার্যত মাইক্রোকম্পিউটারের বিপ্লবের সূচনা হয়।

বলা হয়ে থাকে যে, ইনটেলের ৪০০৪ চিপটির ক্ষমতা ছিল ১৯৪৬ সালের এনিয়াক কম্পিউটারের সমান। এনিয়াকের ওজন ছিল ২৭ টন এবং এর জন্য ৬৮০ বর্গফুট জায়গা দরকার হত। অথচ ৪০৪০ তালুতে রাখা যেত। মূলত মাইক্রোপ্রসেসর থেকেই চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার তৈরির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইনটেল ১৯৭৪ সালে ৮০৮০ মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করে। ১৯৭৫ সালে আলতেয়ার নামে প্রথম কম্পিউটার দিয়ে পিসির যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৬ সালের মধ্যে এ্যাপলসহ অনেকগুলো কম্পিউটার কোম্পানির সফল মাইক্রোকম্পিউটার তৈরির মধ্য দিয়ে চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের দ্রুত প্রসার ঘটে।

চতুর্থ প্রজন্মের মাইক্রোকম্পিউটার একেবারে টেবিলের উপর বসিয়ে কাজ করার মতো আকারে ছোট হয়ে আসে। দামও কমে আসে অভাবনীয়রূপে। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের তুলনায় চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের আকার ও দাম কমে আসার পাশাপাশি কাজের ক্ষমতা ও গতিও বৃদ্ধি পায় বহুগুণে। চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রায় সব ধরনের কাজ করা যায়। চতুর্থ প্রজন্মের মাইক্রোকম্পিউটারই সাধারণ স্তরের মানুষের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে এবং কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান ও দক্ষতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

ক. ভেরি লার্জস্কেল ইন্টিগ্রেসন বা VLSI চিপের ব্যাপক ব্যবহার ও অভাবনীয় উন্নয়ন ও বিকাশ

খ. মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের আবির্ভাব, বিকাশ ও বিশ্বময় প্রসার

গ. অতি ক্ষুদ্রাকৃতির বহনযোগ্য যন্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা

ঘ. নির্ভরযোগ্য, সম্প্রসারণযোগ্য, মাল্টিমিডিয়া, মাল্টিপ্রসেসিং সমন্বিত সেবা প্রদানকারী মাল্টিমিডিয়া সক্ষম অপারেটিং

সিস্টেমের বিকাশ

ঙ. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং প্যাকেজ ও কাস্টমাইজ সফটওয়্যারের আনয়ন

চ. ডাটা স্টোরেজ ও সহযোগী যন্ত্রের পরিধির ব্যাপক সম্প্রসারণ

ছ. বহুমুখী কাজে বহুমুখী ইনপুট/আউটপুট যন্ত্রের ব্যবহার

জ. মাল্টিপ্রসেসর সিস্টেমের আবির্ভাব

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার (ভবিষ্যৎ)

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার হবে কৃত্রিম বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন। এ জন্য কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) সংযোজনের উপর গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে খুব সীমিত আকারে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হওয়ার পর পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারে কৃত্রিম বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে বলে কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। এ ছাড়া মানুষের কণ্ঠস্বর শনাক্ত করার ক্ষমতাও হবে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষের কণ্ঠে দেওয়া নির্দেশ অনুধাবন করে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার কাজ করতে পারবে। আর পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের কাজের গতি, স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা যে বিস্ময়কররূপে বৃদ্ধি পাবে সে কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

আসলে সঠিকভাবে অনুমান করা কঠিন যে, পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার কেমন হবে। তবে একুশ শতকের শুরুতে সম্ভাব্য যে সব বৈশিষ্ট্য এ ধরনের কম্পিউটারে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, তা হল–

ক. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দ্রুতগতির হাজার হাজার মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার

খ. নতুন প্রজন্মের নতুন আকৃতির উচ্চ প্রসেসিং ক্ষমতার একাধিক কোরের মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার

গ. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং

ঘ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক প্রযুক্তির চরম বিকাশ

ঙ. ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা বিলোপ

চ. কণ্ঠস্বর শনাক্তকরণ ও বিশ্বের সকল ভাষায় কম্পিউটিং

ছ. ডায়নামিক/ইন্টারএকটিভ মাল্টিমিডিয়াসহ সকল ধরনের তথ্য পারাপার, প্রক্রিয়াকরণ ও ধারণ করার বিপুল ক্ষমতা অর্জন

জ. ডাটা স্টোরেজ ও সহযোগী যন্ত্রের পরিধির ব্যাপক সম্প্রসারণ

ঝ. বহুমুখী কাজে বহুমুখী ইনপুট/আউটপুট যন্ত্রের ব্যবহার

ঞ. একসাথে অনেক কাজ করা বা মাল্টিপ্রসেসিং ও মাল্টিটাস্কিং সিস্টেমের ব্যাপক ব্যবহার

সফটওয়্যারের ক্রমবিকাশ

প্রথম দিকের কম্পিউটার মানে ছিল হার্ডওয়্যারের সাথে প্রাপ্ত সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করা। কাজটি কঠিন ছিল। কারণ কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি মডেলের কম্পিউটারের জন্য আলাদা আলাদাভাবে সফটওয়্যার তৈরি করতে হত। কম্পিউটার ব্যবহার এজন্য সীমিত ছিল যে ব্যবহারকারীকেই তার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরি করতে হত। ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর জন্ম হতে থাকে। তবে ১৯৬৫ থেকে ৮৫ সালের মাঝে সফটওয়্যার তৈরি করার বিষয়টি ছিল জটিল ও সমস্যা জর্জরিত। এই সময়ে সফটওয়্যার প্রকল্পসমূহ বাজেট ঘাটতি, সময়সীমা অতিক্রম ও সম্পদহানির সমস্যায় পড়ে। এমনকি কোনো কোনো প্রকল্পে জীবনহানি ঘটে। ওএস ৩৬০ ছিল এমন একটি সফটওয়্যার প্রকল্প যার সূচনা হয় ষাটের দশকে। এতে এক হাজার প্রোগ্রামার কাজ করে। সফটওয়্যারের নিরাপত্তার অভাব তখন ব্যাপক ছিল। রেডিও থেরাপির সফটওয়্যারে ত্রুটির জন্য জীবনহানি ঘটার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

কম্পিউটারের বিকাশের প্রথম যুগে পুরুষরা সফটওয়্যারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করত না। হার্ডওয়্যার ছিল তাদের প্রত্যাশিত কাজ। মেয়েদেরকে তখন ধৈর্যের সাথে কোড লেখার কাজে ব্যস্ত রাখা হত

১৯৮৫ থেকে সফটওয়্যারের জন্য পরিকল্পনা, সরঞ্জাম, পেশাদারিত্ব গড়ে উঠতে থাকে। প্রথম যুগের সফটওয়্যার প্রকৌশলীদের মাঝে রয়েছেন Edsqer Dijkstra, Ken Jhonson (ইউনিক্সের উদ্ভাবক) Denis Ritchie (সি- এর উদ্ভাবক) Brian Kernirqhan (সি-এর সহ গ্রন্থাকার) Bill joy (সান ও,এস এর উদ্ভাবক), Anders Hejlsferq (টার্বো পাসকেলের উদ্ভাবক) John Voj Neuman (অপারেটিং সিস্টেম ধারণার উদ্ভাবক) John Backus (Fortan ভাষার উদ্ভাবক) Bjarne Striustrup (সি ++ এর উদ্ভাবক) Alan Kay, Jarnes Gisling (জাভার উদ্ভাবক) Alan Cooper (ভিজ্যুয়াল বেসিক-এর উদ্ভাবক) Tony Williams.

Software শব্দটি ১৯৫৮ সালে প্রথম ব্যবহার করেন John W Tukey. কার্যত পঞ্চাশের দশকে সফটওয়্যার শিল্পের সূচনা হয়। প্রথম সফটওয়্যার কোম্পানি কম্পিউটার ইউপেজ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। Elmer Kubie এবং John W. Sheldon নামের আইবিএম-এর দুজন সাবেক কর্মচারী এই প্রতিস্ঠানটি স্থাপন করেন। এর আগে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের নির্মাতা ও ব্যবহারকারীর সফটওয়্যার তৈরি করতেন।

১৯৫৯ সালে এ্যাপ্লাইড ডাটা রিসার্চ নামের কোম্পানি স্থাপিত হয়। ১৯৬০ সালের পর থেকে সফটওয়্যারের চাহিদা বেশ জোরালোভাবে বাড়তে থাকে। তখনও কম্পিউটারের সাথে অপারেটিং সিস্টেম, কম্পাইলার ও ইউটিলিটি সফটওয়্যার সরবরাহ করা হত। এসব পাওয়া যেত বিনামূল্যে। ফলে বাণিজ্যিকভাবে সফটওয়্যার কোম্পানির টিকে থাকা কঠিন ছিল। তবুও দিনে দিনে বাণিজ্যিক সফটওয়্যার কোম্পানির জন্ম হতে থাকে। আইবিএম ১লা জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে বিনামূল্যে সফটওয়্যার সরবরাহ বন্ধ করে। শুরুতে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম ও উপাত্ত পাঞ্চ কার্ডে প্রস্তুতকারকরা সরবরাহ করত। পরে কম্পিউটারের সাথে লাইব্রেরী সরবরাহ করা হত। এক সময়ে runtime লাইব্রেরী সরবরাহ করা হত। একে অপারেটিং সিস্টেমের প্রথম ধাপ বলা যায়। মনে করা হয় যে ১৯৫৬ সালে ব্যবহৃত GM-NAA 1/0 হচ্ছে প্রথম অপারেটিং সিস্টেম। এটি প্রস্তুত করেছিল জেনারেল মটস। তবে তখনকার প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার নির্মাতা আইবিএম তাদের পূর্ণাঙ্গ অপারেটিং সিস্টেম ওএস-৩৬০ তৈরিতে বেশি মনযোগী হয়। এই সময়ে অন্যান্য নির্মাতারাও অনেকগুলো অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করে।

ষাটের দশকের শেষে জন্ম হয় ইউনিক্স-এর, এরপর VMS এবং তারও পরে হোম পিসির জন্য জন্ম নেয় CP/M ও GEOS. CP/M-80 বহুল প্রচলিত অপারেটিং সিস্টেমে ছিল। এরপর ৮১ সালে PC-DOS বা MS DOS জন্ম নেয়।

জেরক্সের Alto Computer System-এর জন্মের আগের সকল অপারেটিং সিস্টেমই ছিল Textbased অপারেটিং সিস্টেমকে Graphics based অপারেটিং সিস্টেমের জগতে উত্তরণ ঘটায়। ১৯৬২ সালে বাজারে ছাড়া spacewar-ই সম্ভবত প্রথম কম্পিউটার গেম। ১৯৬০ সালে তৈরি করা 'Eye' ১৯৬৬ সালে উদ্ভাবিত Eliza ইত্যাদি এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কম্পিউটারকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে। ১৯৭৮ সালে বাজারে ছাড়া Visical পিসির দুনিয়ার প্রথম যুগান্তকারী এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম। ১৯৮২ সালে জন্ম নেয়া Word perfect যা কম্পিউটারকে লেখালেখির কাজে জনপ্রিয় করে।

পরবর্তীতে ওয়ার্ড, এক্সেল, পেজমেকার, পাওয়ার পয়েন্ট, ফটোশপ, প্রিমিয়ার ইত্যাদি Aplication Program দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটারের ব্যবহারকে ব্যাপকতর করে। কম্পিউটারের গেমসগুলো ছাড়াও ইন্টারনেট ও নেটভিত্তিক এ্যাপ্লিকেশন প্রোগাম কম্পিউটারকে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশের প্রথম জমানার সফটওয়্যারগুলোর মাঝে আছে সুইডিশ কোম্পানি ভলভোর জন্য তৈরি করা সফটওয়্যার, আবহ, বর্ণ, বিজয়, প্রশিকা, ব্যাক্সি ব্যাংক, পিসি ব্যাংক ইত্যাদি।

বাংলাদেশে কম্পিউটার

আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ শুরু হয় ষাটের দশকের প্রথম থেকেই। ঐ সময় থেকেই ইউরোপ-আমেরিকায়ও কম্পিউটারের ব্যবহার প্রসার লাভ করতে থাকে। ঠিক একই সময় থেকেই বাংলাদেশে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার স্থাপিত হয় ১৯৬৪ সালে পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকায়। তখন পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঢাকা ছিল তৎকালীন পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশনের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা। সে হিসাবে তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানের প্রথম কম্পিউটার স্থাপিত হয় পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকায়। বাংলাদেশে স্থাপিত ঐ প্রথম কম্পিউটার ছিল আইবিএম ১৬২০ মডেলের। কম্পিউটারের র‍্যাম (RAM) ছিল মাত্র ২০ কিলোবাইট। পরে র‍্যাম (RAM)-এর পরিমাণ বাড়িয়ে ৬৪ কিলোবাইট করা হয়।

বাংলাদেশে স্থাপিত ঐ প্রথম কম্পিউটারে ইনপুট দিতে হত পাঞ্চকার্ডের সাহায্যে এবং আউটপুট পাওয়া যেত পাঞ্চকার্ডে। ইনপুটের বিষয় জটিল হলে আউটপুট বেরিয়ে আসতে অনেক ক্ষেত্রে এক/দুই ঘন্টা বা তার চেয়েও বেশি সময় লাগত। তবুও বাংলাদেশের ঐ প্রথম কম্পিউটারটি আমাদের কম্পিউটার প্রযুক্তির জগতে প্রবেশের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে।

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্বদ্যিালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাঁদের গবেষণা কাজের জন্য এ কম্পিউটারটি ব্যবহার করতেন।

১৯৮২-৮৩ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চতুর্থ প্রজন্মের আইবিএম-৪৩৪১ মেইনফ্রেম কম্পিউটার স্থাপন করা হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দ ১৯৬৪ সালে পরমাণু কেন্দ্র, ঢাকায় স্থাপিত কম্পিউটারটি ব্যবহার করেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

আইবিএম ১৬২০

বাংলাদেশে দ্বিতীয় কম্পিউটারটি স্থাপিত হয় ১৯৬৫ সালে আদমজী জুট মিলে। কম্পিউটারটি ছিল আইবিএম ১৪০০ সিরিজের।

এরপর ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড (বর্তমানে জনতা ব্যাংক) স্থাপন করে আইসিএল ১৯০০ সিরিজের কম্পিউটার। স্বাধীনতার পরপরই ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স (Bureau of Statistics) আইবিএম ৩৬০ সিরিজের কম্পিউটার স্থাপন করে। ১৯৭৮-৭৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে আইবিএম ৩৭০ এবং পরে আইবিএম ৪৩০০ সিরিজের কম্পিউটার স্থাপন করে। এ সিরিজের কম্পিউটার পরবর্তী সময়ে ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স, বাংলাদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়।

বাংলাদেশে কম্পিউটার চর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও এর জনপ্রিয়তার সূচনা হয় মাইক্রো কম্পিউটার বা ডেস্কটপ কম্পিউটার দিয়ে। প্রথমে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে লাগেজে করে মাইক্রো কম্পিউটার আনা হত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। সেগুলো ছিল ট্যান্ডি, রেডিওশ্যাক, সিনক্লেয়ার ইত্যাদি ব্রান্ডের। এরপর ১৯৮২-৮৩ সালের দিকে আইবিএম পিসি-কম্পাটিবল ও এ্যাপল কম্পিউটারের জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। ১৯৮৫-৮৬ সালে এ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানির মেকিনটোশ কম্পিউটার বাংলাদেশে আসে। ১৯৮৭ সালের ১৬ই মে সেই কম্পিউটার দিয়ে আনন্দপত্র নামের একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এরপর বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা জগতে মেকিনটোশ কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়তে থাকে। অন্যদিকে অফিস আদালতে আইবিএম পিসি বা কম্পাটিবল ব্যবহৃত হতে থাকে। তখন ব্যক্তিগতভাবে কম্পিউটার আনার পাশাপাশি আমদানি করে মাইক্রোকম্পিউটার আনার শুরু হয়। কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রচলন একে অনেক জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটে কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়। ফলে দিনে দিনে বাংলাদেশে কম্পিউটারের পসার বাড়ছে।

সারমর্ম

কম্পিউটার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এটি দিয়ে যে কোনো তথ্য নিয়ে কাজ করা যায়। কম্পিউটারের রয়েছে তথ্য গ্রহণ, তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও তথ্য উপস্থাপনের ক্ষমতা। কম্পিউটার নিজে কাজ করতে পারে না। মানুষের তৈরি করা নির্দেশের সাহায্যে কম্পিউটার দ্রুততার সাথে নির্ভুলভাবে কাজ করতে পারে। কম্পিউটারের সহায়ক মেমোরি বা সহায়ক স্মৃতিতে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। কম্পিউটারের তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য রয়েছে সিপিইউ। কম্পিউটার ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করে এবং আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ফল পদান করে। ক্যালকুলেটর দিয়ে গণনা করার কাজ করা গেলেও ক্যালকুলেটরের চেয়ে কম্পিউটার অনেক বেশি শক্তিশালী। এতে তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি ছাড়াও বহুবিধ কাজ করা যায়। কম্পিউটারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এনালগ ও ডিজিটাল। এ ছাড়াও হাইব্রিড নামের আরেক ধরনের কম্পিউটার আছে। এনালগ কম্পিউটারে কাজ হয় পরিমাণ পদ্ধতিতে। ডিজিটাল কম্পিউটার কাজ করে প্রতীকী সংখ্যার মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশের সাহায্যে। আকার-আয়তন, মেমোরি, কর্ম ক্ষমতার বিচারে কম্পিউটারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ১. সুপার কম্পিউটার ২. মেইনফ্রেম কম্পিউটার ৩. মিনি কম্পিউটার এবং ৪. মাইক্রোকম্পিউটার।

সুপার কম্পিউটার সবচেয়ে শক্তিশালী ও বড় ধরনের কম্পিউটার। মেইনফ্রেম সুপার কম্পিউটারের চেয়ে কম ক্ষমতাবান কম্পিউটার। মিনিফ্রেম কম্পিউটার মেইনফ্রেম কম্পিউটারের ছোট সংস্করণ ও মাইক্রোকম্পিউটার তার চেয়েও ছোট আকারের কম্পিউটার।

কম্পিউটারের রয়েছে দুটি ভাগ। একটিকে বলা হয় হার্ডওয়্যার। অন্যটিকে সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের কাঠামো আর সফটওয়্যার তার প্রাণশক্তি। সফটওয়্যারের রয়েছে দুটি ভাগ–অপারেটিং সিস্টেম ও এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম।

১৬৭১ সালে জার্মান গণিতবিদ গটফ্রাইড উইলহেম লিবনিজ চাকা ও দণ্ড দিয়ে পৌনঃপুনিক যোগ করার একটি যন্ত্র তৈরি করেন। এরপর স্যার স্যামুয়েল মরল্যান্ড ১৭৮৬ সালে একটি গণনা যন্ত্র তৈরি করেন। ১৮২২ সালে চার্লস ব্যাবেজ যে যন্ত্রটি তৈরি করেন তাকেই আজকের দিনের কম্পিউটারের পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। চার্লস ব্যবেজের পরই ১৯৪০ সালে মার্ক-১ বাজারে আসে। এটি একটি মেকানিক্যাল যন্ত্র ছিল। ১৯৪৬ সালে জন মউসলি এবং তার ছাত্র প্রেসপার একটি এনিয়াক নামে একটি যন্ত্র তৈরি করেন। ১৯৪৯ সালে তৈরি হয় এডভাক। এ সব যন্ত্র দিয়ে গণনার কাজ করা হত এবং এগুলো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে কাজ করত। ১৯৫১ সালে ইউনিভ্যাক নামে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক কম্পিউটার ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৯৭১ সালে বাজারে আসে মাইক্রোপ্রসেসর। ১৯৭৪ সালে বাজারে আসে ৮০৮০ প্রসেসর আর এই মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি কম্পিউটার সারা দুনিয়ায় কম্পিউটার বিপ্লবের সূচনা করে।

কম্পিউটারের ক্রমবিকাশের ধারণাকে পাঁচটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক ও মেকানিক্যাল যুগের এবং ইলেক্ট্রনিক যুগের প্রথম কম্পিউটারগুলোকে প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার বলা যায়। ট্রানজিস্টের আবিষ্কার হওয়ার পর ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যেসব কম্পিউটার তৈরি হয়েছে সেগুলোকে দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার বলা যায়। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার হল ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭১ সালে আবিষ্কৃত মাইক্রোপ্রসেসরের সাহায্যে প্রস্তুতকৃত কম্পিউটারগুলোর পূর্ব পর্যন্ত প্রস্তুত কম্পিউটারসমূহ। মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি সাম্প্রতিক কম্পিউটারসমূহকে চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার বলা যায়। সাম্প্রতিককালে অতি উন্নত ও ব্যাপক ক্ষমতাবান মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে অত্যাধুনিক যেসব কম্পিউটার তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার বলা হয়।

সত্তর দশকের শেষ থেকেই বাংলাদেশে হোম পিসি আসতে শুরু করে। আশির দশকে আইবিএম পিসি, মেকিনটোশ ইত্যাদি কম্পিউটার আসতে থাকে। ৮৭ সালে কম্পিউটারে বাংলা প্রয়োগ করে কম্পিউটার দিয়ে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করা একটি মাইলফলক ঘটনা। ৯৮-৯৯ সালের বাজেটে কম্পিউটারের উপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করায় কম্পিউটারের প্রসার ব্যাপকতর হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিম্নের কোনটি প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার?

ক. আইবিএম ৪৫০ খ. ইউনিভ্যাক ১
গ. আইবিএম ৬৫০ ঘ. ম্যাক ১

২. একটি যোগ করতে কম্পিউটারের ৫০ ন্যানো সেকেন্ড সময় লাগলে ০২ সেকেন্ডে কয়টি যোগ করতে পারবে?

ক. ১ কোটি খ. ২ কোটি
গ. ৩ কোটি ঘ. ৫ কোটি

৩. মাইক্রোপ্রসেসরের ALU-এর কাজকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যেতে পারে–

i. গাণিতিক কাজ
ii. যুক্তিমূলক কাজ
iii. তথ্য সংরক্ষণের কাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রধান শিক্ষক : শিক্ষার্থী ভর্তি, এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, বৃত্তি পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থী মনোনয়ন, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল তৈরি ইত্যাদি কাজে প্রচুর সময় লাগছে এবং তথ্য সংরক্ষণে সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?

কম্পিউটার শিক্ষক : স্যার কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা এই সমস্যা সমাধান করতে পারি।

প্রধান শিক্ষক : পত্রিকায় দেখছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মেইনফ্রেম, মিনি, পার্সোনাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি নানা ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করছে। আমাদের কোন ধরনের কম্পিউটার প্রয়োজন?

ক. কম্পিউটার কী?
খ. মিনি ও মেইনফ্রেম কম্পিউটারের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য বর্ণনা কর।
গ. প্রধান শিক্ষকের চাহিদা মোতাবেক কাজের জন্য কোন ধরনের কম্পিউটার উপযোগী? কেন?
ঘ. কম্পিউটার ব্যবহারে সময় বাঁচে ও তথ্য সংরক্ষণ সহজ হয়–বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কম্পিউটারের সংগঠন

কম্পিউটারের সংগঠন

কম্পিউটারকে কাজের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলো সঠিক অবস্থানে স্থাপন করতে হয় এবং যন্ত্রাংশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করতে হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলো যথাযথভাবে অবস্থানে স্থাপন ও যন্ত্রাংশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনকেই কম্পিউটার সংগঠন বলা হয়।

কম্পিউটারকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এর সংগঠনটিও দুটি ভাগে বিভক্ত। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার অংশে এক সময় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ, গাণিতিক যুক্তি ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, ইনপুট-আউটপুট, মেমোরি ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে থাকত। বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম আইবিএম ১৬২০ কম্পিউটারটিতেও এমন ব্যবস্থা রয়েছে। ঐ কম্পিউটারটি এখন বিজ্ঞান জাদুঘরে রয়েছে। এখনকার দিনের কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের কাঠামো তেমন নয়। তখনকার সফটওয়্যারেরও ছিল ভিন্ন কাঠামো।

এখন কম্পিউটারের সংগঠনের ভাগগুলো হচ্ছে এ রকম– প্রথমত কম্পিউটারের দুটি ভাগ : হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যারের তিনটি অংশ : সিপিইউ, ইনপুট ও আউটপুট। সফটওয়্যারের দুটি অংশ : অপারেটিং সিস্টেম ও এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম।

কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ভাগের প্রধান অংশ কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ। এটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আজকাল কম্পিউটারের কেসিংয়ের ভেতরে বিন্যস্ত করে বসানো থাকে। এই কেসিংয়ের সাথে থাকে একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট কম্পিউটারের যাবতীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। একমাত্র মনিটর, প্রিন্টার, স্ক্যানার ছাড়া সব কিছুর বিদ্যুৎই এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে পাওয়া যায়। মনিটর বা স্ক্যানারও কখনও কখনও এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে।

ল্যাপটপ, পামটপ, পিডিএ বা অন্য বহনযোগ্য কম্পিউটারের কেসিং বা খাঁচাটির উপরিভাগে ইনপুট যন্ত্র হিসেবে কী-বোর্ড এবং মাউসের বিকল্প হিসেবে ট্র্যাকপ্যাড যুক্ত থাকে। এতে আলাদাভাবে কী-বোর্ড ও মাউস যুক্ত করার ব্যবস্থা থাকলেও এসব ছাড়াই সেটি হতে পারে একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার। এতে ব্যাটারি দেওয়া থাকে ইউটিলিটি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ উভয় ধরনের কম্পিউটারের কেসিং বা খাঁচার ভেতরে থাকে মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডটি আসলে কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ অংশ। এতে থাকে মাইক্রোপ্রসেসর, রম, র‍্যাম, ভিডিও ডিসপ্লে, সাউন্ড কার্ড, নেটওয়ার্ক কার্ড ইত্যাদি। মাদারবোর্ডের সাথেই কেসিং বা খাঁচার ভেতরেই থাকে হার্ডডিস্ক, সিডি-ডিভিডি ড্রাইভ। অন্যদিকে মাদারবোর্ডের বাইরে থাকে মনিটর, কী-বোর্ড, মাউস, প্রিন্টার ইত্যাদির সংযোগ দেওয়ার পোর্ট।

মাইক্রোপ্রসেসর বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট অথবা সিপিইউ

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ (CPU=Central Processing Unit) হচ্ছে কম্পিউটারের কাজ করার মূল এলাকা। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটকে মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে সকল কাজের প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়। কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে ব্যবহারকারীর নির্দেশ পৌঁছার পর ঐ নির্দেশ অনুযায়ী অস্থায়ী স্মৃতিতে অপেক্ষমাণ তথ্য/উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের

কাজ সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর তথ্য/উপাত্ত এবং নির্দেশ হচ্ছে ইনপুট। প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলার সময় কাজের পর্যায় বা অগ্রগতি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত মনিটরে প্রদর্শিত হয়। মনিটরে কাজের হাল অবস্থা প্রদর্শন হচ্ছে আউটপুট। এ ছাড়া, ব্যবহারকারী নির্দেশ প্রদান করলে মনিটরের পর্দায় প্রদর্শিত ফল কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত
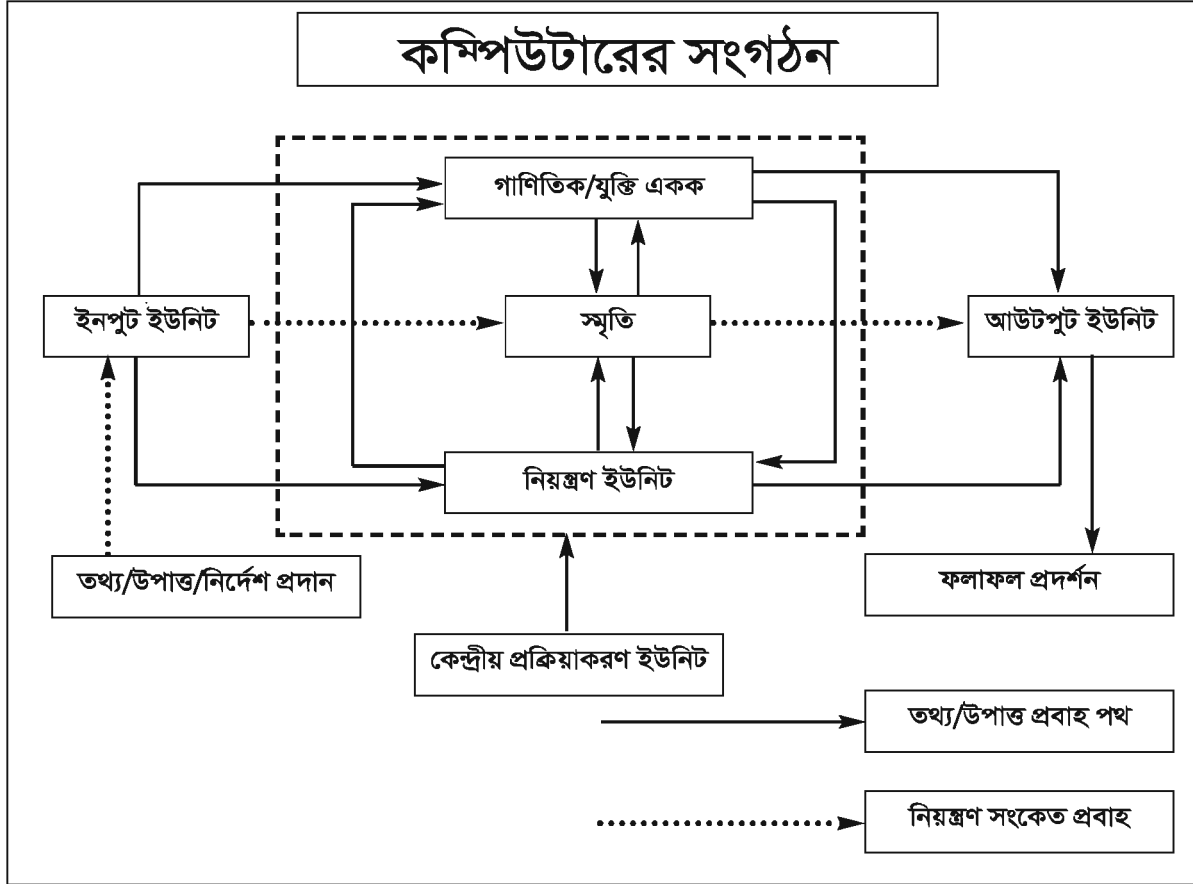
প্রিন্টারে মুদ্রণের জন্য প্রেরিত হয়। প্রিন্টারে মুদ্রণ নেওয়ার কাজটিও আউটপুট।

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে– কম্পিউটারের মেমোরিতে সঞ্চিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা, গাণিতিক যুক্তির কাজ করা, মেমোরি ও গাণিতিক যুক্তি অংশের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করা এবং অন্যান্য অংশের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা, ইনপুট এবং আউটপুট অংশগুলোর সঙ্গে কাজের সমন্বয় বিধান করা ইত্যাদি। বর্তমানে মাইক্রোপ্রসেসরই হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট। এসব কাজের জন্য মাইক্রোপ্রসেসরের ভেতরে প্রয়োজনীয় সার্কিট থাকে। মাইক্রোপ্রসেসরের ভেতরের সংগঠনকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ক. নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (Control Unit) এবং খ. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট (Arithmetic Logic Unit) গ. স্মৃতি (Memory) ।

ক. নিয়ন্ত্রণ ইউনিট

নিয়ন্ত্রণ ইউনিট প্রথমে প্রাপ্ত নির্দেশ পরীক্ষা করে দেখে এবং নির্দেশ নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাহ সংকেত তৈরি করে। এরপর প্রয়োজনীয় অংশে কার্য সম্পাদনের জন্য নির্বাহ সংকেত প্রদান করে। অনেক সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠিত। ইনপুট হিসেবে আসা তথ্যগুলো জমা হয় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের প্রধান স্মৃতিতে। এই প্রধান স্মৃতিকে বলা হয় র‍্যাম (RAM=Random Access Memory)। কম্পিউটারে লজিক বোর্ড বা মাদারবোর্ডের সকেটে এই স্মৃতি আলাদাভাবে বিদ্যমান থাকে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট র‍্যাম থেকে তথ্যগুলো গাণিতিক যুক্তি

ইউনিটে প্রেরণ করে। এখানে গাণিতিক এবং যুক্তিমূলক কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের নির্দেশে সেগুলো আবার র‍্যামে গিয়ে জমা হয়। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট প্রয়োজন হলে র‍্যামে ফিরে আসা তথ্য আবার গাণিতিক যুক্তি ইউনিটে প্রেরণ করে পরবর্তী পর্যায়ের কাজের জন্য। একই সঙ্গে চলতে থাকে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত মনিটরে ফলাফল প্রদর্শনের কাজ। এটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণ অংশের কাজের চলমান প্রক্রিয়া।

খ. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ হচ্ছে গাণিতিক কাজের উদাহরণ। গাণিতিক যুক্তি অংশের কাজকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. গাণিতিক কাজ : যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি এ অংশের কাজের অন্তর্ভুক্ত। দুইটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি ছোট, কোনটি বড় বা দুইটি সমান কি-না, যাচাই করে দেখাও গাণিতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

২. যুক্তিমূলক কাজ : প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী যুক্তির ভিত্তিতে দায়িত্ব সম্পাদন করা এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই এ অংশের প্রধান কাজ। এবং, অথবা, না, নতুবা ইত্যাদি যুক্তিমূলক নির্দেশের ভিত্তিতে এ অংশের কাজ সম্পাদিত হয়।

৩. তথ্য পরিচালনা : তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য তথ্য স্থানান্তর করে কোনো রেজিস্টার শূন্য করে দেওয়াই এ অংশের প্রধান কাজ। রেজিস্টারে সংরক্ষিত বাইনারি সংখ্যাকে স্থানান্তর (Shift) করে ডানে বা বামে শুধুমাত্র ১ বিট স্থান পর্যন্ত সরানো যায়।

ইন্সট্রাকশন সাইকেল : কম্পিউটার কাজ করে মানুষের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী। কম্পিউটার তার নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করে ব্যবহারকারীর দেওয়া নির্দেশ পালন করে থাকে। এই নিয়ম মেনে চলার একটি প্রবাহ আছে। সেই প্রবাহটি একটি চক্র বা সাইকেল হিসেবে কাজ করে। একে বলা হয় ইন্সট্রাকশন সাইকেল বা নির্দেশ চক্র।

এই নির্দেশ চক্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটিকে বলা হয় আনয়ন চক্র (Fetch Cycle) এবং অন্যটিকে বলা হয় নির্বাহ চক্র (Excution Cycle)। নিয়ন্ত্রণ অংশ সবার আগে প্রথম নির্দেশটি প্রধান র‍্যাম থেকে নিয়ে আসে এবং নির্দেশটিকে ব্যাখ্যা (Interprete) করে। ব্যাখ্যা করার পর ডিকোড (Decode) করে নির্বাহ সংকেত তৈরি করে। এরপর নির্দেশ কার্যকর করতে হয়। আর সে জন্য নিয়ন্ত্রণ অংশ নির্দেশের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী গাণিতিক যুক্তি ইউনিটে নির্বাহ সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে নির্দেশ কার্যকর করে। নির্দেশ নির্বাহ করার এই চক্রটি হচ্ছে নির্বাহ চক্র।

রেজিস্টার : কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের প্রক্রিয়াকরণের কাজ করার সময় তথ্যকে অস্থায়ীভাবে ধারণ করা হয় রেজিস্টারে। রেজিস্টারে ধারণ করা তথ্য দ্রুত পাঠ করা ও লেখা যায়। কম্পিউটারের সফটওয়্যার রেজিস্টারের তথ্য, উপাত্ত বা নির্দেশ শনাক্ত করতে পারে এবং অত্যন্ত দ্রুত কাজ করতে পারে। রেজিস্টারগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে– সাধারণ রেজিস্টার এবং বিশেষ রেজিস্টার। সাধারণ রেজিস্টারগুলো বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু, বিশেষ রেজিস্টারগুলো শুধু সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। মেমোরি অবস্থানের ঠিকানা বা এ্যাড্রেসের জন্য গণনাকারী বা প্রোগ্রাম গণনাকারী (Program Counter) রেজিস্টার, নির্দেশ সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ রেজিস্টার (Instruction), গাণিতিক ফলাফল সংরক্ষণের জন্য এ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার (Accumulator Register) নির্দিষ্ট করা থাকে। এগুলোকে তাই বিশেষ রেজিস্টার হিসাবে চিহ্নিত। অন্যান্য রেজিস্টার সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ডাটা ও এ্যাড্রেস বাস : কম্পিউটারের সিপিইউ অনেক কিছু নিয়ে কাজ করে। এতে তথ্য বা উপাত্ত থাকে, নির্দেশ থাকে আবার তথ্য, উপাত্ত বা নির্দেশের ঠিকানা থাকে। এত কিছুর চলাচলের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা থাকা দরকার। কম্পিউটারের এই পরিবহন ব্যবস্থাটি বাস নামে পরিচিত। কম্পিউটারে অনেকগুলো বাস কার্যকর থাকে। এর মধ্যে

প্রধান তিনটি বাস হচ্ছে– ডাটা বাস, কন্ট্রোল বাস এবং এ্যাড্রেস বাস।

ডাটা বাসের মাধ্যমে কম্পিউটারের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির ভেতর ডাটা পারাপারের কাজ সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত বাসকে বলা হয় কন্ট্রোল বাস। আর এ্যাড্রেস বা ঠিকানা বাস হচ্ছে ডাটার অবস্থানের এ্যাড্রেস বা ঠিকানা চিহ্নিত করার জন্য। ডাটা বাসের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের কাজ হয় বলে এর কার্যকারিতা দ্বিমুখী।

কম্পিউটারের অনেকগুলো বাসের মধ্যে অতি পরিচিত কয়েকটি বাস হচ্ছে– VESA, EISA, ISA, PCI, USB, FIREWIRE ইত্যাদি। এ সব বাসের একেকটির ধরন একেক রকম। তবে USB Ges FIREWIRE বাস অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন প্রায় প্রতিটি কম্পিউটারে USB পোর্ট-ইন্টারফেস বিদ্যমান থাকে। প্রচুর যন্ত্রপাতি ইউএসবি কম্পাটিবল হয়েছে। অন্যদিকে অতি দ্রুত তথ্য পারাপারের জন্য ফায়ারওয়্যার ভিডিও ক্যামেরা, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি এমনকি কম্পিউটারের স্টোরেজ ও অন্যান্য যন্ত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে। একটি কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন যে প্রসেসিং, কন্ট্রোল, এএলইউ, ইনস্ট্রাকশন, রেজিস্টার, এ্যাড্রেস ইত্যাদি মাইক্রোপ্রসেসরই থাকে।

গ. কম্পিউটারের স্মৃতি

কম্পিউটারে কাজ করার জন্য স্মৃতির (Memory) প্রয়োজন হয়। কম্পিউটারের স্মৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; স্থায়ী ও অস্থায়ী স্মৃতি। অস্থায়ী স্মৃতিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রধান স্মৃতি (Main Memory) এবং সহায়ক স্মৃতি (Auxiliary Memory)। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট যখন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তখন তথ্যগুলো কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতিতে অবস্থান করে। যতক্ষণ প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলে ততক্ষণই সেই তথ্যগুলো কম্পিউটারের স্মৃতিতে অবস্থান করে। যে তথ্য নিয়ে কাজ করা হয় এবং যে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম (Application Program)-এর অংশের সাহায্যে কাজ করা হয়, সেই তথ্য এবং প্রোগ্রামের অংশ দুই-ই কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতিতে অবস্থান করে। তথ্য সংরক্ষণের জন্য অনেকগুলো স্থান নিয়ে কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতি গঠিত। এর প্রতিটি স্থানই চিহ্নিত হয় সংখ্যা দ্বারা এবং এই সংখ্যাকেই বলা হয় স্মৃতি স্থানের ঠিকানা বা এ্যাড্রেস (Address)।

প্রধান মেমোরির প্রকারভেদ ও ধারণ ক্ষমতা

কম্পিউটারের স্মৃতি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। প্রধান স্মৃতিকে প্রাথমিক স্মৃতি (Primary Memory) হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি প্রাথমিক স্মৃতির মধ্যে রয়েছে–

- অর্ধপরিবাহী মেমোরি (Semiconductor Memory)
- চৌম্বক কোর মেমোরি (Magnetic Core Memory)
- চৌম্বক বুদবুদ মেমোরি (Magnetic Bubble Memory)
- চার্জ কাপল মেমোরি (Charge Couple Memory)
- পাতলা পর্দা মেমোরি (Thin Film Memory)

এ ছাড়া আরও কিছু প্রধান বা প্রাথমিক স্মৃতি রয়েছে এবং নতুন নতুন প্রাথমিক স্মৃতি উদ্ভাবনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটারে অর্ধপরিবাহী মেমোরি (Semiconductor Memory) ব্যবহার করা হয়। অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর পদার্থ দিয়ে তৈরি বলেই একে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি (Semiconductor Memory) বলা হয়। বহুল ব্যবহৃত এই অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি দুই প্রকার। এর একটি হচ্ছে র‍্যাম (RAM= Random Access Memory) এবং অন্যটি হচ্ছে রম (ROM= Read Only Memory)।
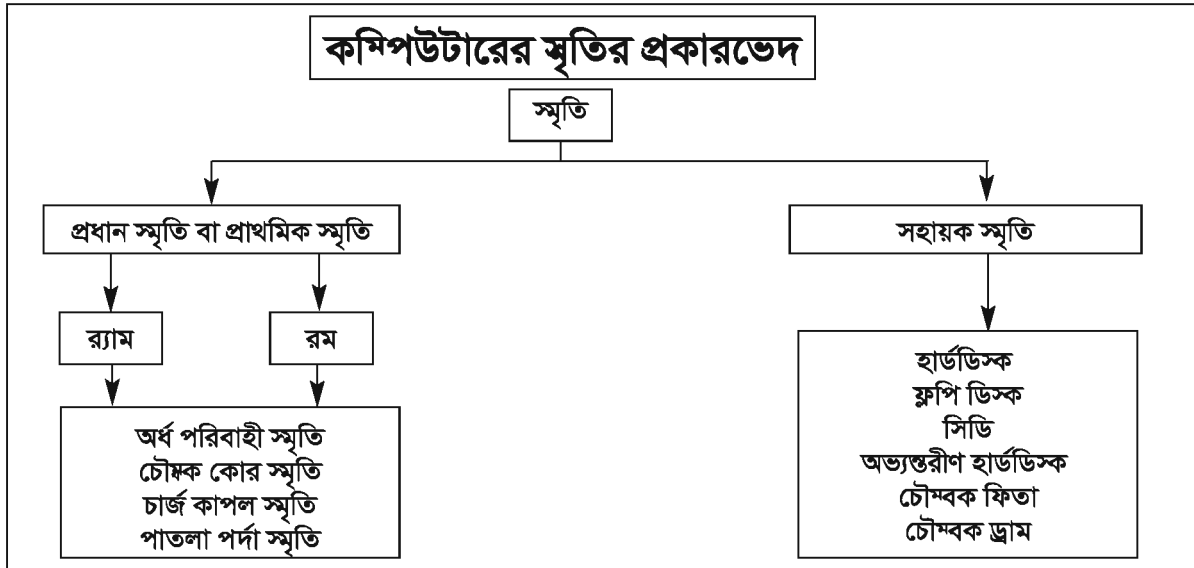
র‍্যাম

কম্পিউটারের মূল সার্কিট বোর্ড বা মাদার বোর্ডের সাথে যুক্ত একাধিক চিপ সমন্বয়ে র‍্যাম এলাকা গঠিত।

মাইক্রোপ্রসেসর প্রাথমিকভাবে র‍্যাম এলাকায় প্রয়োজনীয় তথ্য জমা করে। মাইক্রোপ্রসেসর সরাসরি র‍্যামের জানা অবস্থান/ঠিকানা (Location/Address) থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বা তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে। এখানে সরাসরি (Random) তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যাওয়া যায় (Access) বলে একে Random Access Memory বলা হয়। কোনো গানের ক্যাসেটের একটি নির্দিষ্ট গান বের করার জন্য যেমন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে রিউইন্ড বা ফরওয়ার্ড করে যেতে হয়। এ ক্ষেত্রে তা করতে হয় না। সরাসরি নির্দিষ্ট অবস্থান/ ঠিকানা থেকে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

কী ধরনের এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করা হবে এবং কী পরিমাণ কাজ করা যাবে তা নির্ভর করে র‍্যামের এককালীন ধারণ ক্ষমতার ওপর। প্রয়োজন মনে করলে অতিরিক্ত এক বা একাধিক র‍্যাম চিপ (RAM Chip) যোগ করে র‍্যামের ধারণ ক্ষমতা সম্প্রসারণ করা যায়। প্রায় সকল কম্পিউটারেই র‍্যামের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য স্লট বিদ্যমান থাকে।

রম

কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিতে বা রমে নতুন করে কোনো তথ্য লেখা যায় না বা স্থায়ী স্মৃতিতে লেখা কোনো তথ্য মুছে ফেলা যায় না। কম্পিউটারে হার্ডওয়্যারগুলো সচল রাখার জন্য রমে কিছু অত্যাবশ্যকীয় ও জরুরি নির্দেশ থাকে। এ নির্দেশগুলো মুছে গেলে কম্পিউটার চলে না। এ ধরনের নির্দেশমালা সংরক্ষিত থাকে কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতি বা রম (ROM)-এ। কাজেই, ব্যবহারকারী ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এ সব নির্দেশমালা মুছে ফেলতে পারেন না। এ সব নির্দেশমালা শুধু পাঠ করা যায় বলে একে রিড-অনলি মেমোরি (ROM) বলা হয়। যেহেতু বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এই স্মৃতির তথ্য মুছে ফেলা যায় না সেহেতু এ স্মৃতিকে স্থায়ী স্মৃতি বলা হয়। র‍্যামের নির্দেশনামালাকে অনেক সময় Firmware হিসাবেও অভিহিত করা হয়।

ইপিরম

ইপিরম হলো Eraseable Programmable Read Only Memory-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ যে সব স্থায়ী স্মৃতি প্রোগ্রাম করা যায় এবং প্রয়োজনে মুছে ফেলা যায় তাকেই ইপিরম (EPROM) বলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একবার প্রোগ্রাম করার পর তা আর মোছা যায় না। সে ক্ষেত্রে ইপিরম থেকে প্রোগ্রাম মুছে ফেলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

র‍্যাম ক্যাশ

কম্পিউটারের কাজের গতি বাড়ানোর জন্য র‍্যাম ক্যাশ (RAM Cache) ব্যবহার করা যায়। র‍্যাম ক্যাশ হচ্ছে র‍্যামের অংশবিশেষ। কোনো এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামে কাজ করার জন্য যে তথ্যগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়, সেই তথ্যগুলো র‍্যাম ক্যাশে জমা থাকে। ফলে, ঐ তথ্যগুলো খোঁজার জন্য এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামকে বারবার ডিস্কে যেতে হয় না। কাজেই এ্যাপ্লিকেশনের কাজ করার গতি বৃদ্ধি পায়। র‍্যাম ক্যাশ কিছুটা জায়গা দখল করে রাখে। অতএব, যে এ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য বেশি স্মৃতির প্রয়োজন, সে এ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে র‍্যাম ক্যাশ ব্যবহার না করাই ভালো। নিয়ম অনুযায়ী মোট র‍্যামের এক-চতুর্থাংশের বেশি র‍্যাম ক্যাশের জন্য ব্যবহার করা ঠিক নয়।

র‍্যামে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য জমা থাকে বলে র‍্যামের সব তথ্য অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলে র‍্যামের সব তথ্য মুছে যায়। এ জন্য কাজ করার সময় কিছুক্ষণ পর পর সেভ (Save) বা সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ করা কাজ ডিস্কে চলে যায়। ডিস্কের তথ্য মুছে না ফেলা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে। ডিস্ককে বলা হয় সহায়ক স্মৃতি।

সহায়ক স্মৃতির প্রকারভেদ

কম্পিউটারের তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় সহায়ক স্মৃতিতে। উল্লেখযোগ্য সহায়ক স্মৃতিগুলো হচ্ছে–

১. ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk)
২. হার্ডডিস্ক (Hard Disk)
৩. সিডি (CD=Compact Disk)
৪. সিডি-আর (CD-R=Copact Disk Recordable)
৫. সিডি-আরডব্লিউ (CD-RW= Copact Disk Rewritable)
৬. ডিভিডি-রম (Digital Versatile Disk-Read Only Memory)
৭. ডিভিডি-আর (DVD-R)
৮. ডিভিডি-আরডব্লিউ (DVD-RW)
৯. পেন ড্রাইভ
১০. রিমোভেবল হার্ডডিস্ক

অধুনালুপ্ত অন্যান্য সহায়ক স্মৃতি হচ্ছে

১. ম্যাগনেটো অপটিক্যাল ডিস্ক (Magneto Optical Disk)
২. জিপ ডিস্ক (Zip Disk)
৩. ডিজিটাল টেপ (Digital Tape)
৪. চৌম্বক টেপ (Magnetic Tape)
৫. চৌম্বক ড্রাম (Magnetic Drum)
ইত্যাদি

ফ্লপি ডিস্ক

ফ্লপি ডিস্ক সোয়া ৫ বা সাড়ে ৩ বর্গইঞ্চির একটি প্লাস্টিকের চাকতির মতো। ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ফ্লপি ডিস্ক আবার কয়েক ধরনের হয়। সাধারণ ফ্লপি ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা ৭২০/৮০০ কিলোবাইট পর্যন্ত এবং হাই ডেনসিটি (High Density) ফ্লপি ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা ১.২/১.৪ মেগাবাইট পর্যন্ত। বর্তমানে ফ্লপি ডিস্কের ব্যবহার বিলুপ্তির পথে।

হার্ডডিস্ক

কম্পিউটারের হার্ডডিস্ককে এক সময় ফিক্সড ডিস্ক বলা হত। হার্ড ডিস্ক হচ্ছে অসংখ্য ফ্লপি ডিস্কের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বড় আকারের ডিস্ক। হার্ডডিস্ক সাধারণত কম্পিউটারের কেসিংয়ের ভেতরে থাকে। কম্পিউটারের কেসিংয়ের

ভেতর অবস্থিত হার্ডডিস্ককে অভ্যন্তরীণ হার্ডডিস্ক বা ইন্টারনাল হার্ডডিস্ক (Internal Hard Disk) বলা হয়। কম্পিউটারের কেসিংয়ের ভেতরে একাধিক হার্ডডিস্ক থাকতে পারে। কম্পিউটারের কেসিংয়ের বাইরেও একাধিক হার্ডডিস্ক থাকতে পারে। এ সব হার্ডডিস্ককে বলা হয় এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক (External Hard Disk)। এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক বহনযোগ্য। এক্সটারনাল হার্ডডিস্কে এক কম্পিউটারের তথ্য নিয়ে অন্য কম্পিউটারে কাজ করা যায়। বর্তমানে আড়াই শ'/তিন শ' গিগাবাইটের চেয়েও বেশি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হচ্ছে।

সিডি-ডিভিডি ও জিপ ড্রাইভ

কম্পিউটারের জন্য এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় বহনযোগ্য সহায়ক স্মৃতি হচ্ছে সিডি ও ডিভিডি। তিন প্রকারের সিডি ও ডিভিডি পাওয়া যায়। সিডি-ডিভিডিতে কেবল তথ্য ধারণ করা যায়। এটি রমের মতো। এতে ধারণ করা তথ্য মোছা যায় না। সিডি-ডিভিডি আর বা লিখনযোগ্য সিডিতে একবার তথ্য রাইট করা যায়। সিডি-ডিভিডি আরডব্লিউ ফ্লপি ডিস্কের মতো বারবার তথ্য ধারণ করা যায়। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে, এর দাম কম, এতে মিউজিক, ভিডিও সবই ধারণ করা যায়। এখন সাধারণভাবে ৭০০ এমবির সিডি ও ৪.৭ জিবির ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সিডি-ডিভিডি প্রচলিত আছে। ডাবল লেয়ার ডিভিডির ধারণ ক্ষমতা সাধারণের দ্বিগুণ। আগামীতে ডিভিডির ক্ষমতা আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। ডিভিডির প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিডির ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এক পর্যায়ে হয়তো সিডির ব্যবহার আর থাকবে না।

পেন ড্রাইভ

পেনড্রাইভগুলো হার্ডডিস্কের মতো। তবে এ সবের ক্ষমতা হার্ডডিস্কের মতো এত বেশি নয়। আকারে ছোট ও কম ক্ষমতাসম্পন্ন পেন ড্রাইভ এখন তথ্য পারাপারের জন্য যথেষ্ট জনপ্রিয়।

টেপ

কম্পিউটার প্রযুক্তির গোড়ার দিকে মেইনফ্রেম, মিনি এবং পার্সোনাল কম্পিউটারে স্থায়ীভাবে তথ্য ধারণ করে রাখার জন্য ম্যাগনেটিক টেপ ব্যবহার করা হত। কিন্তু টেপ অত্যন্ত নিম্নগতির এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত না থাকায় এতে ডাটা সংরক্ষণ নিরাপদ ছিল না। তবে অনেকে টেপ ব্যাকআপ ড্রাইভ ব্যবহার করেন অপেক্ষাকৃত কমদামে ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য। সম্প্রতি কম্পিউটারের সাথে অডিও এবং ভিডিও মিডিয়ার অনেক বেশি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ম্যাগনেটিক টেপ ও ডিজিটাল টেপ-ভিডিও ধারণ বা ইনপুট-আউটপুটের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ডিজিটাল মিডিয়া এ সব ব্যবস্থাকে এক সময়ে প্রতিস্থাপিত করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো কাজ করার জন্য প্রথমে কম্পিউটারকে ঐ কাজের তথ্য প্রদান করতে হয়। কম্পিউটারকে দেওয়া এই তথ্যই হচ্ছে ইনপুট (Input)। কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ (CPU=Central Processing Unit) প্রাপ্ত তথ্য বা ইনপুটকে ব্যবহারকারীর দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হলে তার ফল পাওয়া যায়। এই ফলকেই বলা হয় আউটপুট (Output)। কম্পিউটারে ইনপুট প্রদানের জন্য অনেক রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এসব যন্ত্রকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস (Input Device)। ইনপুট ডিভাইসের সাহায্যে প্রেরিত তথ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে কম্পিউটারের র‍্যামে যায় এবং সেখানে কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষায় প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে ফল পাওয়া যায় সে সকল যন্ত্রকে আউটপুট ডিভাইস (Output Device) বলা হয়। কম্পিউটারের সঙ্গে সংযোগ দেওয়া টেলিভিশনের মত পর্দা বা মনিটর একটি আউটপুট ডিভাইস। এ পর্দা বা মনিটরে প্রক্রিয়াকরণের ফল দেখা যায়। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটারের সঙ্গে অন্যান্য আউটপুট যন্ত্রপাতি বা আউটপুট ডিভাইসের সংযোগ দিয়ে পর্দায় প্রদর্শিত ফল মুদ্রিত আকারে গ্রহণ করা যায়।

ইনপুট ডিভাইস

বহুল ব্যবহৃত ইনপুট যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, গ্রাফিক্স ট্যাবলেট, ওসিআর, ওএম আর, ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, ভিসি আর/ভিসি পি ইত্যাদি।

কী-বোর্ড এবং মাউস কম্পিউটারের দুটি অপরিহার্য ইনপুট ডিভাইস বা যন্ত্র। কম্পিউটারে লেখালেখির কাজের জন্য প্রায় গোটা তথ্যই ইনপুট আকারে প্রদান করা হয় কী-বোর্ডের সাহায্যে। মাউসের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে, ছবি সম্পাদনা, গ্রাফিক্স, ভিডিও, শব্দ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কম্পিউটারে ইনপুট এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রবেশ করানো হয় স্ক্যানার, গ্রাফিক্স ট্যাবলেট, ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, ভিসিআর, অডিও প্লেয়ার ইত্যাদির সাহায্যে।

আউটপুট ডিভাইস

বহুল ব্যবহৃত আউটপুট যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মনিটর, বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টার, প্লটার, স্পীকার, এলসিডি প্যানেল ও ভিডিও প্রজেক্টর ইত্যাদি।

কম্পিউটারে কাজ করার সময় তাৎক্ষণিক ফল প্রদর্শিত হয় মনিটরে। প্রদর্শিত ফলাফল দেখে সংশোধন, পরিমার্জন, বিন্যস্তকরণ ইত্যাদি সম্পাদনার কাজ করে সংশ্লিষ্ট কাজটি চূড়ান্ত করা যায়। কম্পিউটারে কাজ করার পর মুদ্রিত আকারে আউটপুট নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টার ও প্লটার। সাধারণত লেখালেখির কাজ এবং ছোট আকারের ছবি বা ছবি সংবলিত গ্রাফিক্সের কাজের মুদ্রণ নেওয়া হয় প্রিন্টারে। বাড়ির নক্সা, ভূমি জরিপের নক্সা এবং এ ধরনের কোনো বড় আকারের কাজের মুদ্রণ নেওয়া হয় প্লটারের সাহায্যে। তবে, বড় আকারের পোস্টার, ব্যানার, সড়ক বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মুদ্রণ নেওয়ার জন্য এখন বিশেষ ধরনের প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়।

শুধু শব্দ, যেমন– গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা ইত্যাদির আউটপুট নেওয়ার জন্য স্পীকার ব্যবহার করা হয়। ছবিসহ শব্দ বা শব্দসহ চলমান চিত্র ইত্যাদির আউটপুট নেওয়ার জন্য ভিডিও প্রজেক্টর বা বড় আকারের এলসিডি প্যানেল ব্যবহার করা হয়।

ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্রের সংযোগ

কম্পিউটারের ইনপুট প্রদানের জন্য এবং কম্পিউটার থেকে আউটপুট গ্রহণের জন্য কম্পিউটারের সঙ্গে ইনপুট এবং আউটপুট যন্ত্রাদি সংযুক্ত করতে হয়। এ সব যন্ত্রের সংযোগ দেওয়ার জন্য কম্পিউটারের কেসিংয়ের পেছন দিকে এবং সামনের দিকে অনেক সংযোগ মুখ বা সকেট (Socket) থাকে। এসব সংযোগ মুখ বা সকেটকে বলা হয় পোর্ট (Port)। যন্ত্রাদি ও তথ্য আদান-প্রদানের ধরন অনুযায়ী এ সব পোর্ট কয়েক প্রকারের হয়। যেমন– সিরিয়াল পোর্ট (Serial Port), প্যারালাল পোর্ট (Parallel Port) ইত্যাদি। সম্প্রতি ইউএসবি (USB=Universal Serial Bus) এবং ফায়ারওয়্যার বা আইইইই-১৩৯৪ (Firewire or IEEE-1394)–এ দুটি ইন্টারফেসকেও ইনপুট আউটপুট যন্ত্রের সংযোগ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সিরিয়াল পোর্ট ও কমিউনিকেশন : একটির পর একটি, অর্থাৎ ১ বাইট বা ৮ বিটের তথ্য পর্যায়ক্রমে ১ বিট করে আদান-প্রদানকে বলা হয় সিরিয়াল কমিউনিকেশন (Serial Communication)। সিরিয়াল কমিউনিকেশন যন্ত্রাদির মধ্যে মডেম, মাউস এবং আরও কিছু যন্ত্র উল্লেখযোগ্য। সিরিয়াল কমিউনিকেশন যন্ত্রাদির সংযোগ দেওয়া হয় সিরিয়াল পোর্ট (Serial Port)-এর মাধ্যমে।

প্যারালাল পোর্ট ও কমিউনিকেশন : একটি ক্যাবল বা তারের ভেতর দিয়ে ১ বাইট ডাটা বা তথ্যের ৮টি বিট পাশাপাশি ৮টি পৃথক লাইনের মাধ্যমে আদান-প্রদানকে প্যারালাল কমিউনিকেশন (Parallel Communication) বলা হয়। যে সব যন্ত্র প্যারালাল কমিউনিকেশন পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদান করে সে সব যন্ত্রকে বলা হয় প্যারালাল ডিভাইস।

প্যারালাল ডিভাইস সংযোগ দেওয়ার সকেটকে বলা হয় প্যারালাল কমিউনিকেশন পোর্ট (Parallel Communication Port) বা স্ক্যাজি পোর্ট (SCSI Port)। স্ক্যাজি (SCSI) হচ্ছে Small Computer System Interface-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। উচ্চারণ হয় স্ক্যাজি।

স্ক্যাজি পোর্ট অতি উচ্চ গতিতে হার্ডডিস্ক, টেপ ব্যাক আপ সিস্টেম, প্রিন্টার, সিডি-রম, স্ক্যানার এবং অন্যান্য স্ক্যাজি ডিভাইসে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

ইউএসবি পোর্ট ও বাস : ইনটেল উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিটি এখন ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি অনেক দ্রুত গতিতে ডাটা স্থানান্তর করতে পারে। প্রাথমিকভাবে এর ডাটা স্থানান্তরের গতি ১২ এমবি হলেও পরে এটি ৪৮০ এমবিপিএম করা হয়েছে। ইউএসবি ৩.০তে এর গতি ৫ জিপিপিএস করা হয়েছে।

ফায়ারওয়্যার পোর্ট ও বাস : এ্যাপল উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিটি বিশেষ করে ডিজিটাল ক্যামেরা বা এ ধরনের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। এখন স্ক্যানার, প্রিন্টার, হার্ডডিস্ক এবং এমন আরও অনেক যন্ত্রই এই ইন্টারফেস ব্যবহার করছে। এর ডাটা স্থানান্তরের গতি এখন ৭৮৬ এমবিপিএস। ভবিষ্যতে এর ডাটা স্থানান্তরের হার ৩২০০ এমবিপিএস বা তার চেয়েও বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ইন্টারফেসটি IEEE-1394 নামেও পরিচিত। অনেকেই একে iLink বলেও জানে। এটি আজকের দিনের ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

পার্সোনাল কম্পিউটার ও তার বৈশিষ্ট্য

মাইক্রোকম্পিউটার (Microcomputer) হচ্ছে ছোট আকারের কম্পিউটার। এক ব্যক্তি একটিমাত্র কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন বলে মাইক্রোকম্পিউটার সাধারণ ভাষায় পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি হিসেবে পরিচিত। মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটারের প্রচলন সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার প্রযুক্তি সর্বস্তরের মানুষের ব্যবহারের আওতায় আসে। অফিস-আদালত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ইত্যাদি সব ধরনের ক্ষেত্রে ও কাজে মাইক্রোকম্পিউটারের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে প্রায় সকল কাজেই এখন ব্যাপক আকারে মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ্বে এখন সর্বাধিক জনপ্রিয় মাইক্রোকম্পিউটার হচ্ছে আইবিএম পিসি/কম্পাটিবল। এ সব কম্পিউটার ছাড়াও এ্যাপল কোম্পানির তৈরি মেকিনটোশ কম্পিউটারও বেশ প্রচলিত। নব্বইয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ দুই গোত্রের কম্পিউটারের ব্যবহার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক গোত্রের কম্পিউটারের এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম অন্য গোত্রের কম্পিউটারের সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। নব্বইয়ের শুরুতে আইবিএম কম্পাটিবল পার্সোনাল কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ পরিবেশে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে এই দুইে গোত্রের কম্পিউটারের ব্যবহার পদ্ধতি নিকটতর হয়। এখন উভয় গোত্রের কম্পিউটারে চিত্রভিত্তিক পরিবেশে কাজ করা যায়।

মাইক্রোকম্পিউটার এক সময় টেবিলের উপর রেখে ব্যবহার হত। এ জন্য মাইক্রোকম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটার হিসেবেও পরিচিত ছিল। কালক্রমে মাইক্রোকম্পিউটারের আকার ও ওজন কমে আসতে থাকে। এখন মাইক্রোকম্পিউটার বহনযোগ্য হয়েছে। এ সব বহনযোগ্য কম্পিউটারের মধ্যে ল্যাপটপ এবং পিডিএ বা পার্সোনাল ডিজিটাল এ্যাসিসট্যান্ট উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি মাল্টিইউজার, মাল্টিটাস্কিং, নেটওয়ার্কিং পদ্ধতিতেও মাইক্রোকম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিককালের কিছু কিছু মোবাইল ফোন পিসির মতোই কাজ করে। এগুলোকে স্মার্ট ফোন বলা হয়।

পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্ম কথা

কিউএসটি (QST) পত্রিকার ১৯৭৪ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক পার্সোনাল কম্পিউটারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপিত পার্সোনাল কম্পিউটারটি ছিল সেলবি-৮এইচ (Selbi-8H)। এ পার্সোনাল

কম্পিউটার প্রায় ২০০টি বিক্রয় হয়েছিল। সেলবি পার্সোনাল কম্পিউটারের পরপরই তৈরি হয় আলতেয়ার ৮৮০০ (Altiar 8800) পার্সোনাল কম্পিউটার। নিউ মেক্সিকোর এমআইটিএস (MITS) কোম্পানি ইনটেল-এর মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে এ পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরি করে। পপুলার ইলেকট্রনিক্স (Popular Electronics) পত্রিকার ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় আলতেয়ার কম্পিউটার সম্পর্কে একটি বিশদ লেখা ছাপা হয়। তখন পর্যন্ত আলতেয়ার কম্পিউটারটি তৈরি হয়নি বলেই জানা যায়। তবে এর সামগ্রিক বিষয়াদি তখন প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। অনেকের মতে ঐ লেখাটি পার্সোনাল কম্পিউটার বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছিল। একই সময় দুইজন তরুণ প্রোগ্রামার বিল গেটস (Bill Gates) এবং পল এলেন (Paul Allen) বেসিক প্রোগ্রামে লেখা নির্দেশমালা ইনটেল মাইক্রোপ্রসেসরের যান্ত্রিক ভাষায় অনুবাদের জন্য প্রোগ্রাম লেখার কাজ প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেন। বিল গেটস এবং পল এলেন তাঁদের বেসিক প্রোগ্রাম বিক্রয় করার জন্য মাইক্রোসফট নামে একটি কোম্পানি গঠন করেন ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে।

১৯৭৫ সালে যাঁদের হাতে পার্সোনাল কম্পিউটারের গোড়াপত্তন হয়েছিল তাঁরা ছিলেন শৌখিন এবং স্বশিক্ষিত প্রকৌশলী। তাঁরা প্রথমে কম্পিউটারের নমুনা তৈরি করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন। আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট থেকে অগ্রিম অর্থ নিয়ে যন্ত্রাংশ ক্রয় করে অনেকেই গাড়ির গ্যারেজে বসে কম্পিউটার তৈরি করতেন। মূলত যন্ত্রাংশ সংযোজন করতেন। এঁদের মধ্যে বড়জোর দু'একটি উদ্যোগ কোম্পানি হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং টিকে আছে। কিন্তু তাঁরা বিশ্ব প্রযুক্তি উন্নয়নের বৈপ্লবিক সূচনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন।

গ্যারেজ থেকে যাত্রা শুরু করে আমেরিকার কম্পিউটার ব্যবসায়ের জগতে স্থান করে নিয়েছে, এমন একটি কোম্পানি হচ্ছে এ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানি। ১৯৭৬ সালের বসন্তে হিউলেট-প্যাকার্ড কোম্পানির টেকনিশিয়ান স্টিভ ওজনিয়াক (Steve Wozniak) এমওএসটি টেকনোলজি (MOST Technology) থেকে মাইক্রোপ্রসেসর ক্রয় করে এ্যাপল ১ (Apple 1) কম্পিউটার তৈরি করেন এবং এ পার্সোনাল কম্পিউটারটি সিলিকন ভ্যালিতে অনুষ্ঠিত হোমব্রু কম্পিউটার ক্লাবের মেলায় প্রদর্শন করেন। মিঃ ওজনিয়াক তাঁর কম্পিউটারের নক্সাটি ক্রয় করার জন্য হিউলেট-প্যাকার্ডকে প্রস্তাব দেন। হিউলেট-প্যাকার্ড আগ্রহ দেখায় না। তখন মিঃ ওজনিয়াকের এক বন্ধু স্টিভ জবস (Steve Jobs) মিঃ ওজনিয়াককে পরামর্শ দেন যে, এ্যাপল কম্পিউটার বাজারজাত করার জন্য তারা কোম্পানি গঠন করতে পারেন।

এভাবে এ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানি গঠিত হয় এবং প্রায় ২০০ এ্যাপল ১ (Apple 1) কম্পিউটার বিক্রয় হয়। এ্যাপল ১ কম্পিউটার বাজারজাত করার সময়েই মিঃ ওজনিয়াক এ্যাপল ২ (Apple II) কম্পিউটারের নক্সা প্রণয়নের কাজ করে যাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে ইনটেল কোম্পানির প্রকৌশলী ও বিপণন নির্বাহী মিঃ মাইক মার্কুলা (Mike Markkula)-এর ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সহযোগিতায় এ্যাপল কোম্পানি দ্রুত কম্পিউটার শিল্পে অন্যতম কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের শেষ নাগাদ মাইক্রোকম্পিউটারের বাজারে প্রভাব বিস্তার করেছিল এ্যাপল ২ (Apple II) এবং ট্যান্ডি কর্পোরেশনের রেডিও সেক বিভাগের টিএসআর-৮০ (TSR-80) মডেলের কম্পিউটার। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারও ছিল। এ সব কম্পিউটারের জন্যই সত্তরের দশকের শেষার্ধে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে এ্যাপল কম্পিউটারের জন্য তৈরি ভিসিক্যাল্ক (Visicalc) নামক স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ছাত্র ড্যান ব্রিকলিন (Dan Bricklin) তাঁর প্রোগ্রামার বন্ধু বব ফ্রাংকস্টোন (Bob Frankston)-এর সহযোগিতায় এ প্রোগ্রামটি তৈরি করেন। ভিসিক্যাল্ক প্রোগ্রামের জনপ্রিয়তার কারণেই হাজার হাজার এ্যাপল কম্পিউটার বিক্রয় হয়ে যায়।

পার্সোনাল কম্পিউটারের বাজারে আইবিএম প্রবেশ করে ১৯৮১ সালে। আইবিএম কোম্পানির পার্সোনাল কম্পিউটার তুলনামূলকভাবে সস্তা হওয়ায় দ্রুত প্রসার লাভ করে। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে আইবিএম কম্পিউটারের

অনুকরণে অনেক কম্পিউটার বাজারে আসে। এ সব কম্পিউটার আইবিএম-এর সমতুল্য বা কম্পাটিবল বলে পরিচিত। এই কম্পাটিবল কম্পিউটারগুলোর দাম প্রকৃত আইবিএম কম্পিউটারের চেয়ে কম হওয়ায় দ্রুত প্রসার লাভ করে।

এ্যাপল কোম্পানি ১৯৮৩ সালে লিসা নামে পার্সোনাল কম্পিউটার বাজারজাত করে। উচ্চমূল্যের ফলে লিসা কম্পিউটার বাজার পায় না। এরপর ১৯৮৪ সালে এ্যাপল মেকিনটোশ সিরিজের কম্পিউটার বাজারে ছাড়ে।

এ্যাপলের সর্বশেষ পাওয়ার পিসি প্রসেসর কম্পিউটারগুলো জি-৪ নামে পরিচিত। অন্যদিকে পিসি/কম্পাটিবলে সেলেরন ও পেন্টিয়াম-৪ মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০২ সালে আইবিএম পিসি'র অপারেটিং সিস্টেমে উইন্ডোজ এক্সপি এবং মেকিনটোশ সিস্টেমে ম্যাক ও.এস ১০ ব্যবহৃত হতে থাকে। এরপর এখন চলছে ভিস্তা। ১৯৯৮-এর শেষার্ধে এএমডি, সাইরিক্স ইত্যাদি কোম্পানি ইনটেলের সমতুল্য বা কম্পাটিবল প্রসেসর বেশ ব্যাপকভাবে তৈরি করা শুরু করে। এরই মাঝে প্রসেসরের জগতে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এখন প্রসেসরগুলো হচ্ছে ডুয়াল কোর, কোর টু ডুয়ো, কোয়াড কোর ইত্যাদি।

কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক ব্যবহার

ভৌত পরিবেশ

একটি কম্পিউটার যে স্থানে স্থাপন করা হয় এবং যে স্থানে রেখে কাজ করা হয় সেই স্থানের সার্বিক পরিবেশকেই ভৌত পরিবেশ বলা হয়। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সাধারণত যে কোনো একটি কক্ষে একটি কম্পিউটার রেখে কাজ করা যায়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে একটি কক্ষে একাধিক কম্পিউটার রেখে কাজ করা হয়। ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য ভৌত পরিবেশের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়।

একটি কম্পিউটার কক্ষের পরিবেশ অবশ্যই ধুলাবালি মুক্ত হতে হবে। ধুলাবালির জন্য সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয় কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ মেমোরি চিপ, সূক্ষ্ম যান্ত্রিক সংযোগ, ডিস্ক ড্রাইভ ইত্যাদি যন্ত্রাদির। আর ফ্লপি ডিস্কের প্রধান সমস্যা হচ্ছে ধুলাবালি। কম্পিউটারের সার্কিটে ধুলাবালি জমার ফলে অনেক সময় অপরিবাহী আস্তরণ তৈরি হয়। এর ফলে সার্কিটের উৎপন্ন তাপ অপসারিত হতে পারে না। এ জন্য অনেক ক্ষেত্রে সার্কিট অচল বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সূক্ষ্মতম যন্ত্রাংশে জমে থাকা ধুলাবালি অনেক সময় আর্দ্রতার কারণে দুটি সংযোগের মধ্যে শর্ট সার্কিট সৃষ্টি করতে পারে। আবার সার্কিটের সংযোগ বিঘ্নিত হতে পারে।

ধুলাবালি কম্পিউারের ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঘূর্ণায়মান দুটি যন্ত্রাংশের মাঝে ধুলাবালি জমলে ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এতে স্বাভাবিক কাজের ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

কাজেই, কম্পিউটার কক্ষ ধুলাবালি মুক্ত রাখার জন্য–

- কম্পিউটার কক্ষের দরজা ও জানালায় মোটা কাপড়ের পর্দা ব্যবহার করতে হবে।
- কম্পিউটার কক্ষে পাদুকাসহ প্রবেশ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।
- কম্পিউটার কক্ষের মেঝেতে প্লাস্টিক কার্পেট ব্যবহার করা ভালো। এতে প্রতিদিন কম্পিউটার কক্ষের মেঝে সহজে মোছা যায়।
- কম্পিউটার কক্ষে কখনও ধূমপান করা উচিত নয়। সিগারেটের ধোঁয়া ধুলাবালির সঙ্গে মিশে কম্পিউটারের সংযোগ পিন এবং কানেক্টরে অক্সাইড আবরণ তৈরি করে। এটা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশের জন্য ক্ষতিকর।
- কম্পিউটার কক্ষে মিষ্টি বা অন্য কোনো প্রকার খাবার গ্রহণ করা উচিত নয়। মিষ্টি জাতীয় বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পড়ে থাকলে পিঁপড়া এবং অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রব দেখা দেয়। এ ধরনের অনেক পোকামাকড়ই বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে সংযোগ তারের আবরণ কেটে ফেলতে পারে এবং সংযোগ স্থলের মাঝখানে বাসা বাঁধতে পারে। যার ফলে শর্ট সার্কিট এবং স্বাভাবিক সংযোগ ব্যাহত হওয়ার মতো নানা ধরনের ছোট ও বড় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

- কম্পিউটার যন্ত্রের কাছাকাছি আলপিন, সেফটিপিন, স্ট্যাপলার পিন ইত্যাদি পদার্থ রাখা বা ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এই সব পদার্থ অসাবধানতাবশত কম্পিউটারের সিপিইউ, কী-বোর্ড, ডিস্ক ড্রাইভ ইত্যাদির সূক্ষ্ম সংযোগ স্থলে পড়ে গিয়ে শর্ট সার্কিটের সৃষ্টি করতে পারে।

বৈদ্যুতিক পরিবেশ

কম্পিউটার কক্ষের বৈদ্যুতিক পরিবেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিদ্যুৎ শক্তি কম্পিউটারের প্রধান চালিকা শক্তি। আবার এই শক্তির ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে নানা প্রকার ছোট বড় সমস্যা, এমনকি বিপর্যয় পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। কম্পিউটার কক্ষে স্থাপিত কম্পিউটার এবং দেওয়ালের মাঝখানে পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রাখা প্রয়োজন। এতে কম্পিউটারের অভ্যন্তরে বাতাস চলাচলের সুবিধা হয় এবং কম্পিউটারের পেছনে বিভিন্ন প্রকার সংযোগের কাজ সহজে করা যায়।

কম্পিউটারের সঙ্গে বিভিন্ন রকম তারের সংযোগ থাকে এবং বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে কম্পিউটারের বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হয়। বিদ্যুতের তার কখনই ঢিলে ঢালা বা অকারণে পেঁচানো অবস্থায় রাখা উচিত নয়। বিদ্যুৎ লাইনের সকেটগুলো যাতে কোনো প্রকার ভাঙা বা ত্রুটিপূর্ণ না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ত্রুটিপূর্ণ সকেটের কারণে শর্ট সার্কিট হতে পারে। শর্ট সার্কিটের ফলে কম্পিউটার যন্ত্রের মাদার বোর্ডের পাওয়ার সাপ্লাই অংশ এবং অন্যান্য অংশের ক্ষতি হতে পারে। পুড়েও যেতে পারে।

কম্পিউটার কক্ষের মূল বিদ্যুৎ লাইনের উৎস স্থলে অবশ্যই আর্থিংয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এতে অবাঞ্ছিত বিদ্যুৎ প্রবাহ অপসারিত হওয়ার সুযোগ থাকে। অন্যথায় বিদ্যুৎ প্রবাহ লাইনে অনেক সময় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টির ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে এবং আরও নানা প্রকার বৈদ্যুতিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। এর যে কোনো একটি কারণে কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ফ্লপি ডিস্ক এবং ডিস্ক ড্রাইভ চুম্বকীয় প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফ্লপি ডিস্কের ওপর ম্যাগনেটিক অক্সাইডের প্রলেপ থাকে। এতে কোটি কোটি অণুচুম্বক বিদ্যমান থাকে। উচ্চ চুম্বকীয় বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাবে ফ্লপি ডিস্কের অণুচুম্বকীয় বিন্যাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টিকারী সকল প্রকার বিদ্যুৎ সৃষ্টির উৎস যেমন– টেলিভিশন, টিউব লাইট ইত্যাদি বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল কেন্দ্র এবং উচ্চ ভোল্টের তার ইত্যাদি থেকে ফ্লপি ডিস্ক, সিপিইউ এবং ডাটা চলাচলের ক্যাবল নিরাপদ দূরত্বে রাখা উচিত।

ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার

আমাদের দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ভোল্টেজের পরিমাণ ২২০ পর্যন্ত থাকার কথা। কিন্তু কখনও কখনও ভোল্টেজের মাত্রা ২৪০ থেকে ২৯০ পর্যন্ত উঠে যায়। আবার কখনও কখনও ১৩০ পর্যন্তও নেমে আসে। এ ছাড়া হঠাৎ করে ৩/৪ গুণ বেড়ে যাওয়ার মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। ভোল্টেজের এ ধরনের উঠা-নামার নিয়ন্ত্রণ করে কম্পিউটারকে নিরাপদ রাখার জন্য ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ইউপিএস

বিদ্যুৎ না থাকা অবস্থায় ইউপিএস (UPS=Uninterrupted Power Supply) যন্ত্র কিছু সময়ের জন্য কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখে। কোনো কারণে হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে কম্পিউটারের র‍্যামে অবস্থিত সকল কাজই মুছে যায়। কম্পিউটার ইউপিএস যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে কোনো কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও ইউপিএস কম্পিউটারে ১০-৩০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পারে। আরও বেশি সময়ব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার মতো ইউপিএসও আছে।

ভাইরাস ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ভাইরাস হচ্ছে এক ধরনের বিপত্তি সৃষ্টিকারী প্রোগ্রাম। দুষ্ট বুদ্ধির কিছু মানুষ এক ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করে ফ্লপি ডিস্কে দিয়ে দেয় বা নেটওয়ার্কে ছেড়ে দেয়, যা কম্পিউটারের স্বাভাবিক প্রোগ্রামগুলোর কাজ বিঘ্নিত করে। এ ধরনের প্রোগ্রামকেই ভাইরাস বলা হয়। ভাইরাস কখনও ডিস্কের ফাইল নষ্ট করে ফেলে, কখনও কম্পিউটার চালু করার ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে এবং ডিস্ক পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলতে পারে। কম্পিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হলে–

- প্রোগ্রাম লোড হতে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বেশি সময় লাগতে পারে।
- ডিস্কের নাম পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।
- অযৌক্তিক প্রমাদ-বার্তা প্রদর্শিত হতে পারে।

এ ছাড়া আরও অনেক প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। এ ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে বুঝতে হবে কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

কম্পিউটারকে ভাইরাস মুক্ত রাখার জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন–

- ভাইরাস আক্রান্ত ফাইল এবং ডিস্ক ভাইরাস মুক্ত করে ব্যবহার করা
- কম্পিউটার যাতে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে সে জন্য ভাইরাস প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ভাইরাস আক্রান্ত ফাইল এবং ডিস্ক ভাইরাস মুক্ত করা
- ভাইরাস প্রতিরোধ করার জন্য প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার পাওয়া যায়।

ড্রাইভ পরিষ্কারকরণ

কম্পিউটারের সিডি ড্রাইভ, ডিভিডি ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কারণ, ড্রাইভে কোনো প্রকার ধুলাবালি বা ময়লা জমে গেলে ডিস্ক ডাটা পাঠ করতে পারে না এবং ডিস্কে ডাটা লেখা যায় না। ডিস্ক ড্রাইভ পরিষ্কারকরণের কাজ অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে করানো উচিত।

নিয়মিত দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ

প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত যত্ন নেওয়া বা পরিচর্যাকেই নিয়মিত প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ (Routine Preventive Maintenance) বলা হয়। নিয়মিত প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকে যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে অব্যাহতভাবে কার্যক্ষম রাখা, যেন শুধু যত্নের অভাবেই কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ কার্যক্ষমতা না হারায় বা ত্রুটিযুক্ত না হয়ে পড়ে। কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি ধুলাবালি মুক্ত ও নিরাপদ রাখার জন্য গৃহীত পরিচর্যা ব্যবস্থা প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের পর্যায়ে পড়ে। নিয়মিত প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, মাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে করা একান্ত প্রয়োজন।

সারমর্ম

কম্পিউটারে রয়েছে দুটি অংশ। একটি অংশকে বলা হয় হার্ডওয়্যার। অন্যটিকে বলা হয় সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যারকে আমরা ৩টি অংশে ভাগ করতে পারি। অংশগুলো হল ইনপুট, সিপিইউ এবং আউটপুট। সিপিইউকে আবার ৩টি ভাগ করা যায়। মেমোরি, এ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এবং কন্ট্রোল ইউনিট। কম্পিউটারের যে অংশ প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে তাকে সিপিইউ বলে। সিপিইউতে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ও যুক্তির কাজ, মেমোরি ইত্যাদি। এখন মাইক্রোপ্রসেসর এই কাজগুলো করে।

কম্পিউটারে রয়েছে প্রধান মেমোরি ও সহায়ক মেমোরি। প্রধান মেমোরি স্থায়ী ও অস্থায়ী হতে পারে। সহায়ক মেমোরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি হিসাবে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে হয়। কম্পিউটারের মেমোরির ক্ষমতা বিভিন্ন প্রকারের হতে

পারে। কম্পিউটার ও এর সাথে যুক্ত যন্ত্রাংশের প্রকারভেদে মেমোরির পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে। কম্পিউটারে তথ্য সংস্করণ, ধারণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়ক মেমোরি থাকতে পারে। ফ্লপি ডিস্ক, হার্ডডিস্ক, সিডি রম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র কম্পিউটারের সহায়ক মেমোরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার যে সব যন্ত্রের সাহায্যে তথ্য গ্রহণ করে তাকে ইনপুট ডিভাইস ও যেসব যন্ত্রের সাহায্যে ফলাফল প্রদান করে তাকে আউটপুট ডিভাইস বলে। কী-বোর্ড, মাউস ইত্যাদি ইনপুট যন্ত্র। মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি আউটপুট যন্ত্র। কম্পিউটারের বিভিন্ন সংযোগ পথের সাহায্যে এসব যন্ত্র যুক্ত করা হয়।

১৯৭১ সালে বাজারে আসা মাইক্রোপ্রসেসরের সাহায্যে মাইক্রোকম্পিউটার তৈরি হয়। আজকাল এসব কম্পিউটার দামে সস্তা এবং প্রচুর ক্ষমতা সম্পন্ন হয়েছে। আইবিএম পিসি ও মেকিনটোশ দুই ধরনের জনপ্রিয় মাইক্রোকম্পিউটার বাজারে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ লোক আইবিএম পিসি ব্যবহার করে থাকে। এ্যাপল পার্সোনাল কম্পিউটার মেকিনটোশ কম্পিউটার হিসেবে পরিচিত।

মাইক্রোকম্পিউটারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটি এককভাবে কাজ করে আবার পরস্পর যুক্ত হয়েও কাজ করতে পারে। সকল যন্ত্রের মতো কম্পিউটারেরও পরিচর্যা করার দরকার হয়। বিশেষত বৈদ্যুতিক যন্ত্র যাতে ত্রুটিমুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে পারে তার প্রতি নজর দিতে হয়। বিদ্যুতের ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্ট্যাবিলাইজার এবং বিদ্যুৎ চলে গেলে কম্পিউটার কিছুক্ষণের জন্য চালু রাখার জন্য ইউপিএস ব্যবহার করা যায়। এছাড়া কম্পিউটারের নিয়মিত সার্ভিসিং করা দরকার। এটি পরিচালনায়ও বিশেষভাবে সতর্ক হতে হয়। নিয়মিতভাবে কম্পিউটারের ভাইরাস চেক করাও একটি জরুরি কাজ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিম্নের কোনটি Input ও Output উভয় Device হিসাবে ব্যবহৃত হয়?

ক. Mouse খ. Plotter
গ. Modem ঘ. Light Pen

২. স্ক্যানারের মাধ্যমে–

i. কম্পিউটারে ছবি সংযোজন করা যায়
ii. ছবি প্রিন্ট করা যায়
iii. সাদাকালো ছবি রঙিন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

ফরহাদ : আমি একটি কম্পিউটার ক্রয় করব ।

হাসান : কম্পিউটার ক্রয় করার সময় বেশি করে মেমোরি/স্মৃতি সংযোজন করবে ।

৩. কম্পিউটার সংগঠনের একটি ব্লক চিত্র নিম্নরূপ :
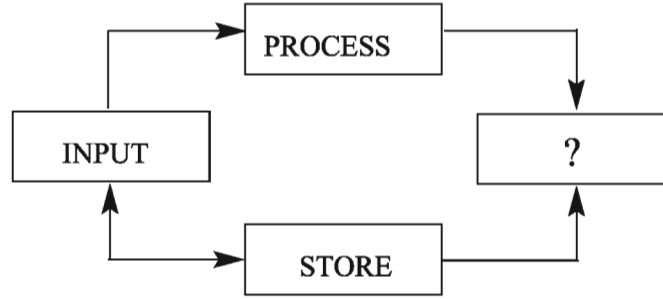
? চিহ্নিত স্থানে নিচের কোনটি প্রযোজ্য হবে?

ক. Product

খ. Memory

গ. Data

ঘ. Output

৪. মেমোরি/ স্মৃতি বেশি হলে–

i. কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে

ii. কম্পিউটারে বিদ্যুৎ খরচ বেশি হবে

iii. কম্পিউটারের স্থায়িত্ব বাড়বে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

তোমার বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাহায্যে তোমাদের শ্রেণীর সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত করে প্রোগ্রেস রিপোর্ট আকারে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করলেন । এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সকল বিষয়ের নম্বরগুলো বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করল ।

ক. ইনপুট কী?

খ. এক্ষেত্রে প্রধান ইনপুট যন্ত্রটি কী? ব্যাখ্যা কর ।

গ. শিক্ষার্থীরা কীভাবে প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করল, বর্ণনা কর ।

ঘ. প্রোগ্রেস রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে সিপিইউ-এর কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর ।

তৃতীয় অধ্যায়

কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেম

সফটওয়্যারের ধারণা

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত হয় কম্পিউটার সিস্টেম। কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশকে বলা হয় হার্ডওয়্যার (Hardware)। হার্ডওয়্যার স্পর্শ করা যায়। স্পর্শ করে এর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। কিন্তু, হার্ডওয়্যার নিজে চলতে পারে না। হার্ডওয়্যারকে সচল ও কাজের লক্ষ্যে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন সফটওয়্যার (Software)। সফটওয়্যার ছাড়া শুধু হার্ডওয়্যার নিষ্প্রাণ দেহের মতো। এই নিষ্প্রাণ দেহে প্রাণ সঞ্চার করে সফটওয়্যার।

সফটওয়্যার প্রধানত দুই প্রকার। যেমন– অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফটওয়্যার (Operating System/System Software) এবং এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম (Application Program)।

অপারেটিং সিস্টেম

অপারেটিং সিস্টেম (Operating System)-কে সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার চলতে পারে না। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজগুলো পরিচালনা করে অপারেটিং সিস্টেম (Operating System)।

অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মাঝখানে অবস্থান করে। হার্ডওয়্যারকে দিয়ে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের কাজগুলো করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফটওয়্যার সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পিসির জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ এক্সপি এবং ভিস্তা। ভিস্তা এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। তবে, খুব শীঘ্রই পার্সোনাল কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ভিস্তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। পক্ষান্তরে, মেকিনটোশ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে ম্যাক ওএস।

অপারেটিং সিস্টেমের কাজ করার পদ্ধতি

অপারেটিং সিস্টেম (Operating System) বা পরিচালনা পদ্ধতি বলতে সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশমালা সংবলিত প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার বোঝায়। একজন ব্যবহারকারী যখন এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সাহায্যে কাজ করার জন্য কোনো
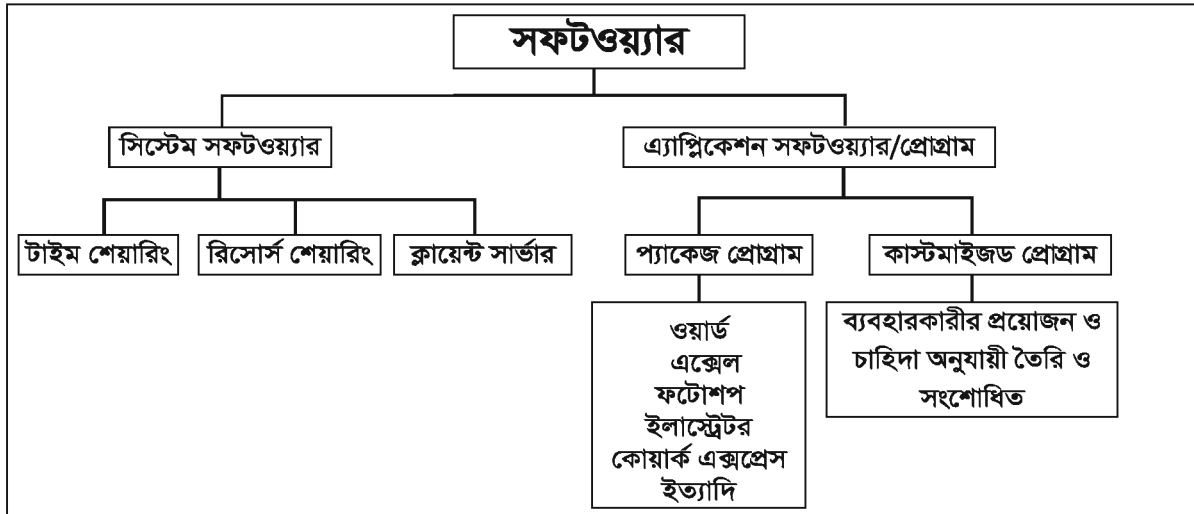
নির্দেশ প্রদান করে তখন অপারেটিং সিস্টেম ঐ নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কাজটি সম্পন্ন করে। ব্যবহারকারী বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করে থাকেন। যেমন– লেখালেখির কাজের জন্য ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম খোলার নির্দেশ দেওয়া হলে অপারেটিং সিস্টেম ওয়ার্ড প্রসেসিং এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামকে ডিস্ক থেকে কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতিতে নিয়ে যায়। এরপর থেকে যতক্ষণ ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে কাজ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীর বিভিন্ন নির্দেশ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ফলাফল মনিটরের পর্দায় প্রদর্শন করে। কাজ শেষ করার পর প্রিন্টারের সাহায্যে মুদ্রণ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে অপারেটিং সিস্টেম ঐ নির্দেশিত কাজকে কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করে। এ ছাড়া, কাজ করার সময় সেভ বা সংরক্ষণ করা এবং কাজ শেষে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি সব ধরনের কাজের নির্দেশ অনুযায়ী অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে থাকে। অন্যান্য এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও অপারেটিং সিস্টেম একইরূপ ভূমিকা পালন করে। ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার এ পর্যায়কে বলা হয় প্রক্রিয়াকরণ করা। বলা যায়, অপারেটিং সিস্টেম হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে।

কম্পিউটার প্রযুক্তি বিকাশের গোড়ার দিকে অপারেটিং সিস্টেম ছিল না। তখন ব্যবহারকারীকে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখে কম্পিউটার পরিচালনা করতে হত। কী ধরনের ইনপুট দেওয়া হচ্ছে, প্রদত্ত ইনপুটের সাহায্যে কী কী কাজ করতে হবে, কাজ শেষ হওয়ার পর আউটপুট দেওয়া ইত্যাদি সব কিছুর নির্দেশ প্রোগ্রাম লিখে লিখে প্রদান করতে হত। একই ধরনের কাজ আবার করার প্রয়োজন হলে একই প্রোগ্রাম আবার নতুন করে লিখতে হত। প্রোগ্রাম লিখে লিখে কম্পিউটারে কাজ করার ঐ পর্যায়ে কম্পিউটার যখন প্রক্রিয়াকরণের কাজ করত তখন ব্যবহারকারীকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত। আবার আউটপুট বের হওয়ার পর থেকে নতুন কাজের নির্দেশ সংবলিত প্রোগ্রাম লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কম্পিউটার অলস বসে থাকত। এতে কাজের সময় লাগত অনেক বেশি।

ষাটের দশকে উদ্ভাবিত মেইনফ্রেম কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম চালু হয়। মেইনফ্রেম কম্পিউটারের প্রথম দিককার অপারেটিং সিস্টেমে সময় সাশ্রয় হয়। অপারেটিং সিস্টেমের সাহায্যে তখন কাজগুলো অপেক্ষমাণ রাখার ব্যবস্থা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি কাজ শেষ হওয়ার পর অপারেটিং সিস্টেম আপনাআপনিই পরবর্তী কাজটি শুরু করে দেয়। মেইনফ্রেম কম্পিউটারের সেই প্রথম পর্যায়ের অপারেটিং সিস্টেম থেকে শুরু করে বর্তমানের মাইক্রোকম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম পর্যন্ত যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা সহজতর হওয়ায় বর্তমানে একজন ব্যবহারকারী অনায়াসেই আইবিএম পিসি কম্পাটিবল কম্পিউটার বা পিসি এবং মেকিনটোশ কম্পিউটারে কাজ করতে পারছেন। অপারেটিং সিস্টেম সহজতর হওয়ার ফলেই কম্পিউটার প্রযুক্তি জনপ্রিয় হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারছেন।

অপারেটিং সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- ফাইল ও এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামকে প্রধান স্মৃতিতে নিয়ে আসা
- ব্যবহারকারীর নির্দেশ গ্রহণ করা, ব্যাখ্যা করা (Interpret) এবং কার্যকর করা
- ডিস্ককে কাজের উপযোগী করা বা ফরমেট করা
- উপাত্ত ও তথ্য ডিস্কে লেখা ও ডিস্ক থেকে উপাত্ত ও তথ্য পাঠ করা
- ডিস্কের ত্রুটি নির্ণয় করা ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সংশোধন করা
- ডিস্ক কমান্ড কার্যকর করা। যেমন– এক ডিস্কের ফাইল কপি করে অন্য ডিস্কে নেওয়া, ফাইল মুছে ফেলা ইত্যাদি
- ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ/সমন্বয় করা
- নেটওয়ার্কিং সার্ভিসও প্রদান করা।

এ ছাড়া অপারেটিং সিস্টেম আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। অপারেটিং সিস্টেমের কাজের এ সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকেই বোঝা যায় যে, আগের মতো সব কাজ প্রোগ্রাম লিখে লিখে করতে হলে আজকের মতো সবার পক্ষে কম্পিউটার ব্যবহার করা সম্ভব হত না। সুতরাং কম্পিউটার প্রযুক্তি বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত বিকশিত ও উন্নীত হওয়ার পেছনে অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব যে অপরিসীম এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অপারেটিং সিস্টেমের গঠন

অপারেটিং সিস্টেম গঠিত হয় অনেকগুলো প্রোগ্রামের সমন্বয়ে। এ সব প্রোগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। কম্পিউটার চালু করার সঙ্গে সঙ্গে অপারেটিং সিস্টেম সক্রিয় হয় এবং কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের প্রধান স্মৃতিতে অপারেটিং সিস্টেমের মূল প্রোগ্রাম (Master Program) অবস্থান গ্রহণ করে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলার সময় অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য প্রোগ্রাম প্রধান স্মৃতিতে নিয়ে আসে। অপারেটিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য দু'টি প্রোগ্রাম হচ্ছে ক. নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম এবং খ. সেবামূলক প্রোগ্রাম।

নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম : নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম ৩ ভাগে বিভক্ত। যেমন–

- সুপারভাইজর প্রোগ্রাম
- জব কন্ট্রোল প্রোগ্রাম
- ইনপুট/আউটপুট প্রোগ্রাম

সুপারভাইজর প্রোগ্রাম : মূল প্রোগ্রাম (Master Program)-এর দায়িত্ব হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোর সাহায্যে কম্পিউটারের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করা। অপারেটিং সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত সুপারভাইজর প্রোগ্রামকেই মূল প্রোগ্রাম (Master Program), পরিবীক্ষণ (Monitor), কারনেল (Kernel), কোর (Core) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। তবে, প্রধানত সুপারভাইজর প্রোগ্রাম হিসেবেই উল্লেখ করা হয়। কম্পিউটার চালু করার সঙ্গে সঙ্গে অপারেটিং সিস্টেমের মূল প্রোগ্রাম বা সুপারভাইজর প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের প্রধান স্মৃতিতে অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যান্য প্রোগ্রাম থাকে সহায়ক স্মৃতিতে। সুপারভাইজর প্রোগ্রাম প্রয়োজন মতো অন্যান্য প্রোগ্রাম প্রধান স্মৃতিতে নিয়ে আসে এবং ঐ প্রোগ্রামের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। কাজ শেষ হওয়ার পর আবার সহায়ক স্মৃতিতে প্রেরণ করে।

জব কন্ট্রোল প্রোগ্রাম : কম্পিউটারের সাহায্যে পর্যায়ক্রমে কাজ করার জন্য অনেকগুলো কাজ সারিবদ্ধভাবে বা স্তূপাকারে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়। অপারেটিং সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের অন্তর্গত জব কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এই সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষমাণ কাজগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করে।

সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষমাণ কাজগুলো পর্যায়ক্রমে প্রক্রিয়াকরণের জন্য অপারেটিং সিস্টেমের নির্দেশগুলো লেখা হয় জব কন্ট্রোল ভাষা (Job Control Language) ব্যবহার করে। জব কন্ট্রোল ভাষায় লিখিত স্টেটমেন্ট বা বিবরণগুলো অপারেটিং সিস্টেমকে কাজের নাম এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় যে সকল ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে সে সব ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস বা যন্ত্রাদির নাম বলে দেয়। কোনো ভাষা অনুবাদের প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের নাম বলে দেয়। এ পদ্ধতিতে অপারেটিং সিস্টেম একবারে একটিমাত্র কাজের তত্ত্বাবধান করে বলে একে একক প্রোগ্রাম অপারেটিং সিস্টেম (Single Program OS) বলা হয়। অপারেটিং সিস্টেম যখন একই সঙ্গে একাধিক প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করে তখন তাকে বলা হয় কনকারেন্ট অপারেটিং সিস্টেম (Concurrent OS)।

এ অপারেটিং সিস্টেম একই সঙ্গে একাধিক প্রোগ্রামের জন্য বা কাজের জন্য ইনপুট/আউটপুট এবং স্মৃতি বরাদ্দ করতে পারে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারে। একটি কাজ যখন চলতে থাকে তখন অন্য একটি কাজের উপাত্ত
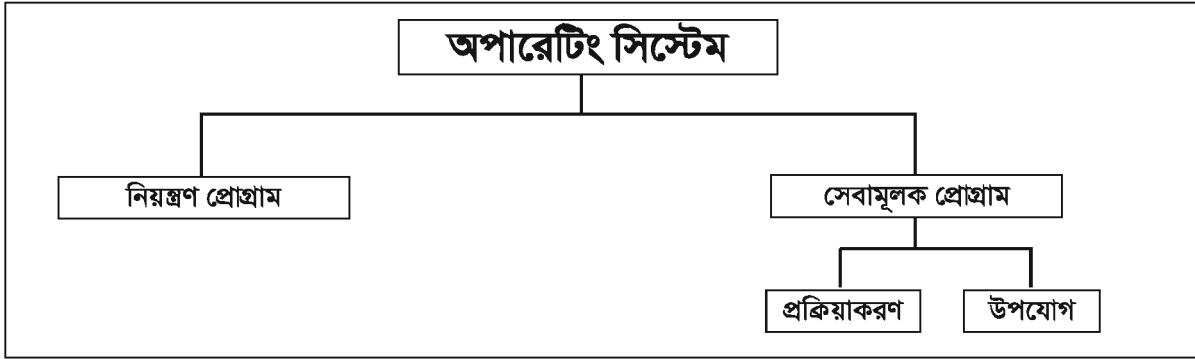
ইনপুট বাফার (Buffer)-এ জমা থাকে। বাফার হচ্ছে ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস এবং প্রক্রিয়াকরণ অংশের মধ্যবর্তী সময়ে সাময়িকভাবে উপাত্ত/তথ্য ধারণের স্থান।

ইনপুট/আউটপুট প্রোগ্রাম : অপারেটিং সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম হচ্ছে ইনপুট/আউটপুট প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামের সাহায্যে উপাত্ত বা ডাটা প্রক্রিয়াকরণ এবং আউটপুট পাওয়ার জন্য কম্পিউটারের ইনপুট এবং আউটপুট যন্ত্রাদির সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের কাজের সমন্বয় স্থাপিত হয়। কাজের সময় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে ইনপুট/আউটপুট প্রোগ্রাম কম্পিউটারের পর্দায় সতর্কতামূলক বার্তা প্রদর্শন করে।

সেবামূলক প্রোগ্রাম : সেবামূলক প্রোগ্রাম ২ ভাগে বিভক্ত। যেমন–
– প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম
– ইউটিলিটি প্রোগ্রাম বা উপযোগ প্রোগ্রাম

অপারেটিং সিস্টেমের সার্ভিস প্রোগ্রামের কাজ দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন– প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম এবং ইউটিলিটি প্রোগ্রাম।

প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম : প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করা। এ জন্য প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রামকে অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবেও অভিহিত করা হয়। কম্পিউটার তার নিজস্ব ভাষা বা যান্ত্রিক ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝে না। কিন্তু যান্ত্রিক ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা, ব্যবহার করা এবং পরিবর্তন করা জটিল কাজ। তাই মানুষের ব্যবহৃত ভাষার কাছাকাছি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। এ ভাষাকে বলা হয় উচ্চ স্তরের ভাষা। কম্পিউটার উচ্চ স্তরের ভাষা সরাসরি বোঝে না। তাই কম্পিউটারের সাহায্যে কাজ করানোর জন্য উচ্চ স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করা হয় অনুবাদ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে।

ইউটিলিটি প্রোগ্রাম : ইউটিলিটি প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য নানা প্রকার দায়িত্ব সম্পাদন করা। ইউটিলিটি প্রোগ্রামের কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপাত্ত ও রেকর্ডগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করে দেওয়া, বিন্যস্ত করা একাধিক ফাইল একীভূত করে সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত (Updated) একটি ফাইল তৈরি করা, ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস থেকে অন্য ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসে উপাত্ত স্থানান্তর করা ইত্যাদি। কোন কাজের জন্য কখন কোন ইউটিলিটি প্রোগ্রাম প্রয়োজন, তা জব কন্ট্রোল প্রোগ্রাম সুপারভাইজর প্রোগ্রামকে জানিয়ে দেয়। সুপারভাইজর প্রোগ্রাম তখন সহায়ক স্মৃতি থেকে জব কন্ট্রোল প্রোগ্রামের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি প্রোগ্রাম প্রধান স্মৃতিতে নিয়ে আসে।

অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ

কম্পিউটারের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুত গতিতে কাজ করার জন্য অপারেটিং সিস্টেম উন্নয়ন করা হয়েছে। ব্যবহারকারীদের চাহিদার ভিত্তিতে অনেক অগ্রসর অপারেটিং সিস্টেম তৈরি হয়েছে। তবে কাজ করার ধরন ও প্রক্রিয়ার

ভিত্তিতে অপারেটিং সিস্টেমগুলো কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন–

ক. টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম
খ. রিসোর্স শেয়ারিং
গ. ক্লায়েন্ট সার্ভার
ঘ. ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম
ঙ. রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম
চ. মাল্টিপ্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম
ছ. মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম
জ. ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি।

টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম : একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি কম্পিউটারের ব্যবহারকারীদের একই সঙ্গে কাজ করার জন্য টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর কাজ কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের প্রসেসর দ্বারা সম্পাদিত হয়। টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেমের সাহায্যে এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের প্রসেসর প্রত্যেক ব্যবহারকারীর কাজ সময় ভাগ করে সম্পাদন করে থাকে। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর সময় বরাদ্দ করা থাকে, ধরা যাক, ১ মিলিসেকেন্ড। একজন ব্যবহারকারীর কাজ ১ মিলিসেকেন্ডে করার পর প্রসেসর পরবর্তী ব্যবহারকারীর কাজ ১ মিলিসেকেন্ডে সম্পাদন করে। এরপর তার পরবর্তী ব্যবহারকারীর কাজ ১ মিলিসেকেন্ড করার পর তারও পরবর্তী ব্যবহারকারীর কাজ করে। এভাবে প্রত্যেকের জন্য ১ মিলিসেকেন্ড করে বরাদ্দ সময়কে বলা হয় টাইম স্লাইস (Time Slice)। মিলিসেকেন্ড সময়ের মধ্যে কম্পিউটার অসংখ্য নির্দেশ কার্যকর করতে পারে। এভাবে, ধরা যাক, দশজন ব্যবহারকারীর জন্য ১০ মিলিসেকেন্ড কাজ করে আবার প্রথম ব্যবহারকারীর নিকট ফিরে আসে। দশ মিলিসেকেন্ড ব্যবহারকারীদের জন্য এত কম সময় যে এই সময়ের ব্যবধান তাঁদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রত্যেক ব্যবহারকারীই মনে করেন যে, প্রসেসর শুধু তাঁর কাজটিই করছে।

রিসোর্স শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম : আশির দশকে পার্সোনাল কম্পিউটারের বাজার অভাবনীয় রূপে সম্প্রসারিত হয়। এ সময় পার্সোনাল কম্পিউটারের দামও দ্রুত কমে আসতে থাকে। ফলে পার্সোনাল কম্পিউটারের ব্যবহার এবং জনপ্রিয়তা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। পার্সোনাল কম্পিউটারের এই বিকাশ ও উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে টাইম শেয়ারিং নেটওয়ার্কের পরিবর্তে রিসোর্স শেয়ারিং (Resource Sharing) নেটওয়ার্কের সূচনা হয়। এ নেটওয়ার্কে সার্ভার এবং টার্মিনাল বা ওয়ার্কস্টেশনের নিজস্ব সিপিইউ এবং স্মৃতি থাকে। ওয়ার্ক স্টেশনগুলোর নিজস্ব স্মৃতি এবং সিপিইউ ব্যবহার করে যাবতীয় প্রক্রিয়াকরণের কাজ ওয়ার্ক স্টেশনগুলোতেই সম্পন্ন হয়। সার্ভার শুধু নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ওয়ার্কস্টেশনের জন্য সার্ভারে রক্ষিত তথ্য উপাত্ত এবং অন্যান্য উপকরণ (Peripherals) সমূহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী ওয়ার্ক স্টেশন প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম, তথ্য এবং উপাত্ত সার্ভার থেকে নিজস্ব স্মৃতিতে নিয়ে আসে এবং নিজস্ব সিপিইউ-এ প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে। প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত ফল প্রদর্শন ও ব্যবহারের পর প্রোগ্রাম, তথ্য ও উপাত্ত আবার সার্ভারের ডিস্কে পাঠিয়ে দেয়।

রিসোর্স শেয়ারিং পদ্ধতিতে সার্ভার শুধু তত্ত্বাবধান-তদারকির দায়িত্ব পালন করে। রিসোর্স শেয়ারিং নেটওয়ার্কের কর্মদক্ষতা এবং ক্ষমতা নির্ভর করে ওয়ার্ক স্টেশনগুলোর ওপর। কাজেই প্রয়োজন হলে যে কোনো সময় ওয়ার্কস্টেশন পরিবর্তন করে শক্তিশালী ওয়ার্কস্টেশন যুক্ত করা যায়। রিসোর্স শেয়ারিং নেটওয়ার্কে সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশনগুলোর মধ্যে প্রচুর তথ্য, উপাত্ত এবং প্রোগ্রামের অংশবিশেষ অনবরত যাতায়াত করে। ফলে যাতায়াত পথে চাপ পড়ে। চাপের পরিমাণ বেশি হলে যাতায়াত পথে তথ্যজট বা ডাটা ট্রাফিক জ্যাম (Data Traffic Jam) দেখা দিতে পারে।

এ ছাড়া ওয়ার্কস্টেশনের সংখ্যা বেশি হলে এবং দূরত্বে অবস্থিত হলেও সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ক্লায়েন্ট সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম : টাইম শেয়ারিং (Time Sharing) নেটওয়ার্ক এবং রিসোর্স শেয়ারিং (Resource Sharing) নেটওয়ার্ক পদ্ধতি দুটির সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাগুলো দূর করে আরও অগ্রসর নেটওয়ার্ক পদ্ধতি হিসাবে তৈরি করা হয়েছে ক্লায়েন্ট সার্ভার (Client Server) নেটওয়ার্ক। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশন (Workstation) উভয় কম্পিউটারেই নিজস্ব CPU এবং Memory-এর সাহায্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজের সুযোগ রয়েছে।

ওয়ার্কস্টেশনের পিসিতে গ্রাফিক্স, ইন্টারএ্যাকটিভ ইউজার ইন্টারফেস (Interactive User Interface), সহজলভ্য প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য সুযোগ কাজে লাগানো যায়। এছাড়া ওয়ার্কস্টেশন সার্ভারের রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে বা শেয়ার করতে পারে এবং সার্ভার আবার ওয়ার্কস্টেশনকে জটিল কাজে সরাসরি সহায়তা করতে পারে। এ জন্য ওয়ার্কস্টেশনকে বলা হয় সার্ভার ক্লায়েন্ট। এ নেটওয়ার্ক পদ্ধতিকে বলা হয় ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার (Client Server Architecture)। এ নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য ক্লায়েন্ট সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম : ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন ব্যবহারকারীর টার্মিনালের তথ্যাদি একটি নির্দিষ্ট স্মৃতি ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে সঞ্চিত উপাত্তগুলোর প্রক্রিয়াকরণের কাজ একযোগে (In a batch) শুরু ও শেষ হয়। যেমন– ব্যাংকে সারা দিনের লেনদেনের তথ্য বিভিন্ন কাউন্টারের টার্মিনাল থেকে মূল কম্পিউটারের সহায়ক স্মৃতিতে জমা হতে থাকে। অফিস সময় শেষে সবগুলো উপাত্ত একযোগে প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে প্রেরিত হয়। প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট উপাত্তগুলো পর্যায়ক্রমে প্রক্রিয়াকরণ করে। এ জন্য ব্যাচ প্রসেসিং পদ্ধতিকে সিরিয়াল (Serial) প্রসেসিং, সিকুয়েন্সিয়াল (Sequential) প্রসেসিং, অফ লাইন (Off-line) প্রসেসিং এবং স্তূপীকৃত কাজ (Stacked Job) প্রসেসিং হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।

অনেক কাজ এক সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ করার ফলে ব্যাচ প্রসেসিং পদ্ধতিতে বিলম্বজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এতে অনেক অগ্রাধিকারমূলক, গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফল পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কাজের ব্যাপ্তি দ্রুত বিস্তৃত হওয়ার ফলে এ সমস্যা আরও বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইন্টারএ্যাকটিভ অপারেটিং সিস্টেম (Interactive Operating System) প্রবর্তিত হয়। তবে ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে। কিছু কিছু কাজ আছে যার জন্য ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমই বিশেষভাবে উপযোগী। বিশেষ করে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। আবার ইন্টারএ্যাকটিভ অপারেটিং সিস্টেম ও ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম একই সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– একাউন্ট হোল্ডারদের চেকের বিনিময়ে টাকা প্রদান, সর্বশেষ জমা টাকার পরিমাণ জানান ইত্যাদি কাজগুলো ইন্টারএ্যাকটিভ প্রক্রিয়ায় (Interactive System) এবং টাকা জমা নেওয়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার লেনদেন ব্যাচ প্রসেসিং পদ্ধতিতে হতে পারে। ব্যাংক, বীমা, বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম : রিয়েল টাইম (Real Time) হচ্ছে তাৎক্ষণিক বা প্রকৃত সময়। রিয়েল টাইম পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক ফল প্রদর্শিত হয়। রিয়েল টাইম পদ্ধতি বা অপারেটিং সিস্টেমে প্রত্যেকটি টার্মিনাল থেকে প্রাপ্ত ইনপুটের ফল সঙ্গে সঙ্গে পেতে হয়। এ পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত টার্মিনালগুলো উচ্চ গতি সম্পন্ন টেলিযোগাযোগ লাইনের মাধ্যমে এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রসেসরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এ পদ্ধতিতে একইসঙ্গে একাধিক টার্মিনালে কাজ চলতে পারে। বিমান, রেল ইত্যাদির টিকেট বুকিং, বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম অপরিহার্য। বিমান বা রেল টিকেট বুকিংয়ে আসা যাত্রীকে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে

হ্যাঁ বা না বলতে হবে বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। অনেক ব্যস্ত বিমান বন্দরগুলোতে প্রতি মিনিটে বিমান অবতরণ করছে, বিমান বন্দর থেকে বিমান উঠে যাচ্ছে। এদের ওঠা-নামার সময়সূচি এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয় কম্পিউটারের সাহায্যে এবং অবশ্যই রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সময় নির্ধারণে সামান্য হেরফের হলে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আশংকা থাকে। এ ছাড়া তাপ, চাপ ও বায়ুর চাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, কোনো একটি কারখানার কোনো একটি কক্ষের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সেন্সর বসানো আছে। ঐ সেন্সরটি কক্ষের প্রতি মুহূর্তের উত্তাপের ওঠা-নামার উপাত্ত কম্পিউটারে প্রেরণ করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সতর্ক থাকার পর্যায় নির্দেশিত হচ্ছে। কক্ষের উত্তাপ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি কম্পিউটারে ঐ উপাত্ত ও আউটপুট প্রদর্শিত না হয়, তাহলে কক্ষে বিদ্যমান মালামাল ও উপকরণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকি অগ্নিকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হতে পারে। একইভাবে বিমানের অভ্যন্তরের চাপ নিয়ন্ত্রণে রিয়েল টাইম সিস্টেম অপরিহার্য। বায়ু চাপের প্রতি মুহূর্তের অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া না গেলে বায়ুর চাপ কম বা বেশি হয়ে যাওয়ার ফলে যাত্রীদের মৃত্যু ঘটতে পারে।

মাল্টিপ্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম : মাল্টি (Multi) শব্দের অর্থ হচ্ছে দুয়ের অধিক। কিন্তু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে দুটি প্রসেসর বিশিষ্ট সিস্টেমকেও মাল্টিপ্রসেসর হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে, মাল্টিপ্রসেসর সিস্টেমে দুটির বেশি প্রসেসরও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। মাল্টিপ্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন প্রোগ্রাম, নির্দেশ বা স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম একই সঙ্গে একাধিক প্রসেসর কার্যকর করতে পারে। আবার বিভিন্ন প্রসেসর একই সঙ্গে প্রোগ্রামের বিভিন্ন নির্দেশ কার্যকর করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অপারেটিং সিস্টেমের সুপারভাইজর প্রোগ্রাম বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য স্মৃতির পরিমাণ বরাদ্দ করে এবং ইনপুট /আউটপুট প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মাল্টিপ্রসেসিং সিস্টেমে ব্যবহৃত একাধিক প্রসেসরের মধ্যে ছোট প্রসেসরটিকে বলা হয় সম্মুখ-প্রসেসর (Front-end processor)।

সম্মুখ-প্রসেসরের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভিন্ন টার্মিনাল বা ইনপুট ডিভাইসগুলো থেকে আগত কাজ নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রধান প্রসেসরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা। সম্মুখ-প্রসেসর আগত কাজগুলো এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে করে বড় প্রসেসর বা প্রসেসরগুলো জটিল ও বড় প্রোগ্রামগুলো প্রক্রিয়াকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

অনেক সময় ফাইল ব্যবস্থাপনা, কাজের অনুক্রম রক্ষা, সম্পাদনা ইত্যাদি কাজের জন্য পৃথক পৃথক ছোট প্রসেসর ব্যবহার করা হয় এবং প্রধান প্রসেসরকে শুধুমাত্র বড় ও জটিল কাজ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। মাল্টিপ্রসেসিং সিস্টেমে একাধিক বড় প্রসেসরও থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের পৃথক পৃথক প্রধান স্মৃতি থাকতে পারে। আবার একই প্রধান স্মৃতি ব্যবহার করে কাজ করতে পারে অথবা উভয়েরই পৃথক ও যৌথভাবে ব্যবহারযোগ্য স্মৃতিতে প্রবেশের সুযোগ থাকতে পারে।

মাল্টিপ্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম প্রসেসরগুলোর কাজ সামগ্রিক বা আংশিকভবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মাল্টিপ্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেমে ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রসেসর নির্দিষ্ট থাকতে পারে। যেমন– কোনো কোনো প্রসেসর ইন্টারএ্যাকটিভ (Interactive) ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য এবং কোনো কোনো প্রসেসর ব্যাচ প্রসেসিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকতে পারে।

মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম : একই সাথে একাধিক প্রোগ্রাম কাজ করতে পারে বলে এই পদ্ধতিকে মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম বলে। এই পদ্ধতিতে একই সাথে একাধিক প্রোগ্রাম স্মৃতির নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমান্তরালভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। মনিটর নামে একটি প্রোগ্রাম এগুলোকে স্মৃতির স্থান দখল করতে সহায়তা করে থাকে। ইউনিক্স, আইবিএম/ভিএম, আইবিএম, ওস/ ৪০০ ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি প্রোগ্রামিং সিস্টেমের উদাহরণ।

ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম : একাধিক কম্পিউটারের সিস্টেম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কম্পিউটারের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমকে ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম বলে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকগুলো কম্পিউটারের মধ্যে সহজেই একটি অভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। ফলে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক কম খরচে এ ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়।

এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের প্রকারভেদ

এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম (Application Program) বা ব্যবহারিক কর্মসূচি হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম হচ্ছে কাজ করার উপকরণ বা অবলম্বন। যেমন– লেখার জন্য কলম বা বলপেন, ছবি আঁকার জন্য রং-তুলি এবং নক্সা করার জন্য কাঁটা-কম্পাস, স্কেল, পেন্সিল ইত্যাদি হচ্ছে অপরিহার্য উপকরণ বা অবলম্বন। এর একটি দিয়ে অন্যটির কাজ চলে না। প্রত্যেকটি কাজের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে কম্পিউটারের সাহায্যে একেক ধরনের কাজের জন্য একেক ধরনের উপকরণ-অবলম্বন বা কর্মসূচির প্রয়োজন হয়। এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন– প্যাকেজ সফটওয়্যার (Package Software) এবং কাস্টমাইজড সফটওয়্যার (Customized Software)।

প্যাকেজ সফটওয়্যার

কাজের ধরন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজ সফটওয়্যারগুলো বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। নৈমিত্তিক কাজের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি প্যাকেজ সফটওয়্যার হচ্ছে–

১. লেখালেখির কাজের জন্য– ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম
২. হিসেব-নিকেশের জন্য– স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম
৩. পৃষ্ঠা সজ্জার জন্য– পেজ মেকআপ প্রোগ্রাম
৪. ছবি সম্পাদনার জন্য– ইমেজ এডিটিং প্রোগ্রাম
৫. অংকন বা চিত্রকলাধর্মী কাজের জন্য– গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম
– ইত্যাদি আরও বিভিন্ন প্রকার এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম রয়েছে।

প্যাকেজ সফটওয়্যারগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্দিষ্ট ধরনের কাজের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা সমম্বয়ে এ ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। ব্যবহারকারী যাতে তাঁর প্রয়োজনীয় কাজটি পরিপূর্ণরূপে করতে পারেন সে দিকে খেয়াল রেখেই প্যাকেজ সফটওয়্যার তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, প্রথম চেষ্টাতেই একটি পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার তৈরি করা সম্ভব হয় না। সফটওয়্যারটি ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছার পর তিনি যখন কাজ করতে শুরু করেন তখন দেখা যায় আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকার প্রয়োজন ছিল। কোনো কোনো বিষয়ে ভালো কাজ করছে না। এভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ভেতর দিয়ে সফটওয়্যারটিকে আরও ত্রুটিমুক্ত এবং আরও অগ্রসর কাজের উপযোগী করে তোলা হয়। যেমন– একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার তৈরির সময় লেখালেখির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত রকম প্রয়োজনীয় কাজ থাকতে পারে সে বিষয়ে ব্যাপকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। তারপরেও অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। এ সব কাজ সম্পন্ন করে একেকটি সফটওয়্যারের উন্নত সংস্করণ তৈরি করা হয়।

একটি প্যাকেজ সফটওয়্যারের সাহায্যে অসংখ্য ব্যবহারকারী একই রকমের কাজ করতে পারেন। কিন্তু, কোনো ব্যবহারকারী তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়তি কোনো কাজ করতে পারেন না। যেমন– স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে সকল ব্যবহারকারী একই রকমের হিসেব-নিকেশের কাজ করতে পারবেন। কোনো ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মতো করে কোনো কাজ করতে পারবেন না। তবে, একটি প্যাকেজ সফটওয়্যার দিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ের কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করা যায়।

কাস্টমাইজড সফটওয়্যার

অনেক সময় ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাঁর মতো করে সফটওয়্যার তৈরি করে নিতে হয়। এ ধরনের সফটওয়্যারকে বলা হয় কাস্টমাইজড সফটওয়্যার। সব শিল্প-কারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো একই নিয়মে ও পদ্ধতিতে তাদের হিসেবের কাজ করে না। সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যবসায়ের প্রকৃতিও এক রকম নয়। কাজেই, একেক শ্রেণীর শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য একেক রকমের সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিল্প-কারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্বতন্ত্র সফটওয়্যার তৈরি করিয়ে নিতে হয়। যেমন– গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির হিসেব-নিকেশের কাজের ধরনের সঙ্গে একটি পাটকলের হিসেব-নিকেশের কাজের প্রকৃতি এক রকমের হয় না। একই সফটওয়্যারের সাহায্যে এরূপ ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরি করিয়ে নিতে হবে।

একটি কাস্টমাইজড সফটওয়্যারও একবারে পূর্ণাঙ্গরূপে তৈরি করা যায় না। প্রাথমিকভাবে তৈরি সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করতে হয় এবং নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে হয়। এভাবে ধাপে ধাপে কাস্টমাইজড সফটওয়্যারটি পূর্ণতা লাভ করে।

অপারেটিং সিস্টেমের বিবর্তন ও বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ

শুরুর পর্যায়ে কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার জন্য কার্ড ব্যবহার করা হত। কার্ডে তথ্য, নির্দেশ ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হত। কার্ড রিডার এ তথ্য, নির্দেশ পাঠ করত। কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট কার্ড রিডার থেকে এ তথ্য গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করত। প্রক্রিয়াকরণের পর লাইন প্রিন্টারে ফলাফল বা আউটপুট মুদ্রিত হত। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি কাজের জন্য কার্ডে সম্পূর্ণ কাজ বা প্রোগ্রামটি প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ সন্নিবেশিত করে দিতে হত। এতে সময় লাগত অনেক বেশি। কার্ড রিডার থেকে যে সময় নিয়ে তথ্য নির্দেশ পাঠ করত কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশে ততক্ষণ কিছুই করার থাকত না। কার্ড রিডারের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ অংশকে অলসভাবে অপেক্ষা করতে হত। ফলে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের পুরো ক্ষমতা কাজে লাগান সম্ভব হত না। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট সেকেন্ডে কয়েক লক্ষ নির্দেশ কার্যকর করতে পারত। পক্ষান্তরে, মাত্র এক হাজার কার্ড পাঠ করতে কার্ড রিডারের সময় লাগত এক মিনিট। সময়ের এই ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য বাফার পদ্ধতিতে কাজ করার চিন্তা করা হয়। ম্যাগনেটিক টেপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই বাফার পদ্ধতিতে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ম্যাগনেটিক টেপ অনেক বেশি গতি সম্পন্ন।

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ সরাসরি ম্যাগনেটিক টেপ থেকে তথ্য, নির্দেশ সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে আউটপুট অংশের ম্যাগনেটিক টেপে পাঠিয়ে দেয়। এ অংশের ম্যাগনেটিক টেপ থেকে প্রিন্টার আউটপুট সংগ্রহ করে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন করে। এতে কাজের গতি বাড়ে। কিন্তু একটি সমস্যা থেকে যায়। টেপের এক অংশে কাজ করার সময় অন্য অংশের তথ্য পাঠ করা যায় না। ফলে একটি কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ করার পর অন্য কাজ শুরু করতে হয়।

ডিস্ক আবিষ্কৃত হওয়ার পর এ অসুবিধা দূর হয়। তখন একই সঙ্গে একাধিক কাজ করা সম্ভব হয়। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট একই সঙ্গে কার্ড রিডার থেকে তথ্য, নির্দেশ ও প্রক্রিয়াকরণ করে ডিস্কে পাঠাতে পারে এবং ডিস্কে রাখা তথ্য, নির্দেশ নিয়ে প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে পারে, প্রিন্টার মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে কাজ করার নিয়মকে বলা হয় স্পুলিং।

কার্ড রিডার থেকে ডিস্ক পর্যন্ত উন্নয়নের ধাপগুলো সম্পন্ন হওয়ার পরও একটি অসুবিধা থেকে যায়। প্রতিটি কাজের নির্দেশ প্রতিবারেই নতুন করে লিখতে হয়। ব্যবহারকারীরা অনুভব করেন যে, ইনপুট, আউটপুটসহ তথ্য পরিচালনার কিছু কাজ অভিন্ন এবং স্থায়ীভাবে করা সম্ভব হলে কম্পিউটারের ব্যবহার আরও অর্থপূর্ণ করা সম্ভব হবে। এ চিন্তা ও চাহিদা থেকেই অপারেটিং সিস্টেম বা পরিচালনা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়।

প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধরনের ডিস্ক পরিচালনার কথা ভেবে অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন অনুভূত হয় বলে বহুদিন পর্যন্ত এর নাম ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম ছিল।

এ্যাটলাস

পঞ্চাশের শেষার্ধ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে উদ্ভাবিত এ্যাটলাস (Atlas) অপারেটিং সিস্টেম উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অপারেটিং সিস্টেমের ডিজাইন করা হয়। এ অপারেটিং সিস্টেমের অনেক বৈশিষ্ট্য এখনকার আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এ্যাটলাস অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান অংশই ডিভাইস ড্রাইভারগুলো ম্যাগনেটিক টেপ, পেপার টেপ রিডার, পেপার টেপ পাঞ্চ, কার্ড রিডার/ কার্ডপাঞ্চ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাজ দক্ষভাবে সম্পাদন করত। এ্যাটলাস অপারেটিং সিস্টেমের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল এর স্মৃতি ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য। প্রধান স্মৃতি হিসেবে ড্রাম ব্যবহার করা হত এবং ড্রাম স্মৃতির ক্যাশ (Cache) হিসেবে কিছু অংশ কোর হিসাবে কাজে লাগানো হত। প্রয়োজনে যে কোনো পৃষ্ঠা প্রধান স্মৃতিতে নিয়ে আসা যেত। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্রাম এবং কোর স্মৃতির তথ্য বিনিময়ের জন্য এ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। পরবর্তীকালে আরও অনেক অপারেটিং সিস্টেম প্রচলিত হয়। এর মধ্যে ইউনিক্স, সিপিএম, ডস, ও-এস-২, উইন্ডোজ, লিনাক্স, ম্যাক ওএস ইত্যাদি।

বর্তমানের মাইক্রোকম্পিউটারের কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেম

বর্তমানে পার্সোনাল কম্পিউটারে উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা, লিনাক্স, ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেম এবং এ্যাপলের মেকিনটোশ পরিবারের পার্সোনাল কম্পিউটারে মেকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেম (Mac OS) ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে মাইক্রোকম্পিউটারের কয়েকটি জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেমের বর্ণনা দেওয়া হল।

ম্যাক ওএস : ১৯৮৪ সালে এ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানি মেকিনটোশ নামের একটি ৩২ বিটের কম্পিউটার বাজারে ছাড়ে। মটোরোলা ৬৮০০০ পরিবারের মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি এই কম্পিউটারগুলোতে ব্যবহার করার জন্য প্রথমে লিজা অপারেটিং সিস্টেম ও পরে ম্যাক ওএস (Mac OS) তৈরি করা হয়। ম্যাক ওএস-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটি ব্যবহার করা খুব সহজ। এটি একটি চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম। এতে মাউস, পুলডাউন মেনুসহ এমন সহজ গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস আছে যার সাহায্যে কম্পিউটার বিষয়ে অতি সাধারণ জ্ঞান নিয়ে যে কেউ যে কোনো কাজ করতে পারে। ম্যাক ওএস-এর গ্রাফিক্স ও রঙের ব্যবহার অত্যন্ত চমৎকার। ম্যাক ওএস কেবলমাত্র এ্যাপল কম্পিউটার-এর তৈরি করা মেকিনটোশ কম্পিউটারেই ব্যবহার করা যায়। ২০০০ সাল থেকে ম্যাক ওএস-এর সিস্টেম ১০ সংস্করণ বাজারজাত হচ্ছে। ২০০৮ সাল থেকে ম্যাক ওএস-এর ১০.৫ সংস্করণ প্রচলিত আছে।

উইন্ডোজ ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমসমূহ : মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমসমূহ বাজারে আসার পর থেকে ডস অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমে আসতে থাকে। এখন আর ডস অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহার নেই। একদিকে ডস থেকে উইন্ডোজ আপগ্রেড করার জন্য তৈরি করা হয় উইন্ডোজ– যেটি ডসের ওপর নির্ভর করত, অন্যদিকে উইন্ডোজ-৯৫ ও ৯৮ এমইকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেটম হিসাবে তৈরি করা হয়। একইভাবে উচ্চতর পর্যায়ের ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয় উইন্ডোজ এনটি। এনটি ৪.০ এর পর ৫.০ এর নামকরণ করা হয় উইন্ডোজ ২০০০ যা ফেব্রুয়ারি ২০০০ থেকে বাজারজাত হয়। উইন্ডোজ পরিবারের সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে উইন্ডোজ ভিস্তা।

উইন্ডোজ : উইন্ডোজ ছিল ডস (DOS) নির্ভর একটি অপারেটিং সিস্টেম। এটি ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ্যাপল কম্পিউটার থেকে লাইসেন্সের সাহায্যে মূল প্রযুক্তি গ্রহণ করে আমেরিকার মাইক্রোসফট কর্পোরেশন উইন্ডোজ (Windows) অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করে। এটি মূলত ডসের একটি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। ডসকে মঞ্চ

হিসাবে ব্যবহার করেই উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (৩.১ সংষ্করণ পর্যন্ত) কাজ করে। এই সিরিজের উইন্ডোজের সর্বশেষ ছিল ৩.১। এ সংস্করণ যেহেতু ডসের সাহায্য নিয়ে কাজ করে সেহেতু এটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম বলা হয় না।

উইন্ডোজ ৯৫/৯৮ এমই : উইন্ডোজ ৯৫ হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম। ১৯৯৫ সালের ২৪শে আগস্ট এটি বাজারে আসে। এই অপারেটিং সিস্টেমটি সারা দুনিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের মধ্যে এ নিয়ে প্রচুর সাড়া পড়ে যায়। এটি একটি ৩২ বিটের স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম। উইন্ডোজ ৯৫ চালানোর জন্য ডস-এর প্রয়োজন হয় না। ডস নির্ভর উইন্ডোজের চেয়ে এতে অনেক বেশি কাজের সুবিধা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল ডসের যে সব সীমাবদ্ধতার জন্য আজকালের কম্পিউটারের পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করা যায় না তা এই অপারেটিং সিস্টেমে দূর করা হয়। এতে অনেক নতুন বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর সাহায্যে কম্পিউটার ব্যবহারকারী খুব সহজে কম্পিউটার পরিচালনা করতে পারবেন। ডস নির্ভর উইন্ডোজ ব্যবহারকারীরা অনায়াসেই উইন্ডোজ ৯৫-এ কাজ করতে পারবেন। উভয়ের মূল পরিবেশটি প্রায় একই রকমের। উইন্ডোজ ৯৫কে অনেকাংশেই মেকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেমের কাছাকাছি মনে করা হয়। উইন্ডোজ-৯৫ উইন্ডোজ ৯৮-এ উন্নীত করা হয়। এর সর্বশেষ সংস্করণ ছিল উইন্ডোজ এমই (Windows 95/98 ME)।

উইন্ডোজ এনটি/২০০০ : আমেরিকার মাইক্রোসফট কর্পোরেশন উইন্ডোজ ৯৫ প্রকাশের আগেই একটি ৩২ বিটের অপারেটিং সিস্টেম বাজারে ছাড়ে। এটি বস্তুত পার্সোনাল কম্পিউটারের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সিস্টেম। এর রয়েছে একটি অতি চমৎকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এক সাথে একাধিক এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম চালানো ছাড়াও বহু কম্পিউটার ব্যবহার করার সুবিধার জন্য এটি কম্পিউটারে বড় ধরনের কাজ করতে পারে অনায়াসে। তবে এটি তৎকালীন প্রচলিত সাধারণ মানের কম্পিউটারে চালানো যেত না এবং এতে ব্যয়বহুল মেমোরি ব্যবহার করতে হত বলে খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। এনটির আরও একটি অসুবিধা ছিল যে এটি বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম ছিল। এসব অসুবিধার কথা বিবেচনা করে মাইক্রোসফট এনটি ৪.০ সংস্করণে উইন্ডোজ ৯৫/৯৮-এর ইউজার ইন্টারফেসটি প্রচলন করে উইন্ডোজ-২০০০ এনটি আরও উন্নত করা হয়।

ইউনিক্স : ইউনিক্স (UNIX) হচ্ছে প্রধানত একটি উচ্চ পর্যায়ের অপারেটিং সিস্টেম। মেইনফ্রেম কম্পিউটার থেকে শুরু করে মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটারে ইউনিক্স (UNIX) অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা যায়। মাল্টিটাস্কিং (Multitasking) এবং মাল্টিইউজার এপ্লিকেশন (Multiuser Application)-এর জন্য ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম খুবই উপযোগী। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে এ টি এন্ড টি বেল ল্যাবরেটরি (AT & T Bell Labroratories)-তে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম উন্নয়ন করা হয়। মূলত অগ্রসর গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানীরাই অত্যাধুনিক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেছিলেন।

লিনাক্স : ইউনিক্সকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা লিনাক্স নামক একটি অপারেটিং সিস্টেম ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে। ফিনল্যান্ডের এক যুবক লিনাস টারভোল্ডস এই অপারেটিং সিস্টেমটির উন্নয়ন করেন যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই অপারেটিং সিস্টেমটির সোর্স কোডও বিনামূল্যে পাওয়ায় ব্যবহারকারী নিজে এর উন্নয়ন বা কাস্টমাইজ করতে পারেন। এর বিভিন্ন সংস্করণ পাওয়া যায়।।

বিই ওএস : ইনটেল এবং পাওয়ার পিসি প্রসেসরের জন্য প্রস্তুত করা বিই ওএস (Be-OS) একটি আধুনিক অপারেটিং সিস্টেম। এর জনপ্রিয়তা তেমন ব্যাপক না হলেও একুশ শতকের অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে এটি যথেষ্ট উন্নত। বিই ওএস প্রকাশ করে জি লুই গ্যাসে কর্তৃক ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত বিই ওএস।

সিপি/এম : ইনটেলের ৮-বিট বিশিষ্ট ৮০৮০ মাইক্রোপ্রসেসর এবং জাইলগ (Zilog)-এর জেড-৮০ মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম ছিল সিপি/এম (CP/M)। সিপি/এম হচ্ছে Control Programme for

Microprocessor- এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সত্তর দশকের শেষের দিকে তখনকার পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য ফ্লপি ডিস্ক উদ্ভাবিত হওয়ার পর সিপি/এম অপারেটিং সিস্টেম তৈরি হয়। তখনকার মাত্র ১৬ কিঃ বাঃ RAM বিশিষ্ট কম্পিউটারের জন্য এ অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করা হয়। সিপি/এম দৃশ্যত এমএস-ডস (MS-DOS) অপারেটিং সিস্টেমের মতো। এমএস-ডস আসলে সিপি/এম-এর ক্লোন হিসেবে তৈরি হয়েছিল। সিপি এম এখন আর তেমন ব্যবহার করা হয় না।

এমএস-ডস : এমএস-ডস (MS-DOS=Microsoft Disk Operating System) ছিল আইবিএম এবং আইবিএম পিসি কম্পাটিবল কম্পিউটারের ব্যবহারকারীদের জন্য প্রমিত (Standard) অপারেটিং সিস্টেম। ১৯৮১ সাল থেকে এমএস-ডস-এর ব্যবহার শুরু হয়।

ওএস/২ : ১৯৮৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন (আইবিএম) তাদের প্রচলিত আইবিএম পিসি ধরনের কম্পিউটারের বদলে পার্সোনাল সিস্টেম-২ জাতীয় কম্পিউটার বাজারে ছাড়ে। আইবিএম-এর এই নতুন প্রজন্মের কম্পিউটারের জন্য মাইক্রোসফট কর্পোরেশন অপারেটিং সিস্টেম/২ বা ওএস/২ (OS/2) নামের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও নতুন প্রজন্মের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করে। এটি একটি ৩২ বিটের অপারেটিং সিস্টেম এবং এতে ডসের সীমাবদ্ধতা নেই। এমএস-ডস মাত্র ৬৪০ কিঃ বাঃ র‍্যাম-এ কাজ করে। কিন্তু ওএস/২ (OS/2) ১৬ মেগাবাইট পর্যন্ত র‍্যাম (RAM)-এ কাজ করতে পারে।

এআইএক্স ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম : ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম আইবিএম ওয়ার্কস্টেশন, মিনিফ্রেম ও মেইনফ্রেম কম্পিউটার এবং ৮০৩৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর বিশিষ্ট পিএস/২ কম্পিউটারে এআইএক্স (AIX) অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা যায়। এআইএক্স (AIX), এইউএক্স (AUX), জেনিক্স (XENIX) ইত্যাদি ছিল ইউনিক্সের ভিত্তিতে তৈরি অপারেটিং সিস্টেম।

পাওয়ার ওপেন : আইবিএম, এ্যাপল এবং মটোরোলা কনসোর্টিয়াম পাওয়ার পিসি নামে নতুন মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করেছে। ইনটেল এবং মটোরোলার তৈরি মাইক্রোপ্রসেসরের চেয়ে পাওয়ার পিসি মাইক্রোপ্রসেসর অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অগ্রসর বলে দাবি করা হয়। এই মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য পাওয়ার ওপেন (Power open) নামে অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরে এই প্রকল্প বাদ দেওয়া হয়।

উইন্ডোজ এক্সপি : উইন্ডোজ পরিবারের সর্বাধিক জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম ছিল উইন্ডোজ এক্সপি। এটি উইন্ডোজ এনটি ও উইন্ডোজ ২০০০-এর পরবর্তী সংস্করণ। তবে, মাইক্রোসফট এখন আর এটি বাজারজাত করে না।

উইন্ডোজ ভিস্তা : মাইক্রোসফটের সর্বশেষ অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ ভিস্তা। এর ৩২ বিট এবং ৬৪ বিট সংস্করণ রয়েছে। পার্সোনাল কম্পিউটারের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে এ অপারেটিং সিস্টেমটি একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। কারণ, এর ফলে ৬৪ বিট কম্পিউটিংয়ের দুনিয়া সাধারণ পিসি ব্যবহারকারীদের হাতের নাগালে এল।

চিত্র-ভিত্তিক এবং বর্ণ-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম

মাইক্রোকম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করার দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে। যথা বর্ণ-ভিত্তিক (Text based) এবং চিত্র-ভিত্তিক (Graphical User Interface)। বর্ণ-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কী-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং কী-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে হয়। ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহারের সকল পর্যায়ের কাজই কী-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে করতে হয়। পক্ষান্তরে, চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে এ সব কাজ করতে হয় বিভিন্ন প্রকার আইকন (Icon) এবং পুল-ডাউন মেনু কমান্ড ব্যবহার করে। আইকন (Icon) হচ্ছে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম, ফাইল, ফোল্ডার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারের প্রতীকী চিত্র। আইকন এবং পুল-ডাউন মেনু কমান্ড নির্বাচন, ব্যবহার এবং কার্যকর করা হয় মাউসের সাহায্যে।

মাইক্রোকম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত বর্ণ-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে ডস (DOS=Disk Operating System) এবং ইউনিক্স (UNIX)। চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ, উইন্ডোজ ৯৫/৯৮/এমই, উইন্ডোজ এনটি ৪.০, ২০০০, এক্সপি, ভিস্তা এবং ম্যাক ও.এস ইত্যাদি। ডস, ইউনিক্স, লিনাক্স, উইন্ডোজ ৩.১১ (ডস নির্ভর), উইন্ডোজ ৯৫, উইন্ডোজ ৯৮, উইন্ডোজ এনটি ৪.০, ২০০০/এক্সপি, ভিস্তা আইবিএম পিসি এবং আইবিএম পিসি কম্পাটিবল কম্পিউটারে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম। ম্যাক ও.এস মেকিনটোশ কম্পিউটারে ভারচুয়াল পিসি নামক একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে তাতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম চালান যায়। এ ছাড়া ইউনিক্স ও লাইনাক্সের মেকিনটোশ সংস্করণও পাওয়া যায়। বিইওএস নামক একটি অপারেটিং সিস্টেমের পিসি ও ম্যাক সংস্করণ রয়েছে।

পিসির প্রথম অপারেটিং সিস্টেম হল সিপিএম। এটির পর পিসিতে প্রো-ডস অপারেটিং সিস্টেম প্রচলিত হয়। ১৯৮১ সালে এমএস-ডস (MS-DOS) বা মাইক্রোসফট ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম প্রচলিত হয়। এমএস-ডস শুধু ডস (DOS) হিসেবে উল্লিখিত হয়। এই অপারেটিং সিস্টেমের ভিত্তি হিসেবে সিপিএম ও.এসকে ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ডস অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান সমস্যা ছিল ৬৪০ কিঃবাঃ র‍্যাম স্মৃতির সীমাবন্ধতা। এ ছাড়া ডস অপারেটিং সিস্টেমে মাল্টিটাস্কিংয়ে সুযোগও ছিল না। এ সব অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে ডস অপারেটিং সিস্টেমের বহুমুখী উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে এবং সর্বশেষ প্রচলিত ডস-এর ৬.০ সংস্করণে অনেকটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস বা চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের মতো কাজের সীমিত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে ইদানীং কেবলমাত্র অতীতের ফাইল বা প্রোগ্রামের সাথে কম্পাটিবিলিটি বজায় রাখার জন্যই কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ডস ব্যবহার করা হয়।

চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের সূচনা র‍্যাংক জেরক্স কোম্পানির পাওলো আলতো গবেষণাগারে। তাদের পাওলো এবং স্টার কম্পিউটারে এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের সাথে মাউসের সম্পর্ক রয়েছে। সেটিরও সূচনা পাওলো এবং স্টার থেকে। তবে ১৯৮৩ সালে এ্যাপল কম্পিউটারের লিজা এবং ১৯৮৪ সালে এ্যাপল-এর মেকিনটোশ কম্পিউটারে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। আইবিএম পিসি/কম্পাটিবলকে ব্যবহারকারীদের নিকট আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এবং কম্পিউটারের ব্যবহারকে সহজতর ও গতিশীল করার জন্য ডস অপারেটিং সিস্টেমকে ভিত্তি করে ১৯৮৫ সালে উইন্ডোজ (Windows) অপারেটিং সিস্টেমের উন্নয়ন করা হয়। উইন্ডোজ সিস্টেমে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস পদ্ধতিতে কাজের পরিবেশ তৈরি হয়। এতে মেকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেমের মতো বিভিন্ন রকম টাইম, ফন্ট, ডেস্ক এক্সেসরিজ ইত্যাদির সুযোগ পাওয়া যায়। তবুও প্রথম যুগের উইন্ডোজ ছিল ডস ভিত্তিক একটি কাজের পরিবেশ। ডসের ওপর নির্ভর করেই উইন্ডোজ ৩.০ সংস্করণ পর্যন্ত কাজ করত। কাজেই তখন উইন্ডোজকে স্বতন্ত্র অপারেটিং সিস্টেম বলে গণ্য করা হত না।

উইন্ডোজ ৯৫ স্বতন্ত্র অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে চালু হয় ১৯৯৪ সালে। উইন্ডোজ ৯৫ চালানর জন্য ডসের প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে মেকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেম (ম্যাক ও.এস) তৈরিই হয়েছিল গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস পদ্ধতির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে। উইন্ডোজ ৯৫ উন্নয়ন ও চালু হওয়ার পরেই আইবিএম পিসি কম্পাটিবল কম্পিউটারে কাজের পরিবেশ প্রায় মেকিনটোশের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে উইন্ডোজ ৯৮ বাজারে আসে। একই সাথে পিসি'র জন্য প্রচলিত এনটি ৪.০ প্রচলিত থাকে। এ দু'টি পিসি'র চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উন্নততর নিদর্শন। উইন্ডোজ-৯৮-এর পর উইন্ডোজ এমই বাজারে আসে। উইন্ডাজ এন-টির ৪.০ সংস্করণের পর ২০০০ এবং এক্সপি সংস্করণ বাজারজাত হয়েছে। মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এক্সপিতে ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেট সেবা অনেক উন্নত, নির্ভরযোগ্য ও গতিময় হয়েছে। মাইক্রোসফটের সর্বশেষ অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ভিস্তা আরও অনেক বেশি শক্তিশালী এবং বহুমুখী কাজের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।

অন্যদিকে Mac OS X-এ সমপর্যায়ের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম মেকিনটোশে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিদ্যমান ছিল। Mac OS X-এ সেটি আরো মজবুত হয়েছে। অন্যদিকে WINDOWS উচ্চতর পর্যায়ের নেটওয়ার্কিং সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে নিয়ে এসেছে।

বর্ণ ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে (DOS) যে সব বর্ণ টাইপ করতে হয়। একটি বর্ণ এদিক-ওদিক হলে বা দু'টি বর্ণের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রাখা বা না রাখার নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটলে কম্পিউটার ইতিবাচক সাড়া দিত না। কিন্তু চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে একজন ব্যবহারকারীকে এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

প্রোগ্রাম চালনাকালীন কমান্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ডস অপারেটিং সিস্টেমে সবগুলো কমান্ডের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণ এবং কী-বোর্ডের নির্দিষ্ট বোতামগুলো মুখস্থ করে রাখতে হত। কিন্তু চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কোনো কমান্ড মুখস্থ করে রাখার প্রয়োজন হয় না। কমান্ডের জন্য অনেকগুলো মেনু থাকে এবং প্রত্যেক মেনুর অধীন অনেক কমান্ড থাকে। একেই বলা হয় পুল-ডাউন মেনু কমান্ড। মেনুতে ক্লিক করলে মেনুর অধীন কমান্ডের তালিকা পাওয়া যায়। তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় কমান্ডটি মাউস পয়েন্টার দিয়ে সিলেক্ট করলেই কমান্ড কার্যকর হয়ে যায়।

চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহার : ডিস্ক ফরমেটিং, ডিভাইস ইনস্টলেশন, সিস্টেম কনফিগার ইত্যাদি

মাউসের ব্যবহার : চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের পরিবেশে কাজ করার জন্য প্রথমেই জানতে হয় মাউস কিভাবে কাজ করে। মাউস হচ্ছে কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ প্রদান এবং কাজ সম্পাদনের ক্ষুদ্র একটি যন্ত্র। কম্পিউটারের ডান পাশে একটি প্যাডের উপর বা মসৃণ জায়গায় রেখে দিয়ে মাউস দিয়ে কাজ করতে হয়। আইবিএম কম্পিউটারের মাউসের সম্মুখভাগ তিন ভাগে/দুই ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে বলা হয় মাউস বাটন (Button) বা মাউসের বোতাম। দু'একটি কাজ বাদে বাম পাশের অংশ বা বাম দিকের বোতামই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। কাজেই ডান দিকের বা মধ্যাংশের ব্যবহার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলে মাউসের বাম পাশের বোতামের কথাই বুঝতে হবে। মেকিনটোশের মাউসের বোতাম একটি।

ডিস্ক ফরমেটিং : কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ডিস্ক ব্যবহার করা হয়। ডিস্ক ফরমেট করা হয় ডিস্ককে কাজের উপযোগী করার জন্য। ডিস্ক ফরমেটিং করা হয় অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে। সচরাচর কম্পিউটারে ফ্লপি ডিস্ক, রিমুভেল ডিস্ক এবং হার্ডডিস্ক ফরমেট করা হয়। বর্তমান কম্পিউটারে ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভের পাশাপাশি হার্ডডিস্ক অবশ্যই থাকে। এ ছাড়া ম্যাগনেটিক অপটিক্যাল ডিস্ক, জিপ ডিস্ক, সিডি, ডিভিডি, ডাটা কার্টিজ ইত্যাদি কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়। সিডি-ডিভিডি ছাড়া বাকি ডিস্কগুলো ফরমেট করার জন্য কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম একটি সাধারণ নিয়মেই ব্যবহার করে থাকে। সিডি এবং ডিভিডি সরাসরি ফরমেট করা যায় না। এগুলো ফরমেট করার জন্য বা এতে তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য আলাদা এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয়।

ডিভাইস ইনস্টলেশন : কম্পিউটারের কোনো নতুন ডিভাইস বা যন্ত্র ইনস্টল করতে হলে প্রথমত এটিকে কম্পিউটারের ভেতরে বা বাইরে স্থাপন করে এর সাথে কম্পিউটারের সিপিইউ-এর সংযোগ দিতে হয়। এরপর ডিভাইসটি ইনস্টল করার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার স্থাপন করা, যদি না থাকে। সাধারণত প্রতিটি যন্ত্রের সঙ্গেই ঐ যন্ত্র ইনস্টল করার সফটওয়্যার দেওয়া হয়। বর্তমানে মাইক্রোকম্পিউটারে উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেমে অনেক যন্ত্র স্থাপন করতে সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় না। যেমন– উইন্ডোজ ৯৮-এ পেন-ড্রাইভ ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট পেন-ড্রাইভের সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। কিন্তু, উইন্ডোজ এক্সপি বা ভিস্তায় পেন-ড্রাইভ ব্যবহারের জন্য কোনো সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় না। উইন্ডোজ এক্সপি নিজেই এ সব যন্ত্র শনাক্ত করতে পারে।

সিস্টেম কনফিগারেশন : সিস্টেম কনফিগারেশন করার জন্য স্টার্ট বোতামে সেটিংস বাছাই করলে কন্ট্রোল প্যানেলসহ আর কয়েকটি ফোল্ডার ও কমান্ড পাওয়া যাবে। এ সব ফোল্ডারের বিভিন্ন কমান্ড/অপশন ব্যবহার করে প্রিন্টারকে

কাজের জন্য প্রস্তুত করতে হয়। টাস্কবার দৃশ্যমান বা অদৃশ্য রাখা, স্টার্ট মেনুর প্রতীক ছোট বা বড় আকারে প্রদর্শন করা, ঘড়ি দৃশ্যমান বা অদৃশ্য রাখা, স্টার্ট মেনুতে কোনো প্রোগ্রাম যুক্ত বা বিযুক্ত করা ইত্যাদি কাজ করা যেতে পারে। কম্পিউটারে কাজ করার পরিবেশকে এভাবে বিন্যস্ত করে নেওয়াকেই কনফিগার বলা হয়।

এ ছাড়াও, নতুন হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার সন্নিবেশিত করা, বাদ দেওয়া, মনিটরের গামা নির্ধারণ করা, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা, মনিটরের প্রদর্শন ক্ষমতা নির্ধারণ করা, ফন্টস স্থাপন করা ও বাদ দেওয়া, ইন্টারনেটের বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ করা, কী বোর্ড-এর গতি ও কারসার-এর ক্লিক করার গতি নির্ধারণ করা, মাউসের গতি নির্ধারণ করা, নেটওয়ার্ক, পাসওয়ার্ড, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন, সিস্টেম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অনেক কাজ করা যায়।

সফটওয়্যার কপিরাইট আইন এবং প্রয়োজনীয়তা

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মানব সভ্যতার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে মানুষের মেধা। মানুষ তার মগজ দিয়ে উদ্ভাবন করে এই সভ্যতাকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মগজই হচ্ছে এই বিশ্বের নিয়ামক শক্তি। কখনো এটি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, কখনো এটি ধারণা হিসাবে থাকে। কখনো এটি সূত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। সফটওয়্যার এমনি একটি মেধাস্বত্ব। জমি-জমা বাড়ি ঘরের যেমন মূল্য আছে, তেমনি আছে সফটওয়্যারের মূল্য। যদি এই মগজের মূল্য আমরা না দেই তাহলে এ দুনিয়া আবিষ্কারবিহীন, বন্ধ্যা ও স্থবির হয়ে যাবে। মানুষের সকল সৃজনশীল কাজই মস্তিষ্কজাত। ফলে সাহিত্য, সঙ্গীত, আবিষ্কার সব কিছুকেই তার বস্তুগত মূল্য নয় মেধাগত মূল্য দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এই কারণেই সারা দুনিয়াতে মেধাস্বত্ব আইন রয়েছে। সভ্য মানুষ মানে সেই মূল্য দেওয়া। বিশ্বব্যাপী এই আইনকে সম্মান করা হয়। বিশ্বের প্রায় সকল দেশ জেনেভা কনভেনশন নামক চুক্তিতে সই করে মেধাস্বত্বের মর্যাদা দেওয়ার প্রকাশ্য অঙ্গীকার করেছে। আমাদের দেশও তাই করেছে। আমাদের দেশে ১৯৬২ সালের একটি কপিরাইট আইন প্রণয়ন করা হয়– বস্তুত সাহিত্য কর্মকে কপিরাইট হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য। সেই সময়ে কম্পিউটারের সফটওয়্যারের ধারণাটি ছিল না। ফলে কম্পিউটারের সফটওয়্যারকে সেই আইনের আওতায় আনা হয়নি। সম্প্রতি এটি অনুভব করা হয় যে মেধাস্বত্বকে গুরুত্ব না দেওয়া হলে এবং কম্পিউটারের সফটওয়্যারকে কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষা না করা হলে এ দেশে সফটওয়্যারের উদ্ভাবন হবে না এবং সৃজনশীলতা ব্যাহত হবে। কম্পিউটারের জন্য প্রণীত ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশেও সফটওয়্যারকে কপিরাইট আইনে সুরক্ষা করার সুপারিশ করা হয়। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের বিরাট অংশ কর্তৃক দেশের ও বিশ্বের সফটওয়্যার প্রস্তুতকারকদের সফটওয়্যার কপি করার ফলে সফটওয়্যার প্রণয়নকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছেন। এখানে সফটওয়্যার এবং অন্যান্য মেধাজাত পণ্যের অবাধ নকল হচ্ছে। এর ফলে দেশের সৃজনশীলতা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা হচ্ছি নিন্দিত।

শুধুমাত্র আইনের জন্যই নয় প্রত্যেকেরই উচিত অন্যের মেধাজাত সম্পদকে স্বীকৃতি দেওয়া। আমাদের উচিত অন্যের মেধাজাত সম্পদ কেবল তার সম্মতিতেই ব্যবহার করা। মানুষের ধন সম্পদ চুরি করা যেমন অপরাধ, তেমনি মানুষের মেধাজাত সম্পদ, যেমন– সফটওয়্যার, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ইত্যাদি তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করাও অপরাধ।

এ সব বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশে কপিরাইট আইন ২০০০ প্রণীত হয়। আইনটি ২০০৫ সালে সংশোধিত হয়। এ আইনে কম্পিউটার সফটওয়্যার নকল করার জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা ও পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

কপি রাইট নিবন্ধনের জন্য একটি কপি রাইট রেজিস্ট্রার অফিস রয়েছে। কপি রাইট আইন বলবৎ করার জন্য সরকার ২০০৮ সালে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে।

সারমর্ম

কম্পিউটারের একটি অংশ সফটওয়্যার। সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের হয়। অপারেটিং প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ, এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইত্যাদির সাহায্যে কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। বড় ধরনের কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রকারের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে টাইম শেয়ারিং, রিসোর্স শেয়ারিং, ক্লায়েন্ট সার্ভার ও রিয়েল টাইম ধরনের অপারেটিং সিস্টেম উল্লেখযোগ্য। মাইক্রোকম্পিউটারেও বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয় এবং এ সব অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটারে। আইবিএম পিসি ও কম্পাটিবলের জন্য উইন্ডোজ ৯৫/৯৮, উইন্ডোজ এনটি/২০০০, ইউনিক্স লিনাক্স, ওএস/২ ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে।

মেকিনটোশ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হল ম্যাক ওএস (Mac OS)। ইউনিক্স (UNIX) অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোকম্পিউটার ও অন্যান্য বড় কম্পিউটারেও কাজ করে। ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটাবেজ, স্প্রেডশিট, প্রকৌশল, ছবি সম্পাদনা, পৃষ্ঠাসজ্জা ইত্যাদি নানা কাজের জন্য প্যাকেজ সফটওয়্যার পাওয়া যায়। প্যাকেজ প্রোগ্রামের যেসব কাজ করা যায় না তার জন্য প্রয়োজন হয় কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম। অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অপারেটিং সিস্টেম না থাকলে কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি বা প্রোগ্রাম দিয়ে কোনো কাজ করা যায় না। অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে।

অপারেটিং সিস্টেম যে কাজগুলো করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ব্যবস্থাপনা। কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম ডিস্ক, ডাইরেক্টরি, ফাইল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার কাজ করে। এ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে অপারেটিং সিস্টেম ফাইল, ডিস্ক ডাইরেক্টরি তৈরি করা, মুছে ফেলা, স্থানান্তর করা ইত্যাদি কাজও করে। অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ রক্ষা করে। এসব যন্ত্রপাতি যাতে অপারেটিং সিস্টেম, এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামসমূহ খুঁজে পেতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে তারও আয়োজন করে অপারেটিং সিস্টেম। একই কারণে অপারেটিং সিস্টেম পুরো কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে আইবিএম পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার ও ক্লোন পিসিতে উইন্ডোজ এক্সপি/ভিস্তা অপারেটিং সিস্টেম এবং এ্যাপলের মেকিনটোশ পরিবারের পার্সোনাল কম্পিউটারে মেকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেম (Mac OS) সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম।

উইন্ডোজ পরিবেশে কাজ করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে মাউস কীভাবে কাজ করে।

উইন্ডো হল খোলা জানালার মতো। খোলা জানালা দিয়ে যেমন ঘরের ভেতরের জিনিস-পত্তর দেখা যায়, কম্পিউটারে পর্দায় তেমনি কোনো একটি উইন্ডো বা খোলা জানালা দিয়ে একবারে ভেতরের অংশবিশেষ দেখা যায়। উইন্ডোজ পরিবেশে ডেস্কটপ বা ফাইন্ডার স্তরে হার্ডডিস্ক বা ফ্লপি ডিস্কের রাখা ফাইল, ফোল্ডার ইত্যাদির তালিকা দেখা যায় না। এসব তালিকা দেখতে হয় ফাইল ম্যানেজার উইন্ডোতে। উইন্ডোজ পরিবেশে ডেস্কটপ বা ফাইন্ডার স্তরে প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মেইন এবং অন্যান্য প্রোগ্রামের উইন্ডো থাকে।

কম্পিউটারে প্রতিটি কাজ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। যে নামে সংরক্ষণ করা হয় সেই নামটিই ঐ কাজের ফাইল হিসাবে পরিচিত হয়। আবার অনেকগুলো এক ধরনের কাজের ফাইল একটি ভিন্ন পাত্রে বা আধারে রাখতে হয়। এ আধারকেই বলা হয় ডাইরেক্টরি বা ফোল্ডার। যেমন– একটি ফাইল কেবিনেটের তিন/চারটি ড্রয়ার থাকে। একেকটি ড্রয়ারে একেক ধরনের ফাইল রাখা যায়। এ ক্ষেত্রে ড্রয়ারগুলোই হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষায় ডাইরেক্টরি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার ও এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে–

ক. সিস্টেম সফটওয়্যার | খ. কাস্টমাইজড সফটওয়্যার
গ. প্যাকেজ সফটওয়্যার | ঘ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার।

২. মাল্টিটাস্কিং ও মাল্টি ইউজার সিস্টেমের জন্য যে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়–

i. UNIX
ii. Linux
iii. DOS

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i | খ. i ও ii
গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

ঢাকার একটি বিখ্যাত গার্মেন্টস গ্রুপ তাদের হিসেব-নিকেশ কম্পিউটারের সাহায্যে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এজন্য তারা একটি নিজস্ব সফটওয়্যার ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে।

৩. তাদের সফটওয়্যারটি হবে–

ক. ডাটাবেজ সফটওয়্যার | খ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার
গ. ক্যাড সফটওয়্যার | ঘ. কাস্টমাইজড সফটওয়্যার

৪. তাদের সফটওয়্যারটি পরিচালনা করতে অন্য যে সফটওয়্যার অবশ্যই প্রয়োজন হবে–

ক. প্যাকেজ সফটওয়্যার | খ. সিস্টেম সফটওয়্যার
গ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার | ঘ. ডাটাবেজ সফটওয়্যার

সৃজনশীল প্রশ্ন

একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরের অংশ হিসাবে বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে সফটওয়্যার মেলা দেখতে গিয়েছিল। মেলায় একটি সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এ্যানিমেশনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি পানের বিষয়ে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছিল। অনুষ্ঠানটি দেখে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করল। তারা শিক্ষা সহায়ক সফটওয়্যার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে চাইল। মেলা থেকে ফেরার পূর্বে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু শিক্ষামূলক সফটওয়্যার ক্রয় করল।

ক. সফটওয়্যার কী?
খ. সফটওয়্যার ডেভেলপারের প্রধান একটি কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
গ. মেলা হতে ক্রয়কৃত সফটওয়্যারসমূহ শিক্ষার্থীরা কীভাবে বিদ্যালয়ে ব্যবহার করবে?
ঘ. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক সফটওয়্যার ব্যবহারের সম্ভাব্য ফলাফল যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সংখ্যা পদ্ধতি ও কম্পিউটার লজিক

সংখ্যা পদ্ধতি

সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতি। কিন্তু সংখ্যা ব্যবহারের আজকের এ পর্যায়ে পৌঁছতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে। গণিতবিদ ও দার্শনিকদের হাজার বছরের সাধনার বিনিময়ে আজকের এই সংখ্যা পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ হাতের আঙুল, পাথরের নুড়ি, কাঠি ইত্যাদির সাহায্যে সংখ্যার কাজ করত। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির ধাপে ধাপে মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটতে থাকে। মানুষ ক্রমান্বয়ে গণনার কাজে নানা ধরনের চিহ্ন বা প্রতীকের ব্যবহার শুরু করে। প্রাচীন ব্যাবিলনের মানুষ দু'ধরনের গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করত। ছোট সংখ্যার জন্য তারা ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত এবং বড় সংখ্যার জন্য ব্যবহার করত ৬০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি। প্রায় ৫০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে আরবরা এ পদ্ধতি আয়ত্ত করে ভারতীয় উপমহাদেশীয়দের কাছ থেকে। এরপর আরব বিজ্ঞানী আলখোয়ারিজমী ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির উপর আরবীতে বই প্রকাশ করেন। তার এই বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং ইউরোপ ও উন্নত বিশ্বে ইন্দো-আরবীয় গণনা পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় গাণিতিক কাজগুলো করা হয় ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে, অর্থাৎ দশমিক (Decimal) পদ্ধতিতে। কিন্তু কম্পিউটারে দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার হয় না। কম্পিউটারে ব্যবহার হয় বাইনারি পদ্ধতিতে। বাইনারি পদ্ধতি ০ এবং ১ এই দুটি প্রতীক চিহ্নের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাইনারি (ভিত্তি-২), অকটাল (ভিত্তি-৮) এবং হেক্সাডেসিম্যাল (ভিত্তি-১৬) সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

দশমিক, বাইনারি, অকটাল ও হেক্সাডেসিম্যাল পদ্ধতিতে গণনা

মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে গণনা কাজের জন্য মানুষ নানা ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুরু করে। দশমিক সংখ্যা বা দশভিত্তিক সংখ্যা, বাইনারি বা যুগ্ম পদ্ধতির সংখ্যা ছাড়াও অকটাল ও হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দশমিক পদ্ধতি

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ এই দশটি প্রতীক দিয়ে সব ধরনের সংখ্যা গঠন করা হয়। দশটি প্রতীক বা অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয় বলে এ সংখ্যা পদ্ধতিকে বলা হয় দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি। এ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ১০। এ পদ্ধতিতে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনার জন্য একটি স্থান প্রয়োজন হয়। কিন্তু ৯ থেকে দশমিক সংখ্যা গঠনের জন্য একাধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। কাজেই ৯-এর পরে সংখ্যা ১০ (দশ) লেখার জন্য ১ এবং ০ এ দুটি প্রতীকের প্রয়োজন হয় এবং দু'টি স্থানের প্রয়োজন হয়। এভাবে ৯৯ সংখ্যার পরের সংখ্যা ১০০ লেখার জন্য তিনটি স্থানের এবং তিনটি প্রতীকের প্রয়োজন হয়।

যেমন– ২টি ৩ অঙ্কের সংখ্যা ২৫৪ এবং ৫৪২। এখানে ২ একটি অঙ্ক, ৩ একটি অঙ্ক, ৪ একটি অঙ্ক। কোনো সংখ্যা গঠন করার অঙ্কগুলো পাশাপাশি বসাতে হয়। তবে প্রত্যেকটি সংখ্যা গঠিত হয় ঐ সংখ্যা প্রতীকের নিজস্ব মান এবং তার অবস্থানের স্থানীয় মানের ভিত্তিতে। যদিও ২৫৪ এবং ৫৪২ সংখ্যা দুটি ২, ৫ ও ৪ সংখ্যা প্রতীক দিয়ে গঠিত কিন্তু এদের মান সমান নয়। ২৫৪ (দুইশত চুয়ান্ন) সংখ্যাটির ৪-এর অবস্থানের মান এককের ঘরে বা একক, ৫-এর অবস্থান দশকের ঘরে বা দশক এবং ২-এর অবস্থানের মান শতকের ঘরে বা শতক। আবার ৫৪২ (পাঁচশত বিয়াল্লিশ) সংখ্যাটিতে ২ এর মান এককের ঘরে ৪ এর মান দশকের ঘরে এবং ৫ এর মান শতকের ঘরে।

২৫৪	=	২০০+৫০+৪		
	=	২×১০০+৫×১০+৪×১		
		শতক	দশক	একক
৫৪২	=	৫০০+৪০+২		
	=	৫×১০০+৪×১০+২×১		
	=	শতক	দশক	একক

উপরের নিয়ম অনুযায়ী একক থেকে দশকের ঘরে বা দশক থেকে শতকের ঘরে যাওয়ার জন্য সংখ্যাকে ১০ এর গুণিতকে বাড়িয়ে যেতে হয়। ১০-এর ঘাত (Power) শূন্য হলে $১০^০$-এর মান হয় ১ বা একক। ১০-এর ঘাত (Power) ১ হলে $১০^১$-এর মান হয় ১০ বা দশক

১০-এর ঘাত যদি ২ হয়, তাহলে $১০^২$-এর মান হবে ১০×১০=১০০ বা শতক।

১০ এর ঘাত যদি ৩ হয়, তাহলে $১০^৩$-এর মান হবে ১০×১০×১০=১০০০ বা সহস্র।

২৫৪ সংখ্যাটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় :

$$
\begin{aligned}
৪\times ১০^০ &= ৪\times ১ = ৪\\
৫\times ১০^১ &= ৫\times ১০ = ৫০\\
২\times ১০^২ &= ২\times ১০০ = \underline{২০০}\\
& \qquad\qquad\quad ২৫৪
\end{aligned}
$$

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির দশটি অঙ্ক বা প্রতীকের মধ্যে গাণিতিক যোগ চিহ্ন (+), বিয়োগ চিহ্ন (-) এবং দশমিক চিহ্ন (.) ব্যবহার করে সংখ্যা গঠন করা যায়।

ঋণাত্মক (Negative) সংখ্যা : যে সংখ্যার বাঁ দিকে প্রথমে বিয়োগ চিহ্ন (-) থাকে সে সংখ্যাকে ঋণাত্মক (Negative) সংখ্যা বলা হয়। যেমন -৯.৫৭ এবং -৯৬৮ ইত্যাদি হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা।

ধনাত্মক (Positive) সংখ্যা : যে সব সংখ্যা বিয়োগ চিহ্ন (-) দিয়ে শুরু হয় না সেসব সংখ্যাকে ধনাত্মক (Positive) সংখ্যা বলা হয়। যেমন ৯.১২ এবং ৯৭৮ ইত্যাদি হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা। ধনাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য সংখ্যার বাঁ দিকে যোগ চিহ্ন (+) দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

পূর্ণ সংখ্যা (Integer) : দশমিক চিহ্ন (.) ছাড়া সংখ্যা যেমন; ০,−১৯, ৭৯ এবং ৯ ইত্যাদিকে পূর্ণ সংখ্যা (Integer) বলা হয়। পূর্ণ সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক উভয় প্রকার হতে পারে।

১৯.৩৪ সংখ্যাটির দশমিক (.) চিহ্নের বাঁ দিকের সংখ্যা ১৯ এবং ডান দিকের সংখ্যা ৩৪। এখানে ১৯ সংখ্যাটি একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং ৩৪ সংখ্যাটি হচ্ছে ভগ্নাংশ (Fraction) যেমন– ০.০৯ এবং ৯.৩৯ সংখ্যা দু'টির .০৯ এবং .৩৯ ভগ্নাংশ।

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ভগ্নাংশের জন্যও একই ধরনের নিয়ম উল্টোভাবে অনুসরণ করা হয়। দশমিক ভগ্নাংশে দশমিক চিহ্নের পরে অবস্থানের স্থানীয় মান দশকের বিভিন্ন ঘাতে কমে যায়। যেমন–

ক) $০.৫= ৫\times১০^{-১}$ খ) $০.৫৪=৫\times১০^{-১}+৪\times১০^{-২}$

এখানে $১০^{-১}=১/১০$

গ) $০.২৫=২\times১০^{-১}+৫\times১০^{-২}$ ঘ) $০.৩৫=৩\times১০^{-১}+৫\times১০^{-২}$

এখানে $১০^{-২}=১/১০০$

৩৫.৪২ কে দশমিক ভগ্নাংশে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়

অঙ্কের অবস্থান	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম		১ম	২য়	৩য়
ঘাতের মান	৩	২	১	০		১	২	৩
অবস্থানের স্থানীয় মান নির্ণয়ের নিয়ম	$১০^{৩}$	$১০^{২}$	$১০^{১}$	$১০^{০}$		$১০^{-১}$	$১০^{-২}$	$১০^{-৩}$
স্থানীয় মানের মান	১০০০	১০০	১০	১	দশমিক বিন্দু	$\frac{১}{১০}$	$\frac{১}{১০০}$	$\frac{১}{১০০০}$
	সহস্র	শতক	দশক	একক		দশমাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ

উপরের সারণিতে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান ও তার অবস্থানের স্থানীয় মান দেখানো হয়েছে।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে গণনা

কম্পিউটার মানুষের ভাষা বোঝে না। কম্পিউটার কাজ করে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় কম্পিউটারের মেশিনের ভাষা বা মেশিন ল্যাংগুয়েজ। এই মেশিন ল্যাংগুয়েজ গঠিত হয় বিদ্যুৎ প্রবাহের দু'টি মাত্র সংকেতের সমন্বয়ে। বিদ্যুৎ আছে, অথবা বিদ্যুৎ নেই– শুধু এ দু'টি অবস্থাই কম্পিউটার বুঝতে পারে। অর্থাৎ, অন এবং অফ ধারণা থেকেই ২ ভিত্তিক বা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে সব রকমের সংখ্যা গঠন করা হয় দশটি চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে মাত্র দুটি চিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে সব রকমের সংখ্যা গঠন করা যায়। দু'টি প্রতীক ব্যবহৃত হয় বলে একে ২ ভিত্তিক সংখ্যা বা বাইনারি পদ্ধতি বলা হয়। এর ভিত্তি হচ্ছে ২। এ পদ্ধতিতে অঙ্ক হল ০ এবং ১। বাইনারি পদ্ধতিতে ১-এর পরের সংখ্যা লেখার জন্য ০ এবং ১ এ দুটি প্রতীক ব্যবহার করতে হয় এবং দ্বিতীয় স্থানের প্রয়োজন হয়। যেমন– দশমিক পদ্ধতিতে ২ লেখার জন্য বাইনারি লিখতে হবে ১০। বাইনারিতে ১০-এর পরের সংখ্যা ১১ লেখার পর তৃতীয় স্থানের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ১১ এর পরের সংখ্যা হবে ১০০। কম্পিউটার 'অন' বা 'অফ' এ দুটি বিকল্প অবস্থার মধ্যে আসা-যাওয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কাজ করে। ব্যবহারকারীরা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে লেখালেখি বা হিসাবের ফলাফল দশমিক সংখ্যায় পেয়ে থাকেন। কিন্তু কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পাদনের জন্য বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

০ এবং ১ এর অঙ্ক দুটির প্রত্যেকটিকে একটি বিট (Bit) বলা হয়। ইংরেজি বাইনারি (Binary) শব্দের প্রথম দুটি অক্ষর এবং ডিজিট (Digit) শব্দের শেষ একটি অক্ষর নিয়ে বিট (Bit) শব্দটি গঠিত। বিট হচ্ছে মৌলিক একক। Bit-এর দুটি মান ০ এবং ১কে দুটি পৃথক তড়িৎ সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সে জন্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে বাইনারি গণনা পদ্ধতির ব্যবহার সুবিধাজনক। নিচের চিত্রে ০ বিট এবং ১ বিটকে দুই অবস্থা বিশিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে দেখানো হয়েছে। এভাবে ০ ভোল্ট দিয়ে ০ বিট এবং ২ ভোল্ট দিয়ে ১ বিট নির্দেশ করা হয়েছে।

দুই অবস্থা বিশিষ্ট যুক্তি সংকেত
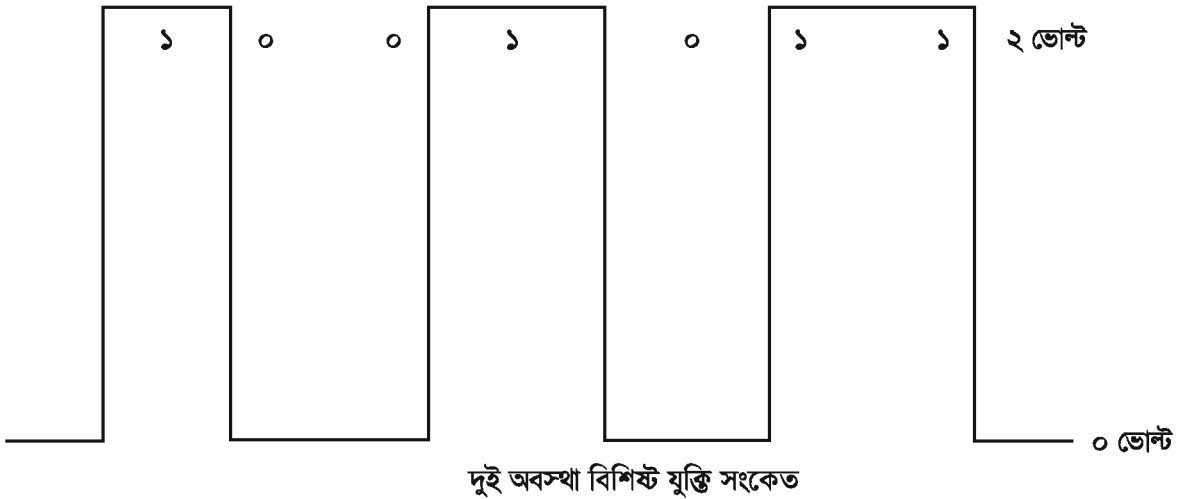
এ ধরনের প্রবাহকে ডিজিটাল সংকেত প্রবাহ (Digital Signal Stream) বলা হয়। দশমিক পদ্ধতির মতো বাইনারি পদ্ধতিও স্থান ভিত্তিক। পার্থক্য শুধু ভিত্তি সংখ্যায়। দশমিক পদ্ধতির ভিত্তি ১০ এবং বাইনারি পদ্ধতির ভিত্তি ২।

অঙ্কের অবস্থান	৫ম	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম	বাইনারি বিন্দু	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
ঘাতের মান	৪	৩	২	১	০		-১	-২	-৩	-৪
অবস্থানের স্থানীয় মান নির্ণয়ের নিয়ম	$২^৪$	$২^৩$	$২^২$	$২^১$	$২^০$		$২^{-১}$	$২^{-২}$	$২^{-৩}$	$২^{-৪}$
স্থানীয় মানের মান	১৬	৮	৪	২	১		$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{১৬}$

পরবর্তী সারণিতে বাইনারি পদ্ধতির মান দেখানো হয়েছে।

নিচের নিয়মে ১১১০১ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করা যায়।

উপরে উল্লিখিত নিয়ম থেকে বোঝা যায় যে, কোনো সংখ্যাকে তার স্থানীয় মানের সমন্বয়ে প্রসারিত করলেই সংখ্যাটি দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়।

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা
০	০	১৩	১১০১
১	১	১৪	১১১০
২	১০	১৫	১১১১
৩	১১	১৬	১০০০০
৪	১০০	১৭	১০০০১
৫	১০১	১৮	১০০১০
৬	১১০	১৯	১০০১১
৭	১১১	২০	১০১০০
৮	১০০০	২১	১০১০১
৯	১০০১	২২	১০১১০
১০	১০১০	২৩	১০১১১
১১	১০১১	২৪	১১০০০
১২	১১০০	২৫	১১০০১

নিচের সারণিতে কিছু দশমিক সংখ্যার বাইনারি সংখ্যা দেওয়া হল :

দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তর

কম্পিউটারের ভিতরে কাজ হয় বাইনারি পদ্ধতিতে। কিন্তু সাধারণ কাজে দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে আমরা সব ধরনের তথ্য ও নির্দেশ দশমিক পদ্ধতিতে প্রদান করে থাকি। কম্পিউটারের ভিতরে বাইনারি পদ্ধতিতে এসব নির্দেশ এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। বাইনারি পদ্ধতি থেকে আবার দশমিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আউটপুট প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শিত এ আউটপুট প্রিন্টারে মুদ্রণ নেওয়া যায়। যে কোনো দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা যায়। দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি ২ দিয়ে বার বার ভাগ করে ভাগশেষগুলো ক্রমান্বয়ে নিচের দিক থেকে পর পর বাঁ থেকে ডান দিকে লিখে গেলেই বাইনারি সংখ্যাটি পাওয়া যায়। কোনো সংখ্যার শেষ অঙ্কের নিম্নাংশের ভিত্তি সংখ্যা লিখে ঐ সংখ্যাটির ভিত্তি নির্দেশ করা হয়। যেমন– দশমিক সংখ্যা ৬০৯ কে সংক্ষেপে $৬০৯_{১০}$ লেখা হয়। একই রকমভাবে বাইনারি সংখ্যা ১১০১ কে সংক্ষেপে $১১০১_{২}$ লেখা যায়। দশমিক থেকে বাইনারি সংখ্যার রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

$১৫৭_{১০}$ ও $৭৭৭_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

১৫৭÷২	ভাগফল ৭৮	ভাগশেষ ১
৭৮÷২	ভাগফল ৩৯	ভাগশেষ ০
৩৯÷২	ভাগফল ১৯	ভাগশেষ ১
১৯÷২	ভাগফল ৯	ভাগশেষ ১
৯÷২	ভাগফল ৪	ভাগশেষ ১
৪÷২	ভাগফল ২	ভাগশেষ ০
২÷২	ভাগফল ১	ভাগশেষ ০
১÷২	ভাগফল ০	ভাগশেষ ১

বাইনারি সংখ্যা=১০০১১১০১

উত্তর : $১৫৭_{১০}$=১০০১১১০১

৭৭৭÷২	ভাগফল ৩৮৮	ভাগশেষ ১
৩৮৮÷২	ভাগফল ১৯৪	ভাগশেষ ০
১৯৪÷২	ভাগফল ৯৭	ভাগশেষ ০
৯৭÷২	ভাগফল ৪৮	ভাগশেষ ১
৪৮÷২	ভাগফল ২৪	ভাগশেষ ০
২৪÷২	ভাগফল ১২	ভাগশেষ ০
১২÷২	ভাগফল ৬	ভাগশেষ ০
৬÷২	ভাগফল ৩	ভাগশেষ ০
৩÷ ২	ভাগফল ১	ভাগশেষ ১
১÷২	ভাগফল ০	ভাগশেষ ১

বাইনারি সংখ্যা=১১০০০০১০০১

১৫৭ কে ২ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় না। কাজেই, বাইনারি অঙ্কের নিয়মানুযায়ী প্রথমবার ভাগ করার পর অবশিষ্টকে ১ বা ০ হিসেবে ধরা হয়। প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার ২ দিয়ে ভাগ করা হয় এবং একই নিয়মে অবশিষ্ট ধরা হয়। সর্বশেষ ভাগফল ১ কে ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ভগ্নাংশ হয় বলে ভাগফলকে ০ এবং ভাগশেষ ১ ধরা হয়।

রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

ভগ্নাংশ যুক্ত দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর

দশমিক ভগ্নাংশকে বাইনারি ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক ভগ্নাংশ শূন্য না হওয়া পর্যন্ত ভগ্নাংশকে ভিত্তি ২ দিয়ে বার বার গুণ করে যেতে হয়। তবে সব ক্ষেত্রে ভগ্নাংশে শূন্য হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে কাছাকাছি একটি সংখ্যা পর্যন্ত গুণ করে যেতে হয় এবং গুণফলের পূর্ণ অংশটি উপর থেকে নিচের দিকে পরপর বাঁ থেকে ডানে লিখে যেতে হয়। বাইনারি বিন্দুটি সংখ্যার বাঁ দিকে বসে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় দশমিক ভগ্নাংশকে বাইনারি ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

$০.৭৫_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ	ভগ্নাংশ x২
-	.৭৫	.৭৫x২
১	.৫০	.৫০x২
১	.০০	

∴ বাইনারি ভগ্নাংশ=.১১

উত্তর : $০.৭৫_{১০}$=$.১১_{২}$

$০.৫০_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ	ভগ্নাংশ x২
-	.৫০	.৫০x২
১	.০০	

∴ বাইনারি ভগ্নাংশ=.১

উত্তর : $০.৫০_{১০}$=$.১_{২}$

$০.২৫_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ	ভগ্নাংশ x২
-	.২৫	.২৫x২
০	.৫০	.৫০x২
১	.০০	

∴ বাইনারি ভগ্নাংশ=.০১

উত্তর : $০.২৫_{১০}$=$.০১_{২}$

$০.৪১_{১০}$ কে বাইনারিতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ	ভগ্নাংশ x ২
-	.৪১	.৪১ x ২
০	.৮২	.৮২ x ২
১	.৬৪	.৬৪ x ২
১	.২৮	.২৮ x ২
০	.৫৬	.৫৬ x ২
১	.১২	.১২ x ২
০	.২৪	

∴ বাইনারি ভগ্নাংশ=.০১১০১০ ....

উত্তর : $০.৪১_{১০}$=.০১১০১০ ....

শেষের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, ০.৪১ সংখ্যাটিকে ক্রমাগত ২ দিয়ে গুণ করার পরও ভগ্নাংশ শূন্য হয় না। সাধারণত ভগ্নাংশ ২/৩–এর দশমিক ভগ্নাংশ ০.৬৬৬.... হিসাবে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ২/৩ এর সমান ০.৬৬৬... নয়। তবে ০.৬৬৬.... সংখ্যাটি ২/৩ এর খুব কাছাকাছি। ঠিক একইভাবে দশমিক ভগ্নাংশ ০.৪১ এর সমান বাইনারি ভগ্নাংশ ০.০১১০১০... বলা যায়।

আরেকটি সহজ উপায়ে দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিণত করা যায়। এ ক্ষেত্রে আমরা ২ এর বিভিন্ন ঘাতের মান দিয়ে খুব সহজে এবং কম সময়ে দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে পারি ।

২ এর ঘাত	দশমিক মান
$২^{০}$	১
$২^{১}$	২
$২^{২}$	৪
$২^{৩}$	৮
$২^{৪}$	১৬
$২^{৫}$	৩২
$২^{৬}$	৬৪
$২^{৭}$	১২৮
$২^{৮}$	২৫৬
$২^{৯}$	৫১২
$২^{১০}$	১০২৪
$২^{১১}$	২০৪৮

২ এর ঘাত	দশমিক মান
$২^{১২}$	৪০৯৬
$২^{১৩}$	৮১৯২
$২^{১৪}$	১৬৩৮৪
$২^{১৫}$	৩২৭৬৮
$২^{১৬}$	৬৫৫৩৬
$২^{১৭}$	১৩১০২৭
$২^{১৮}$	২৬২১৪৪
$২^{১৯}$	৫২৪২৮৮
$২^{২০}$	১০৪৮৫৭৬
$২^{২১}$	২০৯৭১৫২
$২^{২২}$	৪১৯৪৩৩৪
$২^{২৩}$	৮৩৮৮৬০৮
$২^{২৪}$	১৬৭৭৭২১৬

উপরের সারণিতে দেওয়া ঘাত ও অবস্থানের ভিত্তিতে অতি সহজে যে কোনো বড় দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা যায়। যেমন– ৫৪৩৫ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। ২ এর সবচেয়ে বড় ঘাতের মান নির্ধারণ করতে হবে এমনভাবে যে ঐ ঘাতের সমতুল্য দশমিক ৫৪৩৫ এর ছোট বা সমান হয়। ৫৪৩৫ থেকে ছোট বা সমমানের ঘাত হচ্ছে $২^{১১}$, অর্থাৎ ৪০৯৬। কিন্তু, ৫৪৩৫=৪০৯৬+১৩৩৯। এখানে ১৩৩৯ সংখ্যার চেয়ে ছোট বা সমমানের ২ ঘাতের সবচেয়ে বড় সংখ্যা হল $২^{১০}$, অর্থাৎ ১০২৪। এভাবে গাণিতিক পদ্ধতিতে মূল সংখ্যাকে ২ এর বিভিন্ন ঘাতে পরিণত করতে হয়।

যেমন–

		ব্যবহৃত ঘাত
৫৪৩৫ = ৪০৯৬+১৩৩৯	৪০৯৬ = $২^{১২}$	১২
১৩৩৯ = ১০২৪+৩১৫	১০২৪ = $২^{১০}$	১০
৩১৫ = ২৫৬+৫৯	২৫৬ = $২^{৮}$	৮
৫৯ = ৩২+২৭	৩২ = $২^{৫}$	৫
২৭ = ১৬+১১	১৬ = $২^{৪}$	৪
১১ = ৮+৩	৮ = $২^{৩}$	৩
৩ = ২+১	২ = $২^{১}$	১

অর্থাৎ ৫৪৩৫ = ৪০৯৬+১০২৪+২৫৬+৩২+১৬+৮+২+১

$= ২^{১২}+২^{১০}+২^{৮}+২^{৫}+২^{৪}+২^{৩}+২^{১}+২^{০}$

নিচের সারণিতে ব্যবহৃত ঘাতসমূহের নিচে ১ ও অব্যবহৃত ঘাতসমূহের নিচে ০ দেখানো হয়েছে।

(১২)	(১১)	(১০)	(৯)	(৮)	(৭)	(৬)	(৫)	(৪)	(৩)	(২)	(১)	(০)
১	০	১	০	১	০	০	১	১	১	০	১	১

$৫৪৩৫_{১০}=১০১০১০০১১১০১১_{২}$

এ পদ্ধতিতে দশমিক সংখ্যাকে এমন দুটি অংশে ভাগ করা হয় যার অংশ হচ্ছে ২ এর ঘাতের সর্বোচ্চ সংখ্যা এবং অন্যটি মূল সংখ্যা থেকে প্রথম অংশ বাদ দিয়ে যা থাকে সেই অবশিষ্ট। এই অবশিষ্ট সংখ্যাটিকে আবার দুই অংশে ভাগ করা হয় যার প্রথম অংশ হচ্ছে ২ এর ঘাতের সর্বোচ্চ সংখ্যা এবং অন্যটি তার অবশিষ্ট। এভাবে মূল সংখ্যাকে ২ এর বিভিন্ন ঘাতে পরিণত করে উপরে প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী দশমিক সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তন করা হয়। নিচের উদাহরণে বিষয়টি সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। দশমিক সংখ্যা ১১৩২ কে ছোট অংশে বিভক্ত করে বাইনারি সংখ্যায় পরিণত করা যেতে পারে।

১১৩২ = ১০২৪+১০৮

১০৮ = ৬৪+৪৪

৪৪ = ৩২+১২

১২ = ৮+৪

১১৩২ = ১০২৪+৬৪+৩২+৮+৪

$= ২^{১০}+২^{৬}+২^{৫}+২^{৩}+২^{২}$

(১০)	(৯)	(৮)	(৭)	(৬)	(৫)	(৪)	(৩)	(২)	(১)	(০)
১	০	০	০	০	১	০	১	১	০	০

$১১৩২_{১০}=১০০০০১১০১১০০_{২}$

বাইনারি গণিত

বাইনারি যোগের নিয়ম

১+১ =০ এবং হাতে থাকে ১
যা পরের সারিতে (বাঁয়ে) যোগ করতে হবে।

১+০=১

০+১=১

০+০=০

উদাহরণ-১ **উদাহরণ-২**

বাইনারি যোগ	দশমিক যোগ	বাইনারি যোগ	দশমিক যোগ
১১০০	১২	১০১০০.০১	২৮.২৫
+১০০০	+৮	+১১০০০.১১	+১২.৭৫
১০১০০	২০	১০১১০১.০০	৪১.০০

বাইনারি বিয়োগের নিয়ম

১-১ =০

১-০=১

০-১=১ পরের বাঁ দিকের সারি থেকে ১ ধার নিতে হবে। সেই সংখ্যাটি পরের সারিতে (বাঁয়ে) যোগ করতে হবে।

উদাহরণ-১ **উদাহরণ-২**

বাইনারি	দশমিক	বাইনারি	দশমিক
১১০০১	২৫	১০১০০১.০০	৪১.০০
-১০০১	-৯	-১১০০১.১১	-২৫.৭৫
১০০০০	১৬	১১১১.০১	১৫.২৫

বাইনারি গুণের নিয়ম

১। গুণক সংখ্যাদ্বয় যদি ১ হয় তবে গুণফল হবে ১

২। গুণক সংখ্যাদ্বয়ের যে কোনোটি ০ হলে গুণফল ০ হবে

৩। বাইনারি পদ্ধতিতে গুণফল যোগ করতে হয়

১। **উদাহরণ-১** **উদাহরণ-২**

বাইনারি	দশমিক	বাইনারি	দশমিক
১০১১	১১	১১১১	১৫
১১১	x৭	x১১০০	x১২
১০১১	৭৭	০০০০	৩০
১০১১x		০০০০x	১৫x
১০১১x		১১১১x	১৮০
১০০১১০১		১১১১x	
		১০১১০১০০	

বাইনারি ভাগের নিয়ম

১। ভাজ্যের বাঁ দিক থেকে ভাগ আরম্ভ করতে হবে।

২। ভাজক যদি ভাজ্য থেকে ছোট বা সমান হয় তবে ভাগফলের ঘরে ১ বসাতে হবে এবং ভাজক ভাজ্যের নিচে লিখে বিয়োগ করতে হবে।

৩। ভাজ্যের কোনো অবশিষ্ট থাকলে, সেই অবশিষ্ট অঙ্কসমূহ থেকে ১টি অঙ্ক বিয়োগফলের ডানে বসাতে হবে এবং ২ এ বর্ণিত নিয়মে কাজ করতে হবে।

৪। বিয়োগফলের পাশে ১টি অঙ্ক ডানে বসিয়েও যদি ভাজ্য ভাজকের চাইতে ছোট হয় তবে ভাগফলের জায়গায় ০ বসিয়ে আরেকটি অঙ্ক বিয়োগফলের ডানে বসাতে হবে এবং ২ বর্ণিত নিয়মে কাজ করতে হবে।

৫। ভাজ্যে যদি আর অবশিষ্ট না থাকে এবং ভাগশেষ ০ বা ভাজকের চাইতে ছোট হয় তবে ভাগ করার কাজ শেষ হবে।

যে নিয়মে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের কাজ করা হয় কম্পিউটার সে নিয়মে এ সব কাজ করে না। কম্পিউটার যে কোনো গাণিতিক সমস্যাকে প্রথমে যোগে রূপান্তরিত করে। তারপর সম্পাদন করে। কম্পিউটারের গুণ হল একটি সংখ্যাকে বার বার যোগ করা এবং ভাগ হল একটি সংখ্যাকে বার বার বিয়োগ করা। বিয়োগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ঋণাত্মক (Negative) সংখ্যা যোগ করে।

বাইনারি পূরক (Binary Complements)

বাইনারি পদ্ধতিতে ০ এর বাইনারি পূরক হল ১ এবং ১ এর বাইনারি পূরক হল ০। যেমন– ১০১১০০১ এর পূরক হল ০১০০১১০। কম্পিউটার বিয়োগ করে এ পূরক পদ্ধতিতে।

উদাহরণ-১

দশমিক	বাইনারি	১ এর পূরকে রূপান্তরিত বাইনারি
৯	১০০১	১০০১
-৪	-০১০০	+ ১০১১ ← পূরক বসিয়ে
৫	১০১	১ ০১০০
		└→ ১ যোগ
		১০১=৫ (দশমিক)

উদাহরণ-২

অকটাল অথবা অষ্টমিক পদ্ধতি

অকটাল পদ্ধতিকে বাংলায় বলা হয় অষ্টমিক। অকটাল বা অষ্টমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি প্রতীক বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এই ৮টি অঙ্ক ব্যবহার করে সব রকম সংখ্যা গঠন করা হয়। এ জন্য এ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ৮। ৭ থেকে বড় সংখ্যা তৈরি করার জন্য এ পদ্ধতিতে দুটি স্থানের দরকার হয়। অর্থাৎ ৭ এর পরের সংখ্যা হচ্ছে ১০, যার দশমিক মান ৮। বাইনারি পদ্ধতিতে কোনো বড় সংখ্যা লেখার জন্য অনেকগুলো অঙ্ক ব্যবহার করতে হয়। যেমন– দশমিক ১৩৪৮ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় লিখতে হলে ১১টি বাইনারি বিটের দরকার হয়। এত অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা পড়া এবং মনে রাখা কঠিন। এ অসুবিধা দূর করার জন্য অকটাল ও হেক্সাডেসিম্যাল নামে দুটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির চালু হয়। এ পদ্ধতি দুটিকে বাইনারি সংস্করণ হিসাবেও অভিহিত করা হয়। অকটাল সংখ্যা তৈরি করার জন্য একটি বাইনারি সংখ্যার প্রতি তিনটি বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে সাজিয়ে আসতে হয় এবং এক একটি ভাগকে এককভাবে নির্দিষ্ট করতে হয় ০ থেকে ৭ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে।

উদাহরণ

বাইনারি সংখ্যা	=	১০	১০০	১১০	০১০
৩টি করে বিট একত্র করে ভাগ করলে	=	০১০	১০০	১১০	০১০
অকটাল পদ্ধতিতে দাঁড়ায়	=	২	৪	৬	২
	অথবা $(২৪৬২)_৮$				

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, অকটাল সংখ্যা $(১৫০৪)_৮$ কিন্তু দশমিক সংখ্যা নয়। অকটাল ২৫০৪ সমান দশমিক সংখ্যা ১৩৪৮। অর্থাৎ $২৫০৪_৮ = ১৩৪৮_{১০}$। বাইনারি সংখ্যার বিটগুলো সাজানোর সময় যদি তিনটি বিটের কম থাকে তাহলে বাঁ দিকের খালি জায়গায় ০ দিয়ে পূরণ করতে হবে।

উদাহরণ

বাইনারি সংখ্যা	=	১	১০১	১১১
৩টি করে বিট একত্র করে ভাগ করলে	=	০০১	১০১	১১১
অকটাল পদ্ধতিতে দাঁড়ায়	=	১	৫	৭=১৫৭

দশমিক এবং বাইনারি পদ্ধতির মতো অকটাল পদ্ধতি স্থানভিত্তিক

অকটাল সংখ্যা ২৪৬২৮ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে দেখা যায়–

যে কোনো দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় এবং বাইনারি সংখ্যাকে অকটাল সংখ্যায় আবার অকটাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা যায়। দশমিক পদ্ধতি থেকে অকটাল এবং অকটাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন–
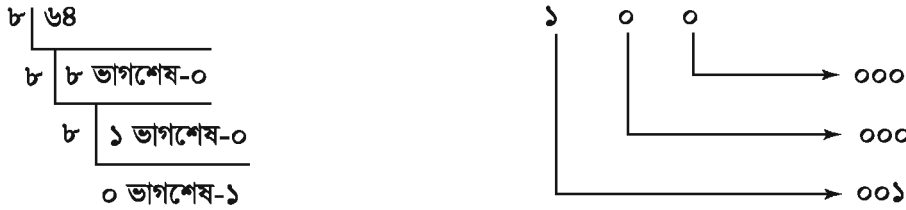
দশমিক ৬৪=অকটাল ১০০=০০১০০০০০০ বাইনারি
দশমিক ৬৪=অকটাল ১০০

হেক্সাডেসিম্যাল পদ্ধতি

বাইনারি পদ্ধতির আরেকটি সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে হেক্সাডেসিম্যাল। ১৬টি অঙ্ক দিয়ে হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যা গঠিত হয়। কাজেই এর ভিত্তি হচ্ছে ১৬। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিরে ১৬টি প্রতীক তৈরি করে। এ সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ থেকে ৯ এর সংখ্যা প্রতীক এবং ৯ এর পরের সংখ্যা হচ্ছে A, B, C, D, E, F। F হচ্ছে দশমিক ১৫। ১৫ এর পরের সংখ্যা ১৬ সংখ্যা হেক্সাডেসিম্যালে লেখার জন্য ১০ লিখতে হবে। নিচের সারণিতে দশমিক, হেক্সাডেসিম্যাল এবং বাইনারি সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল :

দশমিক	অকটাল	হেক্সাডেসিম্যাল	বাইনারি
০	০	০	০
১	১	১	১
২	২	২	১০
৩	৩	৩	১১
৪	৪	৪	১০০
৫	৫	৫	১০১
৬	৬	৬	১১০
৭	৭	৭	১১১
৮	১০	৮	১০০০

দশমিক	অকটাল	হেক্সাডেসিম্যাল	বাইনারি
৯	১১	৯	১০০১
১০	১২	A	১০১০
১১	১৩	B	১০১১
১২	১৪	C	১১০০
১৩	১৫	D	১১০১
১৪	১৬	E	১১১০
১৫	১৭	F	১১১১
২০	২৪	১৪	১০১০০

কম্পিউটারের তথ্য বিনিময়ের বিভিন্ন সংকেত

শুরুতেই বলা হয়েছে যে, কম্পিউটার কেবল বিদ্যুতের ভাষা বোঝে। এর নিজস্ব ভাষা নেই। অতএব ইংরেজি, বাংলা, আরবি এমন কোনো ভাষাই কম্পিউটার বোঝে না। কম্পিউটারকে এ সব ভাষা বোঝানোর জন্য এবং তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংকেতায়ন করে থাকে। এই সংকেতায়নের মূল উদ্দেশ্য হল একটি প্রমিত মানের তথ্য বিনিময় করা। এ সব ভাষার কোডিং-এর প্রাথমিক ভিত্তিটা অবশ্য শুরু হয় আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে।

আসকি

ইংরেজি ভাষার জন্য সারা দুনিয়ায় যে সংকেতমালা ব্যবহার করা হয় তাকে ASCII (American standard codes for interchange) বলা হয়। এই সংকেতায়নের দুটি স্তর আছে। সর্বমোট ২৫৬টি সংকেতের সাহায্যে রোমান ভাষা পরিবারসমূহ এই সংকেতের আওতায় প্রকাশ করা হয়। ২৫৬টি সংকেতের মধ্যে ১২৮টি মূল ইংরেজি ভাষার জন্য। এর মধ্যে সকল ইংরেজি হরফ, সংখ্যা, চিহ্ন ইত্যাদি রয়েছে। এ ছাড়া পরবর্তী ১২৮টি সংকেতের মধ্যে ল্যাটিন বা রোমান ভাষা পরিবারে ব্যবহারের জন্য অন্য যে সব সংকেত প্রয়োজন হয় তা রাখা হয়েছে।

বাংলা কোড

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা এখন কম্পিউটারে ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা দুনিয়াতে বহু মানুষ বাংলা ব্যবহার করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষা অফিস-আদালতে ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাষা হতে পেরেছে।

এটি এখন আন্তর্জাতিক ভাষাও। বাংলা ভাষা কম্পিউটারের বিনিময়ের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন বাংলার জন্যও একটি সংকেত প্রণয়ন করেছে। এর জন্য অনেক সময় লেগেছে। তবুও সর্বশেষ অবস্থাটি হল যে বাংলা ভাষা ইউনিকোড কোডিং সিস্টেমেই ব্যবহার করছে।

ইউনিকোড

পৃথিবীতে কেবল ইংরেজি-বাংলাই নয় আরও অনেক ভাষা রয়েছে। এ সব ভাষার আবার বর্ণের সংখ্যাও অনেক। যেমন– চীনা ভাষায় প্রায় ৮৫ হাজার বর্ণ রয়েছে। আজকাল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ার ফলে একই সাথে পৃথিবীর অনেক ভাষা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। অথচ আগে কেবল মাত্র ২৫৬টি বর্ণ ব্যবহার করা যেত। ফলে এক সাথে অনেক ভাষা ব্যবহার করা যেত না। এ সব অসুবিধার কথা ভেবে এ্যাপল কম্পিউটার, মাইক্রোসফট কর্পোরেশন ইত্যাদি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিলে কম্পিউটারে কোডের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে। এই কনসোর্টিয়ামকে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম বলে। এই কনসোর্টিয়াম সম্প্রতি পৃথিবীর সকল ভাষার জন্য মোট ৬৫৫৩৬টি কোডের ব্যবস্থা করেছে। মাইক্রোসফট-এর উইন্ডোজ ভিস্তা এবং এ্যাপল-এর সিস্টেম টেন-এ এই ইউনিকোড সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউনিকোডের সর্বশেষ সংস্করণ ৫০১।

বিট (Bit)

বিট হল বাইনারি অঙ্কের সংক্ষিপ্ত নাম। Binary Digit থেকে Bit-এর উৎপত্তি। ০ থেকে ১ প্রত্যেকটি একটি করে বিট। বাইনারি সংখ্যাকে এ দুটি বিট দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন– বাইনারি ১১০০ সংখ্যাটির চারটি বিট আছে। ১১০০১১ সংখ্যাটির ৬টি বিট আছে। এভাবে ০ থেকে ১ দিয়ে বাইনারি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

বাইট (Byte)

কয়েকটি বিট নিয়ে গঠিত অক্ষর বা শব্দকে বাইট ধরা হয়। বাইট হল বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক। সাধারণত ৮টি বিটকে ১ বাইট ধরা হয়। যেমন– ০০০০১০১০ ১টি বাইট। ০০০০১১১১ একটি বাইট। কম্পিউটারে স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা বাইটে প্রকাশ করা হয়। কম্পিউটার তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সময় ৮ বিট বা ৮ বিটের গুণিতক শব্দ ব্যবহার করে থাকে। যেমন– ৮ বিট ওয়ার্ড, ৩২ ওয়ার্ড ইত্যাদি।

কোড

সংখ্যা, অক্ষর ও বিশেষ চিহ্ন নির্দেশ করার জন্য কোড ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রকার কোড আছে। যেমন– বিসিডি, ইবিসিডিআইসি, আলফা নিউমারিক, আসকি কোড ইত্যাদি।

বিসিডি (BCD)

বাইনারি কোডেড ডেসিম্যাল (BCD=Binary Coded Decimal) দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য এই কোড ব্যবহার করা হয়। ৪টি বিট দিয়ে BCD কোড গঠিত। বিসিডি কোড প্রতিটি অঙ্কের একটি স্থানিক মান আছে। যে সব বিটের অবস্থা ১ তাদের মানের সমষ্টি দ্বারা দশমিক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। BCD ০০০১ এর দশমিক মান বের করার জন্য–

০০০১ BCD কোড

৮ ৪ ২ ১ স্থানিক মান

এখানে BCD ০০০১=০ ×৮+০ ×৪+০ ×২+১ ×১= ১ দশমিক

BCD ০০১০=০×৮+০×৪+১ ×২+০ ×১= ২ দশমিক

BCD ১০০১=১×৮+৪ ×০+০ ×২+১ ×১= ৯ দশমিক

ইবিসিডিআইসি (EBCDIC)

ইবিসিডিআইসি-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিম্যাল ইনফরমেশন কোড (Extended Binary Coded Decimal Information Code)।

উদাহরণ : EBCDIC 00011100 = A

00000101 = £

সারণি থেকে সহজেই বিটের অবস্থান অনুসারে সাজিয়ে EBCDIC কোড নির্ণয় করা যায়।

বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরা

জর্জবুল ১৮৫৪ সালে শনাক্ত করতে সক্ষম হন যে, গণিত ও যুক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তার এই বীজগণিতই বুলিয়ান বীজগণিত বা বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরা নামে পরিচিত।

বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরা সাধারণ এ্যালজ্যাবরার মতো নয়। বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরায় প্রত্যেক লকের দুটি মান (০ থেকে ১) থাকে। একটি মান সত্য হলে অন্যটি হবে মিথ্যা। যুক্তি বর্তনীর উচ্চ ভোল্টেজ ১ এবং নিম্ন ভোল্টেজ ০ হিসাবে গণ্য হয়। কোনো সার্কিটে বিদ্যুতের উপস্থিতিকে যদি ১ ধরা হয় তবে ০ দ্বারা নির্দেশ করা হয় বিদ্যুতের অনুপস্থিতি।

এই এ্যালজ্যাবরার ডিজিটাল বাস্তবায়নের জন্য তৈরি বর্তনীকে লজিক গেট বলা হয়। গেট হচ্ছে এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক বর্তনী যা এক বা একাধিক ইনপুট গ্রহণ করে এবং একটি মাত্র আউটপুট প্রদান করে। যে সকল ডিজিটাল সার্কিট যুক্তি ভিত্তিক সংকেতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেই সকল সার্কিটকেই লজিক গেট বলা হয়। কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিজিটাল সিস্টেমে ৩ ধরনের মৌলিক লজিক গেট ব্যবহার করা হয়।

১। অর অপারেশন বা যৌক্তিক যোগ

২। এ্যান্ড অপারেশন বা যৌক্তিক গুণ

৩। নট অপারেশন।

OR, AND এবং NOT এই তিনটি গেটকে মৌলিক গেট বলা হয়। এই তিনটি মৌলিক গেটের সমন্বয়ে আরও চারটি যৌগিক গেট তৈরি করা যায়। যৌগিক গেটগুলো হচ্ছে NAND গেট, NOR গেট, XOR গেট এবং XNOR গেট। বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরা যোগ চিহ্ন (+) যোগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যৌক্তিক যোগ অবশ্য সাধারণ যোগের মতো নয়।

যৌক্তিক যোগের নিয়ম হচ্ছে–

০+০=০

০+১=১

১+০=১

১+১=১

কিন্তু বুলিয়ান গুণ সাধারণ গুণের নিয়মেই হয়ে থাকে। এখানে গুণ চিহ্ন (*) যৌক্তিক গুণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গুণের নিয়ম হচ্ছে–

০×০ = ০

০×১ = ০

১×০ = ০

১×১ = ১

বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরায় শুধুমাত্র বুলিয়ান যোগ এবং বুলিয়ান গুণের সাহায্যেই সকল প্রকার গাণিতিক কাজ সম্পন্ন হয়।

সত্যক সারণি (Truth Table)

অনেক যুক্তি বর্তনীতে একাধিক ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। ইনপুটগুলোর মানের বিভিন্ন সমন্বয়ের উপর আউটপুটের মান নির্ভর করে যা সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিলে দেখানো হয়। প্রতিটি বর্তনীর এই ইনপুট-আউটপুট চার্ট পৃথক। চিত্রে ইনপুট A ও B এর সম্ভাব্য মান ছকে দেওয়া হল। আউটপুট X এর মান যুক্তি বর্তনীর উপর পরিবর্তনশীল।

লজিক গেটসমূহের কর্মপদ্ধতি

অর গেট (OR Gate) : অর গেটে দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে যার আউটপুটগুলোর যৌক্তিক যোগের সমান হয়।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
০	০	
০	১	
১	০	
১	১	

দুই ইনপুটের সত্যক সারণি

চিত্রে দুই ইনপুটের অর গেট এবং স্যতক সারণি দেওয়া হলো। ইনপুট দুটো A ও B এবং আউটপুট X ধরলে অর গেটের আউটপুট হবে X= A + B।

এখানে + চিহ্ন দ্বারা অর এর কাজ বুঝানো হয়েছে। অর গেটে যে কোনো একটি ইনপুট ১ হলেই আউটপুট -১ হয়। অর্থাৎ সবগুলো ইনপুট ০ হলে আউটপুট ০ হবে। অন্য সকল অবস্থার জন্য আউটপুট ১ হবে।

তিনটি ইনপুটের জন্য তৈরি অর গেটের নক্সা ও সত্যক সারণি দেওয়া হল।

এ্যান্ড গেট (AND Gate) : এ্যান্ড গেটের আউটপুট হয় এর ইনপুটগুলোর যৌক্তিক গুণফলের সমান। এই গেটের দুই বা ততোধিক ইনপুট হতে পারে। দুটি ইনপুটি A ও B এবং আউটপুট X ধরা হয়।

দুই ইনপুট বিশিষ্ট এ্যান্ড গেট এবং প্রত্যেক সারণিতে দেখানো হল।

এ্যান্ড গেট এর আউটপুট হবে ইনপুট দুটির যৌক্তিক গুণফলের সমান, অর্থাৎ X= AB।

একমাত্র A=B=১ হলে (X)=১ হবে, অন্য যে কোনো অবস্থার জন্য X-এর মান ০ হবে।
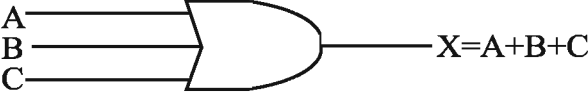
সত্যক সারণি

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X=A+B
০	০	০
০	১	১
১	০	১
১	১	১

অর গেট-এর প্রতীক ইনপুট গ্রহণের সত্যক সারণি
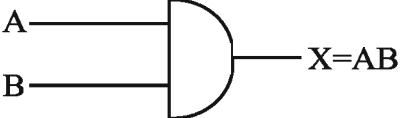
সত্যক সারণি

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X=A+B+C
০	০	০	০
০	০	১	১
০	১	০	১
০	১	১	১
১	০	০	১
১	১	০	১
১	১	১	১

তিনটি ইনপুট গ্রহণের জন্য তৈরি অর গেট তাত্ত্বিকভাবে এ রকম হতে পারে

সত্যক সারণি
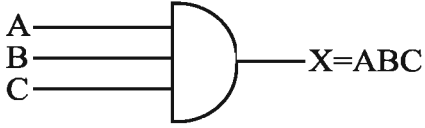
ইনপুট		আউটপুট
A	B	X=AB
০	০	০
০	১	০
০	১	০
১	০	০
১	১	১

এ্যান্ড গেটের প্রতীক সারণি

এখানে দেখা যাচ্ছে একমাত্র A+B+C=১ অবস্থার জন্য X–এর মান ১ হবে। অন্য সকল অবস্থার জন্য X–এর মান ০। অর্থাৎ একমাত্র সকল ইনপুটের মান ১ হলেই আউটপুট ১ হবে।

নট গেট (NOT Gate) : নট গেটে একটিমাত্র ইনপুট এবং একটি আউটপুট থাকে। নট গেটের নক্সা ও সত্যক সারণি দেওয়া হল (চিত্র ৪.৬)। যদি A=০ হয় তবে X=০=১, কারণ নট ০=১।

সত্যক সারণি

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X=ABC
০	০	০	০
০	০	১	০
০	১	০	০
০	১	১	০
১	০	০	০
১	০	১	০
১	১	০	০
১	১	১	১
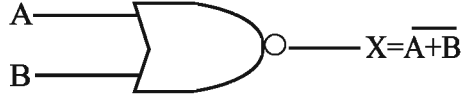
তিনটি ইনপুট তৈরির জন্য এ্যান্ড গেট ও তার সত্যক সারণি

যদি A=১ হয় তবে X=১=০, কারণ নট ১=০ এখানে (-) চিহ্ন দিয়ে অপারেশন বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আউটপুট X–এর মান সব সময়ই ইনপুট A–এর বিপরীত হয়ে থাকে।

নর গেট (NOR Gate) : অর গেট ও নরগেটের সমন্বিত গেটকে নর গেট বলে। চিত্র জ-এ দুই ইনপুট নরগেটের নক্সা ও সত্যক সারণি দেওয়া হল। অর গেটের আউটপুটে একটি ছোট বৃত্ত নর গেটের প্রতীক হয়। এই ছোট বৃত্তটাই নট অপারেশন নির্দেশ করে।
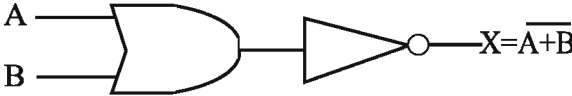
নর গেটের আউটপুট X=A+B

এখানে দেখা যাচ্ছে যে NOR গেটের আউটপুট হচ্ছে OR গেটের আউটপুটের বিপরীত।

সত্যক সারণি

ইনপুট			আউটপুট
A	B	A+B	$X=\overline{A+B}$
০	০	০	১
০	১	১	০
১	০	১	০
১	০	১	০

নর গেট-এর প্রতীক ও সত্যক সারণি

ন্যান্ড গেট (NAND Gate) : AND গেট ও NOT গেটের সমন্বয়ে ন্যান্ড গেট তৈরি হয়। অর্থাৎ এ্যান্ড গেটের আউটপুটকে NOT গেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে তখন তাকে NAND গেট বলে। এ্যান্ড গেটের আউটপুটে একটি ছোট বৃত্ত দিলে NAND গেটের প্রতীক হয়।

অর্থাৎ NAND গেটের আউটপুট হচ্ছে AND গেটের আউটপুটের বিপরীত।

এক্সঅর গেট (XOR Gate) : Exclusive OR-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো XOR. XOR গেট মৌলিক গেট দিয়ে তৈরি করা হয়। আবার সমন্বিত সার্কিট হিসেবেও পাওয়া যায়। এই গেট দুটি বিটের তুলনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। নিচের ছবিতে XOR গেটের প্রতীক ও সত্যক সারণি দেওয়া হল :

সত্যক সারণি

ইনপুট			আউটপুট
A	B	AB	X=AB
০	০	০	১
০	১	০	১
১	০	০	১
১	১	১	০

ন্যান্ড গেট-এর প্রতীক ও সত্যক সারণি
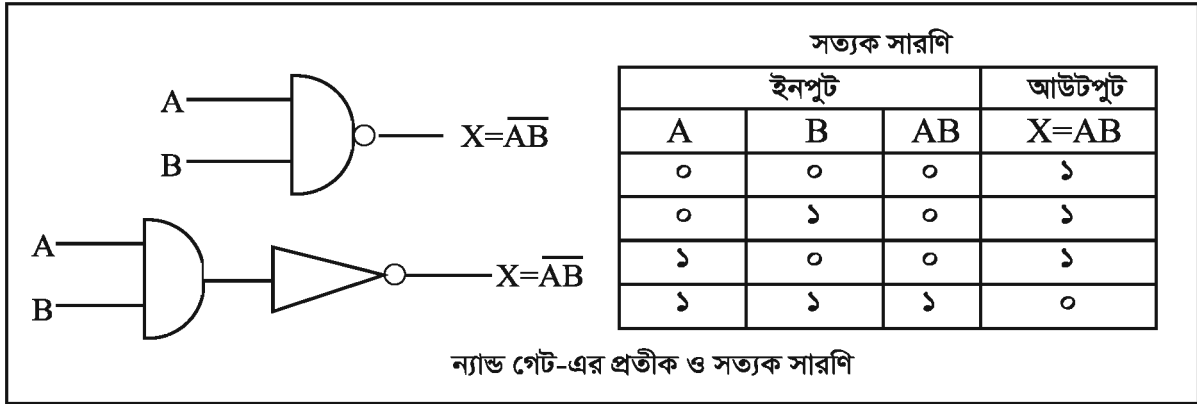
XOR গেটের আউটপুট X=A** B

এখানে চিহ্নটি দিয়ে NOR এর কাজ বুঝানো হয়েছে।

বা X= AB + AB

এখানে দেখা যাচ্ছে ইনপুট দুটির একই মানের জন্য আউটপুট ০ এবং ইনপুট দুইটির ভিন্ন মানের জন্য আউটপুট ১ হয়।

এক্সনর গেট (XNOR Gate) : এক্সঅর গেট এবং নট গেটের সমন্বয়ে এক্সনর গেট গঠিত হয়। এক্সঅর গেটের আউটপুটের একটি ছোট বৃত্ত দিলে এক্সনর গেটের প্রতীক তৈরি হয়। চিত্রে XNOR Gate ও সত্যক সারণি দেওয়া হল। এখানে দুটি ইনপুটের একই মানের জন্য আউটপুট ১ এবং ইনপুট দুটির ভিন্ন মানের জন্য আউটপুট ০ হয়। সাধারণত দুটি বিট একই কি না তা তুলনা করার কাজে এক্সনর গেট ব্যবহৃত হয়।

সত্যক সারণি

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X=A+B
০	০	০
০	১	১
১	০	১
১	১	১

এক্সঅর গেট-এর প্রতীক ও সত্যক সারণি
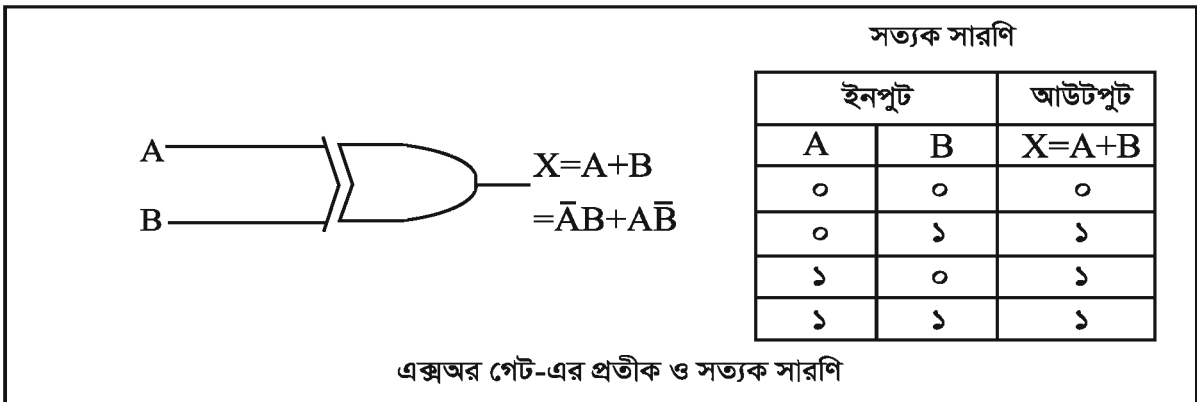
বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরা ও সরলীকরণ

বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরার সাহায্যে লজিক সার্কিটের কর্মপদ্ধতিকে সমীকরণ আকারে ব্যক্ত করা হয়। এই সমীকরণকে বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরার মাধ্যমে সরলীকরণ করে বর্তনীর আকার ছোট করা হয়।

$$X=\overline{A+B}$$
$$=\overline{AB+AB}$$

সত্যক সারণি

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X=A+B
০	০	১
১	০	০
০	১	০
১	১	১

এক্সনর গেট-এর প্রতীক ও সত্যক সারণি
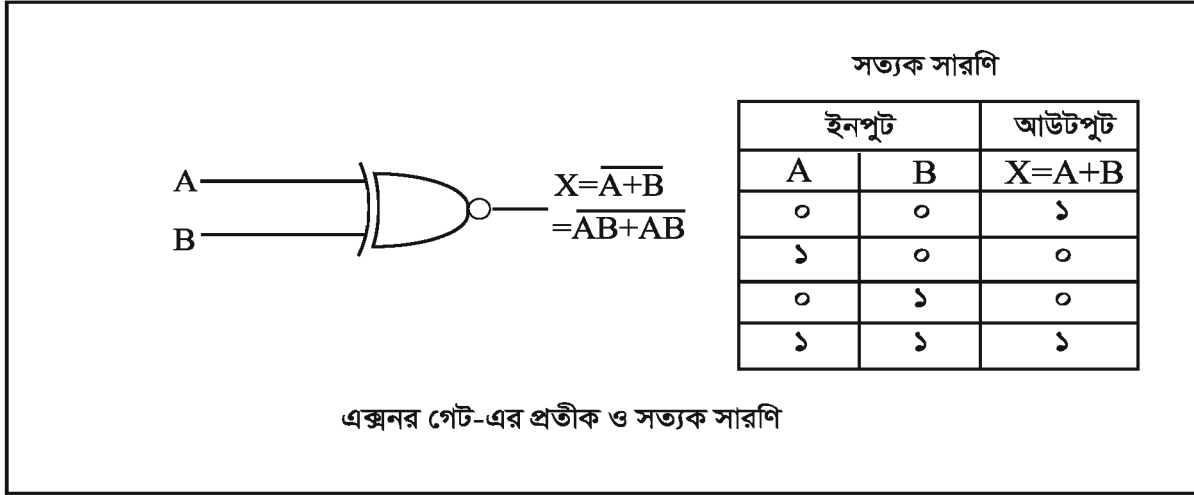
চিত্র ৪.১১ তে (ক) এর আউটপুট বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরার সাহায্যে সরলীকরণ করে যে সমীকরণ তৈরি হয় সেই সমীকরণ থেকে চিত্র–৪.১১ এর (খ) লজিক সার্কিট তৈরি করা যায়। চিত্র ৪.১১-এর (ক) এবং (খ) এই দুই বর্তনীর সাহায্যে একই কাজ করা যায়। কিন্তু (ক) এর বর্তনীর চেয়ে (খ) এর বর্তনী অনেক সরল, সহজ এবং বর্তনী তৈরির খরচ অনেক কম।

$$X=\overline{(A+B+\overline{C})}\ B\overline{C}$$
$$=(\overline{A+B}.C)\ BC$$
$$=\overline{A}.\overline{B}.C)\ BC$$
$$=\overline{A}.\overline{B}.C$$

(ক)

প্রদত্ত উপাত্তের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ যুক্তি বর্তনী (ক)

প্রদত্ত উপাত্তের ভিত্তিতে সরলীকৃত যুক্তি বর্তনী (খ)
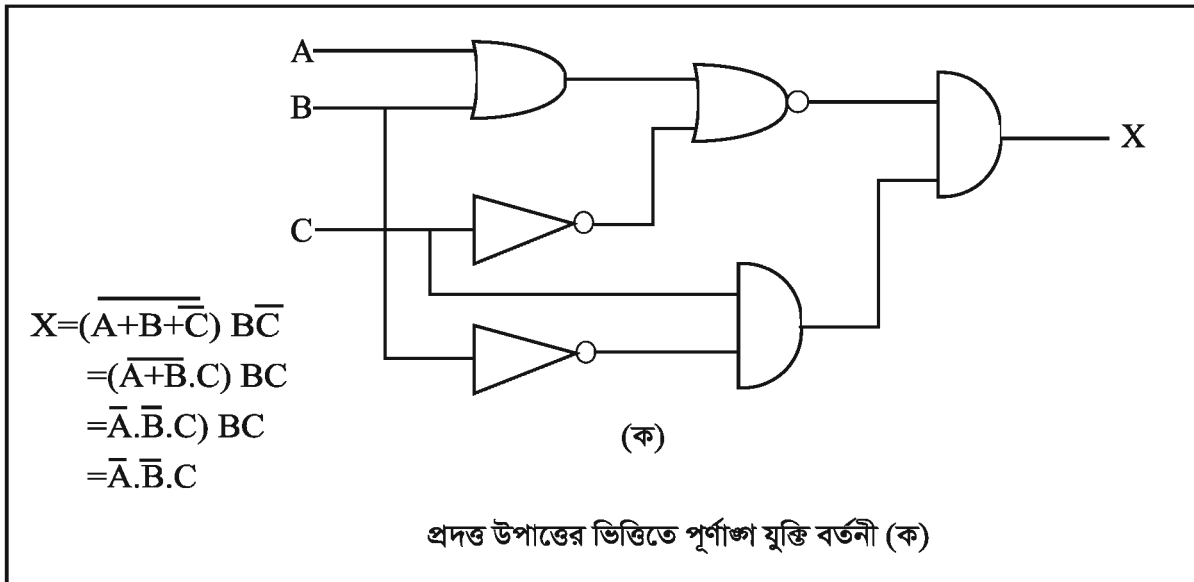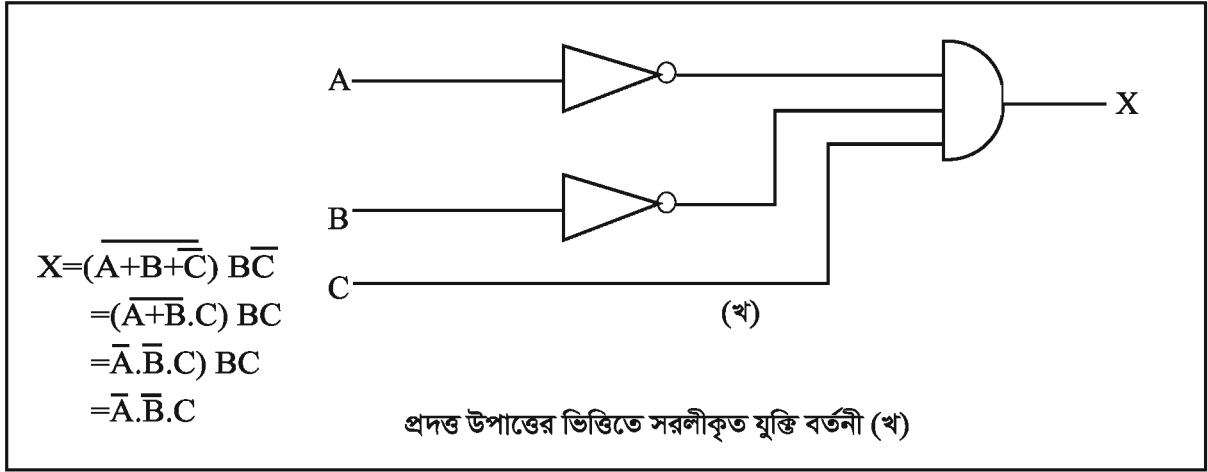
সারমর্ম

বর্তমানে হিসেব-নিকেশের যে সংখ্যা পদ্ধতি মানুষ ব্যবহার করে প্রাচীন কালের মানুষ এ ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত না। তারা গণনা কাজ করত হাতের আঙুল, নুড়ি, কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে। বহুদিনের বহু গণিতবিদ এবং দার্শনিকবৃন্দের বহু সাধনার ফসল হিসেবে আমরা বর্তমানের এ সংখ্যা পদ্ধতি লাভ করেছি। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আরবরা ভারতীয়দের নিকট থেকে ১০ ভিত্তিক ও ৬০ ভিত্তিক গণনা পদ্ধতির ব্যবহার শিখেছিল। আরব বিজ্ঞানী আলখোয়ারিজমী ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিরে উপর বই রচনা করেন। তাঁর বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর ইউরোপ ও অন্যান্য উন্নত দেশে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি হিসাবে প্রচলিত হয়। এখন সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় গণনামূলক কাজ হয় ১০ ভিত্তিক বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে। কিন্তু, কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ হয় ২ ভিত্তিক বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে শুধুমাত্র শূন্য (০) এবং এক (১) এই দুটি সংখ্যা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া কম্পিউটারের কাজের জন্য অকটাল বা ৮ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি এবং হেক্সাডেসিম্যাল বা ১৬ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ (শূন্য) থেকে ৭ পর্যন্ত মোট আটটি অঙ্ক ব্যবহার করে সব ধরনের সংখ্যা গঠন করা হয়। হেক্সাডেসিম্যাল পদ্ধতিতে ১৬টি সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির দশটি অঙ্ক (০...৯) এবং এর পরে A, B, C, D, E, F এই ৬টি বর্ণ মিলিয়ে মোট ১৬টি সংখ্যা প্রতীক ও বর্ণ দিয়ে ১৬ ভিত্তিক বা হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত বিটে এক বাইট?

ক. ৮	খ. ১৬
গ. ৩২	ঘ. ৬৪

২. যে ধারণা থেকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে–

i. ON ও OFF
ii. High ও Low
iii. Negative ও Positive

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii এবং iii

[নিচের সারণিটি দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

A	B	X
০	০	০
০	১	০
১	০	০
১	১	১

৩. সত্যক সারণিটি কোন গেট নির্দেশ করে?

ক. OR খ. XOR

গ. NOT ঘ. AND

৪. সত্যক সারণিটি যে বুলিয়ান সমীকরণকে নির্দেশ করে–

ক. $X=A+B$ খ. $X=AB$

গ. $X=\overline{A+B}$ ঘ. $X=\overline{AB}$

৫. $(৫)_৮$ কে বাইনারিতে প্রকাশ করলে কত হবে?

ক. ০০১ খ. ১১০

গ. ১০১ ঘ. ০১১

সৃজনশীল প্রশ্ন

চিত্রটি লক্ষ কর–

চিত্র :
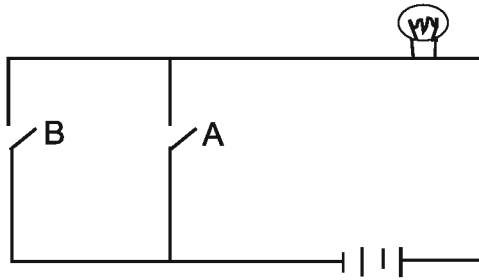
ক. উপরিউক্ত লজিক সার্কিটটি কোন মৌলিক গেটকে নির্দেশ করে।

খ. প্রদত্ত লজিক সার্কিট থেকে সত্যক সারণি নির্ণয়ের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

গ. উপর্যুক্ত গেটের ব্যবহার করে বুলিয়ান এ্যালজ্যাবরার সাহায্যে $X=\overline{(A+B+\overline{C})}.\overline{B}C$ উপপাদ্যের যুক্তি বর্তনী অংকন কর।

ঘ. "লজিক গেট-কম্পিউটারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" – বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ওয়ার্ড প্রসেসিং

(মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৭)

প্রসেসিংয়ের বাংলা অর্থ হচ্ছে শব্দ প্রক্রিয়াকরণ। সহজভাবে বলা যায় লেখালেখির কাজ। কম্পিউটারের সাহায্যে লখির কাজ করাকেই ওয়ার্ড প্রসেসিং বলা হয়। কালি-কলম দিয়ে কাগজের উপর লেখালেখির সঙ্গে আমরা সবাই ত। স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করা এবং পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কাগজ-কলমের ব্যবহার সবার পরিচিত। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি এখনও চালু আছে। কম্পিউটারের সাহায্যে লেখালেখির কাজ করা হলেও প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া এবং পরীক্ষার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় না। পড়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আনুষঙ্গিক দ বিস্তারিতভাবে জানার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়। কিন্তু, পরীক্ষা গ্রহণের বর্তমান পদ্ধতিতে উটার ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

উটারে লেখালেখির কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে বইপত্রসহ অন্যান্য প্রকাশনা এবং পত্র-পত্রিকার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর আগে এ সব প্রকাশনা কাজের জন্য সীসার টাইপ বা অক্ষর ব্যবহার করে হাতে জ করা হত। হাতে কম্পোজ করার পর ট্রাডেল প্রেস, ফ্ল্যাটবেড প্রেস অথবা অফসেট প্রেসে ছাপার কাজ করা হত।

একটি করে সীসার অক্ষর সাজিয়ে পুরো কোনো বিষয় কম্পোজ করতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হত। সীসার গুলো বারবার ব্যবহার করার ফলে ক্ষয়ে যেত, ভেঙ্গে যেত। ছাপার পর ক্ষয়ে যাওয়া অক্ষরগুলো অস্পষ্ট দেখা বং ভাঙা অক্ষরগুলো ভাঙা দেখা যেত। এতে ছাপার কাজ সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হত না। আর, অস্পষ্ট ও ভাঙা র জন্য অনেক ক্ষেত্রে পড়তে অসুবিধা হত।

উটারে লেখালেখির কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এ সব অসুবিধা দূর হয়েছে। এখন অনেক কম এবং অপেক্ষাকৃত নির্ভুলভাবে সব ধরনের প্রকাশনার কাজ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকাশনার মানও আগের চেয়ে উন্নত এবং আকর্ষণীয় হয়েছে।

সহ অন্যান্য প্রকাশনা এবং পত্রপত্রিকার বিষয় কম্পিউটারে টাইপ করে প্রস্তুত করাকে বলা হয় কম্পিউটার জ করা। অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে ক্যাশমেমো, রসিদ, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ছোট আকারের পুস্তিকা, পত্র, চুক্তিনামা, পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি। এ ছাড়া, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে শুরু করে অফিস-আদালতের গাযোগ, নথিপত্র লিখন ইত্যাদি ক্ষেত্রের বেশিরভাগ টাইপ করার কাজ বা লেখালেখির কাজ এখন কম্পিউটারের য্য করা হয়।

উটারের সাহায্যে লেখালেখির কাজ বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই করা যায়।

পউটারে টাইপ করার পদ্ধতি

বার্ড ও মাউস

উটারে টাইপ করার জন্য প্রথমে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম খুলতে হবে। ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম খোলার নিয়ম রিক অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম হচ্ছে মাইক্রোসফট । ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম খোলার পর কী-বোর্ডের সাহায্যে টাইপ করার কাজ শুরু করতে হবে। যান্ত্রিক টাইপ রর কী-বোর্ড এবং কম্পিউটারের কী-বোর্ড মূলত একই। ইংরেজিতে টাইপ করার জন্য সরাসরি টাইপের কাজ রা যায়। বাংলায় টাইপ করার জন্য একটি কমান্ড ব্যবহার করে কী-বোর্ডটিকে বাংলা কী-বোর্ডে রূপান্তরিত করে হয়। টাইপের কাজের জন্য কী-বোর্ডের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ হচ্ছে মাউস। টাইপ করা বিষয় ভাবে বিন্যস্ত করার জন্য সম্পূর্ণ লেখা বা অংশবিশেষ সিলেক্ট করার জন্য মাউস ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া, নীয় কমান্ড সিলেক্ট করার জন্য মাউস ব্যবহার করা হয়।

উইন্ডো পরিচিতি
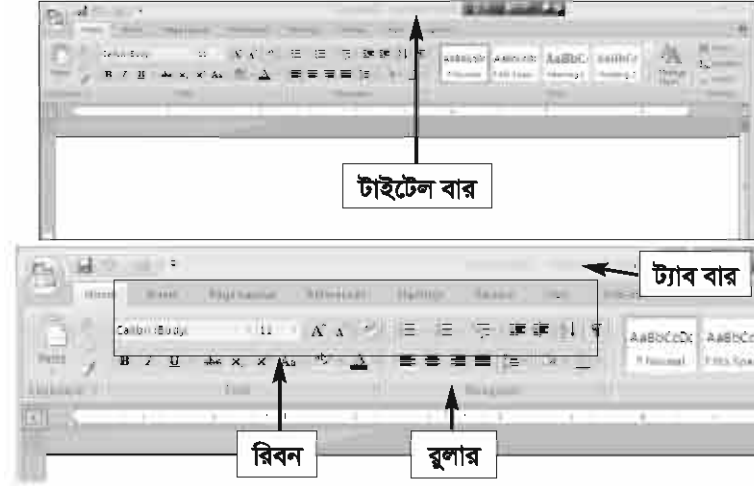
মাইক্রোসফট ওয়ার্ড খোলার পর কম্পিউটারের পর্দার উপরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামের যে পর্দা আসে সেই পর্দাটিকে বলা হয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামের উইন্ডো। উইন্ডোকে সংক্ষেপে শুধু পর্দা বলেও উল্লেখ করা হয়। আমরা যেমন টেবিলের উপর কাগজ রেখে লিখি এ উইন্ডোটি ঠিক তেমনি। এ উইন্ডোতেই টাইপের কাজ করতে হয়। টাইপের কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার সহায়ক উপকরণ রয়েছে। যেমন– মেনু বার, টাইটেল বার, ভার্টিক্যাল ও হরাইজন্টাল স্ক্রোল বার, টুল বার, রুলার, রিবন ইত্যাদি।

ট্যাব (Tab) : পর্দার উপরের দিকে এক সারিতে Home Page Layout View Insert ইত্যাদি লেখা রয়েছে। এ সারিটিকে বলা হয় ট্যাব বার। Home Page Layout View Insert ইত্যাদি শব্দগুলো হচ্ছে একেকটি ট্যাবের নাম। প্রত্যেকটি ট্যাবের অধীন অনেকগুলো কমান্ডের রিবন রয়েছে। ট্যাবে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট ট্যাবের অধীন রিবনের কমান্ডগুলো দেখা যায়। এ সব কমান্ডের সাহায্যে অধ্যায়-অনুচ্ছেদ বিন্যাস করা, পৃষ্ঠা সাজানো, লাইন বা শব্দের নিচে বা উপরে বা চারদিকে রেখা টানা, অক্ষর ডান দিকে হেলান, মোটা বা অন্যান্য আকার ও আকৃতি বিশিষ্ট করা ইত্যাদি আরও বহু রকমের কাজ করা যায়।
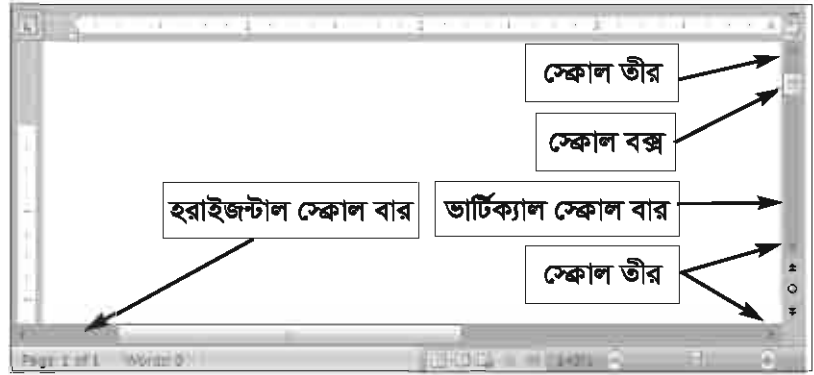
রিবন (Ribbon) : ট্যাবের নিচের সারি হচ্ছে রিবন (Ribbon)। রিবনে রয়েছে অক্ষরের আকার-আকৃতি নির্ধারণ, সমগ্র লেখাকে বাম, মধ্য ডান বা সমবিন্যাসে বিন্যস্ত করা, বার ও বর্ডার ব্যবহার করা, নম্বর ও বুলেট ব্যবহার করা, পৃষ্ঠা সজ্জা ইত্যাদি কাজের সুযোগ। একেক ট্যাবের অধীন রিবনে একেক রকমের কাজের কমান্ড রয়েছে।

রুলার (Ruler) : রিবনের নিচে রয়েছে রুলার। লেখার পাশাপাশি মাপ নির্ধারণ করা, লেখাকে ডানে বা বাঁয়ে সরিয়ে নেওয়া, অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনকে ভেতরের দিকে বা বাইরের দিকে রাখা, ট্যাব ব্যবহার করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করার জন্য রুলার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।
রুলারের নিচে শূন্য পর্দার সবটুকুই লেখালেখির জায়গা।

ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বার ও হরাইজন্টাল স্ক্রোল বার (Vertical and Horizontal Scroll Bar) : শূন্য পর্দার ডান দিকে ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বার। নিচে হরাইজন্টাল স্ক্রোল বার। ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বার-এর উপরে ও নিচে একটি করে

স্ক্রোল তীর রয়েছে। তীর দুটির মাঝখানে রয়েছে স্ক্রোল বক্স। স্ক্রোল বক্সটি কাজের সময় পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে উপরে নিচে ওঠানামা করে। টাইপ করা বিষয় একাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত হলে স্ক্রোল বার-এর সাহায্যে স্ক্রোল করে পর্দার বাইরের অংশের লেখা পর্দার ভেতরে এনে দেখতে হয়। লেখার ভুলত্রুটি দেখার জন্য এবং লেখাকে বিন্যস্ত করার জন্য পর্দার বাইরের লেখা ভেতরে এনে দেখতে হয়।

পৃষ্ঠার আকার নির্ধারণ

লেখালেখির কাজ শুরু করার আগে পৃষ্ঠার পাশাপাশি মাপ ঠিক করে নিতে হয়। পৃষ্ঠার পাশাপাশি মাপ প্রাথমিকভাবে মনিটরের পর্দার সমান রাখাই ভালো। এতে পাশাপাশি সবটুকু লেখা দেখার জন্য পাশাপাশি স্ক্রোল করার প্রয়োজন হয় না।

পৃষ্ঠার পাশাপাশি এবং উপর নিচের মাপ নির্ধারণ করতে হয় পেজ সেটআপ (Page Setup) ডায়লগ বক্সের সাহায্যে। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা এবং ইংরেজি

কম্পিউটারে বাংলা সফটওয়্যার সন্নিবেশিত থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় টাইপ করা যায়। টাইপ শুরু করেই যদি দেখা যায় ইংরেজি অক্ষর আসছে এবং ইংরেজিতেই টাইপের কাজ করা প্রয়োজন, তাহলে টাইপ করে যেতে হবে। যদি বাংলায় টাইপের প্রয়োজন হয় তাহলে বাংলা অক্ষর পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কমান্ড প্রদান করে বাংলায় লেখালেখি বা টাইপের কাজ শুরু করতে হবে। কমান্ডের ব্যবহার ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক অংশে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ও নতুন লাইন

অনুচ্ছেদ বলতে আমরা বেশ কয়েকটি লাইন বা অনেকগুলো লাইনের সমন্বয়ে গঠিত একটি অংশকে বুঝি। কিন্তু কম্পিউটারের কাজে অনুচ্ছেদের অর্থ হচ্ছে এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে লাইন শুরু করা। একটি লাইন টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে পরের লাইন টাইপ করলে কম্পিউটার দ্বিতীয় লাইনটিকে নতুন অনুচ্ছেদ হিসেবে গণ্য করে। এভাবে এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে পরপর দশটি লাইন টাইপ করলে কম্পিউটার একে দশটি অনুচ্ছেদ হিসেবে গণ্য করবে। লেখা সম্পাদনার সময় অনুচ্ছেদ এবং নতুন লাইন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

টাইপ করা বিষয়বস্তু সংরক্ষণ

একটি অনুচ্ছেদ বা দশ পনের লাইন টাইপ করার পর টাইপ করা বিষয়বস্তু সংরক্ষণ বা সেভ (Save) করে নিতে হয়। না হলে বিভিন্ন কারণে টাইপ করা বিষয়বস্তু মুছে যাওয়ার ভয় থাকে, বিশেষ করে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে। সেভ বা সংরক্ষণ করতে হয় ফাইল হিসেবে। এ ফাইলের একটি নাম দিতে হয়। এতে পরবর্তী সময়ে ঐ ফাইল নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট ফাইলটি খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।

কাজ সমাপ্ত /ফাইল বন্ধ করা

ধরা যাক, ফাইলের সবটুকু অংশ টাইপ করা হয়ে গেছে। এখন এ ফাইলে রাখার মতো কাজ হাতে নেই। অতএব, এ ফাইলটি বন্ধ করে তুলে রাখতে হবে। এমনও হতে পারে যে, ফাইলে রাখার মতো কাজ এখনও বাকি আছে। কিন্তু সময় নেই। তাহলেও ফাইলটি বন্ধ করে তুলে রাখতে হবে। কোনো একটি ফাইলের কাজ বন্ধ করার জন্য অফিস বাটনের Close কমান্ড সিলেক্ট করলে ফাইলটি বন্ধ হয়ে যাবে।

সেভ না করে ফাইল বন্ধ করতে গেলে পর্দায় একটি সতর্কতাসূচক লেখা আসবে 'তুমি বন্ধ করার আগে ফাইলটি সেভ করতে চাও কিনা?' এ ক্ষেত্রে 'হ্যা' সূচক ঘরে ক্লিক করলে পর্দায় সেভ এ্যাজ ডায়লগ বক্স আসবে। ইতোপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে তা ফাইলে সেভ করতে হবে।

বন্ধ করে দেওয়া কোনো ফাইল নিয়ে পুনরায় কাজ করার জন্য ফাইলটি খুলে কাজ শুরু করতে হবে। ফাইল খোলার পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক অংশে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

লেখা সম্পাদনা ও সজ্জিতকরণ

বানান সংশোধন : লেখা সম্পাদনার প্রথম কাজ হচ্ছে বানান সংশোধন করা। কম্পিউটারে বানান সংশোধনের কাজ বলতে ভুল বানান বিশিষ্ট শব্দ মুছে ফেলে সঠিকভাবে টাইপ করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যেকার ভুল অক্ষর বা অক্ষরগুলো মুছে ফেলে সঠিক অক্ষর বা অক্ষরগুলো টাইপ করে বানান শুদ্ধ করতে হয়। তবে, অসতর্কতা বা না জানার করণে পুরো ফাইলের বিষয়বস্তুতে এক বা একাধিক বানান ভুল হয়ে যেতে পারে। যেমন– কোনো একটি লেখায় এক ব্যক্তির প্রকৃত নাম 'গোমেজ'-এর পরিবর্তে সর্বত্র 'গোপাল' টাইপ করা হয়েছে। এ ধরনের ভুলের ক্ষেত্রে রিপ্লেস (Replace) কমান্ডের সাহায্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ফাইলের সবগুলো ভুল বানান শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। রিপ্লেস (Replace) কমান্ড ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক অংশে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, অভিধান ব্যবহার করেও সম্পূর্ণ লেখার ভুল বানানগুলো শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। অভিধানের সাহায্যে বানান সংশোধনের কাজ শুধু ইংরেজির জন্য প্রযোজ্য।

কাট (Cut), কপি (Copy), পেস্ট (Paste) : কাট, কপি ও পেস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো শব্দ, লাইন, বাক্য, অনুচ্ছেদ বা যে কোনো প্রয়োজনীয় অংশ এক স্থান থেকে তুলে অন্য স্থানে বসানো যায়। কাট কমান্ডের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা বিষয়বস্তু মূল স্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে তুলে নেওয়া হয়। মূল স্থানে ঐ অংশের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু কপি কমান্ডের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা বিষয়বস্তু মূল স্থানেও পরিবর্তিত থেকে যায়।

আনডু (Undo) : এডিট মেনুর আনডু কমান্ডটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভুলক্রমে ব্যাকস্পেস বা অন্য কোনো বোতামে চাপ লাগার ফলে সিলেক্ট করা কোনো অংশ মুছে গেলে, কোনো শব্দ অনুচ্ছেদ বা অংশ কাট বা কপি করা হলে বা অন্য কোনো একটি ভুল কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি মনে হয় যে, কাজটি ঠিক হয়নি, তাহলে অন্য কোনো কাজ করার আগেই এডিট মেনুর ঠিক নিচে আনডু (Undo) কমান্ড দিলে মুছে যাওয়া, কাট বা কপি করা বিষয়বস্তু ফিরে আসবে।

অক্ষর ছোট-বড় করা : লেখা বিন্যস্ত করার জন্য কোনো শব্দ, লাইন, অনুচ্ছেদ বা কোনো অংশের অক্ষর ছোট বা বড় করার প্রয়োজন হয়। যেমন– প্রধান শিরোনামের লেখা বড় অক্ষরে হয়ে থাকে। উপ-শিরোনামের অক্ষর প্রধান শিরোনামের অক্ষরের চেয়ে ছোট হয়ে থাকে। এ রকম প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষেত্রেও অক্ষর ছোট-বড় করার প্রয়োজন হয়। অক্ষরের মাপ নির্ধারিত হয় পয়েন্টের মাপে। পয়েন্ট হচ্ছে অক্ষরের মাপ। একটি অক্ষর ১ পয়েন্ট থেকে ১৬৩৮ পয়েন্ট পর্যন্ত ছোট-বড় করা যায়।

অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তন করা : একেক রকমের ফন্ট বা লিপিমালার আকৃতি একেক রকমের। কাজেই, অক্ষরের আকৃতি নির্বাচনের কাজ করতে হয় ফন্ট (Font) বক্সের সাহায্যে। ফন্ট বক্সে বিভিন্ন আকৃতির অক্ষরের নাম দেওয়া আছে। যেমন- সুতন্বীএমজে, টাইমস, হেলভিটিকা, এরিয়াল ইত্যাদি। যে ফন্ট সিলেক্ট করা হবে, অক্ষরগুলোও সেই ফন্টের আকৃতির হবে। সুতন্বীএমজে, চন্দ্রাবতীএমজে ইত্যাদি ফন্টগুলো হচ্ছে বাংলা অক্ষর নির্দেশক।

অক্ষর মোটা (Bold) করা, ডান দিকে হেলান (*Italic*) ও (Underline) আন্ডারলাইন করা : অক্ষর মোটা করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ, লাইন, অনুচ্ছেদ বা অংশ সিলেক্ট করার পর রিবনের B বোতামে চাপ দিলে অক্ষর মোটা হবে, *I* বোতামে চাপ দিলে অক্ষর ডান দিকে হেলান হবে এবং U বোতামে চাপ দিলে অক্ষর আন্ডারলাইনযুক্ত হবে।

ফন্ট ডায়লগ বক্সের সাহায্যে অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তনের আরও অনেক রকম কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

মার্জিন বিন্যাস (Alignment) : ডকুমেন্ট উইন্ডোতে পর্দার উপরের অংশের রুলারের উপরে অবস্থিত রিবনে রয়েছে চারটি এ্যালাইনমেন্ট আইকন। এই আইকনগুলোর সাহায্যে লেখার মার্জিন বিন্যাস করতে হয়। পুরো ফাইলের বিষয়বস্তুর মার্জিন বিন্যাস করার প্রয়োজন হলে পুরো ফাইলের বিষয়বস্তু সিলেক্ট করে নিতে হয়। অন্যথায় যে অংশের

বিষয়বস্তুর মার্জিন বিন্যাস করার প্রয়োজন শুধু সেই অংশ সিলেক্ট করে নিয়ে মার্জিন বিন্যাসের কাজ করতে হয়।

কলাম (Column) বিন্যাস : মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, সংবাদ পরিক্রমা বা নিউজ লেটার ইত্যাদির বিষয়বস্তু সাধারণত কলাম হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়। কলাম বিন্যাসের কাজ খুবই সহজ। প্রাথমিক টাইপ যে মাপেই করা হোক না কেন, অসুবিধা নেই। বানান সংশোধন এবং সম্পাদনার অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার পর গোটা বিষয়বস্তুকে কলামে বিন্যস্ত করে নেওয়া যায়।

পত্রিকা, সংবাদ পরিক্রমা, মুখপত্র, নিউজ লেটার ইত্যাদির বিষয়বস্তু মুদ্রণের পাশাপাশি মাপ কতটুকু হবে তা আগে নির্ধারণ করে নিতে হবে। ধরা যাক, পাশাপাশি মুদ্রণ এলাকা সোয়া ৬ ইঞ্চি। এই মুদ্রণ এলাকার মধ্যে লিখিত বিষয়বস্তু দুই কলামে বিন্যস্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুই কলামের মাঝখানে .২৫ ইঞ্চি জায়গা খালি রাখা হবে। এতে প্রতি কলামের প্রস্থ হবে ৩ ইঞ্চি। বিষয়বস্তুকে ৩ কলামে বিন্যস্ত করতে হলে কলামের মাঝখানের জায়গা যদি আগের মতোই .২৫ ইঞ্চি রাখা হয়, তাহলে কলামের প্রস্থ হবে ১.৮৩ ইঞ্চি। ইচ্ছে করলে চার কলামেও বিন্যস্ত করা যেতে পারে। তাতে প্রতি কলামের প্রস্থ আরও কমে যাবে।

সারণি (Table) : কোনো বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ঘরে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করাকেই সারণি হিসেবে অভিহিত করা হয়। নাম, পরিচয়, সংখ্যা, মন্তব্য ইত্যাদি বিভিন্ন ঘরে সাজিয়ে পরিবেশন করার জন্যই প্রধানত সারণির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে।

কলাম তৈরি করার পর কলামের পাশাপাশি মাপ ছোট-বড় করা যায়, দুই কলামের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা কম-বেশি করা যায়, সারি বা ঘরের উচ্চতা কম-বেশি করা যায়, সারণি/সারির মার্জিন বিন্যাস করা যায়, সারণিতে নতুন বিষয়বস্তু টাইপ করা যায়, বিভিন্ন ঘর, সারি ও কলামে যাওয়া যায়, বাড়তি সারি যোগ করা যায়, সারণির মাঝখানে বা উপরে সারি যোগ করা যায়, নতুন কলাম যোগ করা যায়, সারি বাদ দেওয়া যায়, কলাম বাদ দেওয়া যায়, সারণি বিভক্ত ও সংযুক্ত করা যায়, শিরোনাম বসানোর জন্য সারণি নিচে নামানো যায়, সারণির বিষয়বস্তু সম্পাদনা করা যায়, সারণির লেখা সজ্জিত করা যায়, লেখার উপরে এবং নিচে ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ যায়, সারণিতে রেখা বেষ্টনী (Box) ও অন্যান্য রেখা যুক্ত করা ও বাদ দেয়া যায়।

শীর্ষচরণ (Header), পাদচরণ (Footer) : বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে অনেক সময় বইয়ের নাম লেখা থাকে। পৃষ্ঠার উপরের এই পরিচিতিমূলক লেখাকে শীর্ষচরণ বা হেডার (Header) বলা হয়। শীর্ষচরণ এক বা একাধিক লাইনের হতে পারে। এক লাইনের শীর্ষচরণই সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

পৃষ্ঠার নিচে পৃষ্ঠা সংখ্যা, ফর্মা সংখ্যা বা ইচ্ছে করলে আরো কিছু সংযোজন করা যেতে পারে। পৃষ্ঠার নিচের লেখাকে বলা হয় পাদচরণ বা ফুটার (Footer)। পাদচরণে সাধারণত পৃষ্ঠা সংখ্যাই ব্যবহার করা হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা অবশ্য শীর্ষচরণের সঙ্গেও ডান দিকে অথবা বাম দিকে ব্যবহার করা যায়।

পাদটীকা (Footnote) : গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রায়শ পাদটীকা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তথ্যসূত্র বা তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পাদটীকা ব্যবহার করা হয়। পাদটীকা সাধারণত সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচেই দেওয়া হয়। কখনও একটি প্রবন্ধের শেষে বা কখনও বইয়ের একেবারে শেষেও পাদটীকা দেওয়া হয়।

পৃষ্ঠার মাপ নির্ধারণ (Page Setup) : সম্পাদনার কাজ শেষ করার পর মুদ্রণে নেওয়ার আগে চূড়ান্তভাবে পৃষ্ঠার মাপ নির্ধারণ করে নেওয়া প্রয়োজন হয়। লেখার পাশাপাশি মাপ কতটুকু হবে, কোন দিকে কতটুকু মার্জিন রাখতে হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হয় পেজ সেটআপ (Page Setup) ডায়লগ বক্সে বিভিন্ন ঘর পূরণ করে।

ার্ পস্তা পা থ খা পা প াঝখা ঁা া াগা ইউ টা া া াগ

নিচের মার্জিন (Bottom) ঘরে ১ ইঞ্চি, বাম দিকের মার্জিন (Left) ঘরে ১.২৫ ইঞ্চি এবং ডান দিকের মার্জিন (Right) ঘরে ১.২৫ ইঞ্চি টাইপ করা হলে বা নির্ধারণ করা হলে কাগজের উপর মুদ্রণের এলাকা দাঁড়াবে উপর থেকে নিচের দিকে ৯ ইঞ্চি এবং পাশাপাশি ৬ ইঞ্চি। কারণ, কাগজের দু'পাশ থেকে ১.২৫+১.২৫=২.৫০ ইঞ্চি জায়গা বাদ যাবে এবং উপর-নিচ থেকে ১+১=২ ইঞ্চি জায়গা বাদ যাবে।

সারমর্ম

আগের দিনের মানুষ কাগজের লেখার জন্য পাখির পালক, বাঁশের কঞ্চি, গাছের ফুলের রং ইত্যাদি ব্যবহার করত। এরপর এক সময়ে টাইপরাইটার ব্যবহার শুরু হয়। প্রথমে টাইপরাইটার ছিল মানুষের হাতে চালিত। পরে বিদ্যুৎ চালিত হয়। এক সময় টাইপরাইটারের বদলে স্মৃতি ও একাধিক ফন্ট ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে আর একটি যন্ত্র তৈরি হয়। এ যন্ত্রটিকে বলা হত ওয়ার্ড প্রসেসর। লেখালেখির কাজের জন্য পার্সোনাল কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয় সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে। তখন থেকেই কম্পিউটারের সাহায্যে লেখালেখির কাজ বা ওয়ার্ড প্রসের্সিংয়ের (Word Processing) চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। একটি ভাষার বর্ণমালা ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করা ও সে সব শব্দাবলি মনের মতো করে সাজিয়ে নেওয়াই হচ্ছে শব্দ প্রক্রিয়াকরণ বা ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের আসল কাজ। আজ থেকে পনেরো-বিশ বছর আগেও কিন্তু এ সুযোগ ছিল না। ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসরের আবিষ্কার কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দেয়।

এ্যাপল কোম্পানির মেকিনটোশ কম্পিউটার তৈরির আগে লেখালেখির কাজের জন্য কম্পিউটারে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করা যেত। মেকিনটোশ কম্পিউটার এই অসুবিধা দূর করে দেয়। আমাদের দেশেও মেকিনটোশ কম্পিউটারের মাধ্যমেই কম্পিউটারে বাংলায় কম্পোজ বা বাংলা লেখালেখির কাজ শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে মোস্তাফা জব্বার (এ বইয়ের লেখক) প্রথম কম্পিউটারে বাংলায় কম্পোজ করা তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা আনন্দপত্র প্রকাশ করেন। এটিই ছিল বাংলাদেশে কম্পিউটারে কম্পোজ করা প্রথম বাংলা পত্রিকার প্রকাশনা। এখন সব রকমের পত্র-পত্রিকাই কম্পিউটারে কম্পোজ করে প্রকাশ করা হয়।

কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ করতে হয় টাইপরাইটারের মতো কী-বোর্ড ব্যবহার করে। কিন্তু যারা বাংলায় কাজ করেন, তাদের টাইপের কাজ শিখে নিতে হয়। ইংরেজি বর্ণের বোতামগুলোতেই বাংলা বর্ণ থাকে। কম্পিউটারের কী-বোর্ডে অনেকগুলো বাড়তি বোতাম থাকে। এই বাড়তি বোতামগুলো ব্যবহার করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন রকম নির্দেশ দেওয়া যায়। পার্সোনাল কম্পিউটারের কী-বোর্ডে উপরের দিকে এক সারিতে ১২টি বোতাম আছে (F_1-F_{12}) এগুলোকে বলা হয় ফাংশন কী। কম্পিউটারে লেখালেখির কাজে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির অক্ষর ব্যবহার করা যায়, এক অংশের লেখা কপি করে অন্য জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যায়, লেখা মুছে ফেলা যায়, লেখাকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যায়।

প্রকাশনা কর্মের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ করাকেই ডেস্কটপ পাবলিশিং বলা হয়। পার্সোনাল কম্পিউটারে ইংরেজি অথবা বাংলায় কম্পোজ করে পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র ইত্যাদি প্রকাশনার প্রক্রিয়া ডেস্কটপ পাবলিশিং পদ্ধতি নির্ভর। ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ের জন্য আগে শুধু মেকিনটোশ পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার করা হত। এখন আইবিএম পার্সোনাল কম্পিউটারের উইন্ডোজ পরিবেশেও ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ের কাজ করা হচ্ছে। তবে, ছবি ও নিখুঁত রঙের কাজ সংবলিত ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ে কাজের জন্য এখন পর্যন্ত মেকিনটোশ পার্সোনাল কম্পিউটরই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে Word Processing প্রোগ্রামে বানান সংশোধনের কাজকে বলে–

ক. প্রুফ রিডিং   খ. ডিবাগিং
গ. এনকোডিং   ঘ. এডিটিং

[২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের জন্য]

শিক্ষার্থীদেরকে - MS Word-এ Menu ব্যবহার করে একটি টেবিল তৈরি করতে বলা হল–

২. তারা টেবিলটি তৈরি করার জন্য যে Command অনুসরণ করবে–

i. Table → Insert → Table → Enter
ii. Table → Insert → Tools → Enter
iii. Insert → Table → Tools → Enter

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i.   খ. i ও ii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৩. টেবিলের মাঝে ৪টি ঘর একীভূত করতে কোন কমান্ড ব্যবহার করতে হবে?

ক. Delete   খ. Marge
গ. Delete Table   ঘ. Shift + Delete

৪. Row-এর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কোন Key ব্যবহার করতে হবে?

ক. Shift   খ. Tab
গ. Ctrl + Shift   ঘ. Ctrl + Enter

সৃজনশীল প্রশ্ন

আব্দুস সাত্তার সাহেব একটি বীমা প্রতিষ্ঠানের করণিক। অফিসের বিভিন্ন চিঠিপত্র ও অন্যান্য লেখালেখির কাজ তিনি এখনও টাইপ রাইটারে করে থাকেন। হঠাৎ একদিন একটি চিঠি দ্রুত প্রস্তুত করে দেওয়ার কারণে চিঠিটিতে কয়েকটি বানান ভুল এবং শব্দ বাদ পড়ে যায়। এতে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রাগান্বিত হন। সাত্তার সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে বিনয়ের সাথে একটি কম্পিউটার ক্রয় করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কম্পিউটারের মাধ্যমে লেখালেখির কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করা সহজ।

ক. কম্পিউটারে চিঠিপত্র লেখার কাজে সাধারণত কোন প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়?
খ. কম্পিউটারে কোনো কিছু লেখার প্রধান একটি সুবিধা বর্ণনা কর।
গ. আব্দুস সাত্তাার সাহেব কীভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে বানান সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় শব্দগুলো সংযোজন করতে পারেন তার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
ঘ. নির্ভুল এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিঠিপত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্প্রেডশিট এ্যানালাইসিস

(মাইক্রোসফট এক্সেল ২০০৭)

স্প্রেডশিট পরিচিতি

স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে হিসেব-নিকেশের কাজ করা হয়। এক্সেল একটি জনপ্রিয় স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম। স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে খুব সহজে এবং নির্ভুলভাবে সূক্ষ্ম ও জটিল হিসেব-নিকেশের কাজ করা যায়। স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে হিসেব-নিকেশের কাজ করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ফর্মুলা ব্যবহার করা হয়।

ধরা যাক, অনেকগুলো খাতে আয়-ব্যয়, মুনাফা ইত্যাদির বড় একটি হিসেবের কাজ করতে হবে। এজন্য হয়তো অনেকগুলো সংখ্যার যোগফল থেকে অন্য কয়েকটি সংখ্যার যোগফল বিয়োগ করতে হবে এবং এই বিয়োগ ফলের একটি শতকরা হার বের করে অন্য আরও কিছু সংখ্যার যোগফলের সঙ্গে যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। এ রকম একটি হিসেবের কাজ খাতা-কলমে করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এ ছাড়া ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা তো থাকেই। আবার একটি সংখ্যার পরিবর্তন করতে হলে ঐ সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল হিসেবই পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু, এক্সেলের সাহায্যে নির্ভুলভাবে এবং স্বল্পতম সময়ে এ ধরনের হিসেব-নিকেশের কাজ করা যায়। যেহেতু ফর্মুলা ব্যবহার করে হিসেব করার ছক সাজানো হয়, সেহেতু শুধু ভুল সংখ্যাটি শুদ্ধ করে টাইপ করে দিলে সম্পূর্ণ হিসেব আপনাআপনি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং নির্ভুল ফল পাওয়া যায়।

স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে বাজার প্রবণতার বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। চার-পাঁচ বছরের বাজার প্রবণতা বিশ্লেষণ করে আগামী দুই-তিন বছরের বাজার কী রকম হতে পারে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

এ ছাড়া, স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার জরিপমূলক কাজের ফল চার্ট বা গ্রাফ আকারে উপস্থাপন করা যায়। যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার এবং এর মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত ইত্যাদি বিষয় চার্ট বা গ্রাফ আকারে উপস্থাপন করলে একজন সাধারণ মানুষও সহজভাবে বুঝতে পারে।

ওয়ার্কশিট পরিচিতি

একটি স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম খোলার পর যে পর্দাটি পাওয়া যাবে সেই পর্দাটিকে বলা হয় ওয়ার্কশিট। একই রকমভাবে এক্সেল প্রোগ্রাম খোলার পর একটি শূন্য ডকুমেন্ট পাওয়া যাবে। এ শূন্য ডকুমেন্টে অসংখ্য ঘর থাকবে। ঘরগুলো পাশাপাশি সারিতে এবং উপর-নিচে কলামে সজ্জিত থাকবে। হিসেবের এই শূন্য ডকুমেন্ট বা শিটটি হচ্ছে এক্সেল স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের ওয়ার্কশিট (Worksheet)।
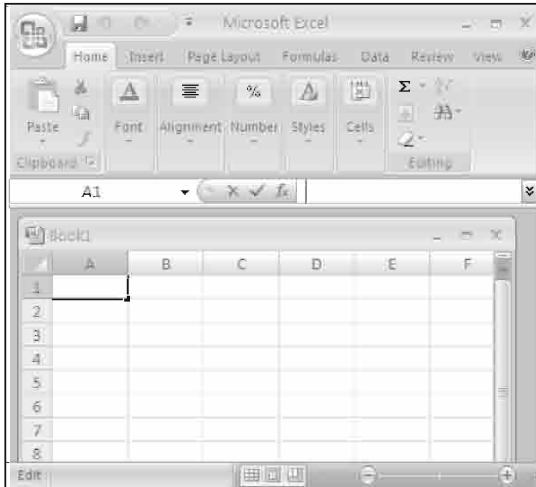
ওয়ার্কশিটের প্রতিটি আয়তকার অংশকে একটি করে ঘর বা সেল (Cell) বলা হয়। আর, উপর থেকে নিচের দিকে চলে আসা ঘরের সমষ্টিকে বলা হয় কলাম (Column)। প্রত্যেকটি কলামকে একটি করে ইংরেজি বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন– কলাম A, কলাম B, কলাম C ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। আবার, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পাশাপাশি চলে যাওয়া ঘরের সমষ্টিকে বলা হয় সারি (Row)। প্রত্যেকটি সারিকে ইংরেজি ১ ২ ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন– সারি ১ (Row 1), সারি ২ (Row 2), সারি ৩ (Row 3) ইত্যাদি। কলাম এবং সারির সংযোগ স্থানে অবস্থিত ঘরটিকে

ঐ ঘরের অবস্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন– C কলামের ১২ নম্বর সারির সংযোগ স্থানে অবস্থিত ঘরটি হচ্ছে C12, E কলামের ৯ নম্বর সারির সংযোগ স্থানে অবস্থিত ঘরটি হচ্ছে E9 ইত্যাদি। কোনো ঘরে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে ঐ ঘরটি সক্রিয় হয় (Active Cell)। সক্রিয় ঘর (Active Cell)-এর আয়তাকার অংশ মোটা রেখাসম্পন্ন হয়। পর্দার উপরের দিকে ফর্মুলা বার (Formula Bar)-এ সক্রিয় ঘরের বিষয়বস্তু প্রদর্শিত হয়।
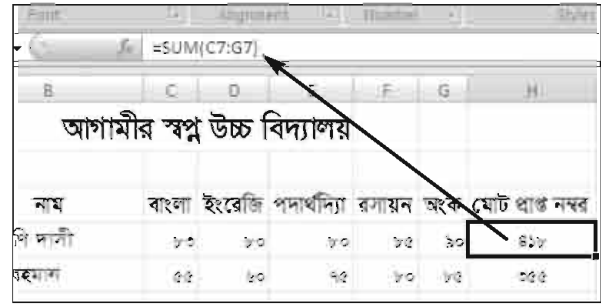
ব্যবহারিক অংশে এ সব পরিচিতি আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই স্প্রেডশিটের কাজ করা যায়। কোনো ঘর সিলেক্ট করে টাইপ করার পর কী-বোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দিলে টাইপ করা বিষয় ঐ ঘরে সন্নিবেশিত হয়ে যায়। টাইপ করার সময় ফর্মুলা বার-এ লেখাগুলো উঠতে থাকে। বাংলার ক্ষেত্রে অর্থহীন কিছু ইংরেজি বর্ণ দেখা যায়।

এক্সেল ২০০৭-এ কলাম রয়েছে ১৬,৩৮৪টি, সারি রয়েছে ১,০৪৮,৫৭৬টি এবং মোট সেল রয়েছে ১৭১৭,৯৮,৬৯,১৮৪টি।

ফর্মুলা ব্যবহার

ফর্মুলা হচ্ছে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্দেশ প্রদান করা। সরাসরি নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে একবারে দু' একটি কাজ করা যায়। কিন্তু, একটি ফর্মুলায় একবারে একাধিক নির্দেশ প্রদান করা যায়। ফর্মুলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে শর্তযুক্ত নির্দেশ প্রদানের সুযোগ। যেমন– এক্সেল প্রোগ্রামের সাহায্যে ফর্মুলা ব্যবহার করে অফিস-আদালত, শিল্প-করখানা এবং বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতনের হিসেব খুব সহজে এবং নির্ভুলভাবে তৈরি করা যায়। এতে নির্দিষ্ট ঘরসমূহে একবার ফর্মুলা বসিয়ে দেওয়ার পর শুধু মূল বেতনের অঙ্ক টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য হিসেব মুহূর্তের মধ্যে আপনাআপনিই সম্পন্ন হয়ে যায়।

ধরা যাক, মূল বেতনের সঙ্গে বাড়ি ভাড়ার সম্পর্ক রয়েছে। মূল বেতন ১০,০০০ টাকা হলে বাড়ি ভাড়া হবে মূল বেতনের ৫০%। মূল বেতন ১০,০০০ টাকার কম হলে বাড়ি ভাড়া হবে ৭৫%। এরূপ শর্তযুক্ত বাড়ি ভাড়ার হিসেবের জন্য বাড়ি ভাড়ার কলামে শর্তযুক্ত ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে। এরপর মূল বেতনের কলামে মূল বেতনের অঙ্ক বসিয়ে দিলে আপনাআপনি বাড়ি ভাড়ার কলামে বাড়ি ভাড়ার সঠিক পরিমাণ বসে যাবে। মূল বেতন টাইপ করতে ভুল হলে বাড়ি ভাড়ার পরিমাণও কম-বেশি হবে। তবে, ফর্মুলা ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে ভুল করে টাইপ করা মূল বেতন সঠিকভাবে টাইপ করে দিলে বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ আপনাআপনি শুদ্ধ হয়ে যাবে।

ওয়ার্কশিট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা

একটি ওয়ার্কশিট তৈরি করার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে নিতে হয়। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির মাসিক মুনাফার হিসেব রাখার জন্য একটি ওয়ার্কশিট তৈরি করা হয়েছে। এতে তার আয়ের বিভিন্ন উৎস এবং ব্যয়ের বিভিন্ন খাত রয়েছে। মোট আয়ের সংখ্যা থেকে মোট ব্যয়ের সংখ্যা বিয়োগ করলে মোট মুনাফা পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে মোট আয়, মোট ব্যয় এবং মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বিয়োগ করার জন্য ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে। ফর্মুলাটি সঠিকভাবে টাইপ করা হয়েছে কি-না, পরীক্ষা করে দেখার জন্য ছোট আকারের সংখ্যা ব্যবহার করে নিশ্চিত হতে হবে। ছোট আকারের সংখ্যা ব্যবহার করে সঠিক ফল পাওয়া গেলে বড় আকারের সংখ্যা ব্যবহার করেও সঠিক ফল পাওয়া যাবে। সংখ্যাগুলো ছোট হওয়ায় মুখে মুখে হিসাব মিলিয়ে দেখা যাবে পরিবর্তনগুলো সঠিক হয়েছে কি-না। অর্থাৎ, এতে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না যে সংখ্যা যত বড়ই হোক এবং ওয়ার্কশিট যত দীর্ঘই হোক হিসাবের কাজটি নির্ভুলভাবেই সম্পন্ন হবে।

ওয়ার্কশিটের লেখা সম্পাদনা করা

মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতোই এক্সেলের ওয়ার্কশিটের লেখা সম্পাদনার কাজ করা যায়। লেখা সিলেক্ট করে ফরমেট মেনু থেকে সেলস (Cells) কমান্ড সিলেক্ট করলে ফরমেট সেলস নামে একটি মিশ্র ডায়লগ বক্স পাওয়া যায়। এ ডায়লগ বক্সে নাম্বার (Number), এ্যালাইনমেন্ট (Alignment), ফন্ট (Font), বর্ডার (Border), প্যাটার্ন (Pattern) এবং প্রোটেকশন (Protection) ট্যাব রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী এর যে কোনো ট্যাবে ক্লিক করে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পাদনার কাজ করা যায়।

লেখা সম্পাদনার সাহায্যে অক্ষর ছোট-বড় করা যায়, আকৃতি পরিবর্তন করা যায়, লেখার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য রং আরোপ করা যায়, লেখাকে ঘুরিয়ে স্থাপন করা যায়।

কোনো একটি বা একাধিক কলামে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য বা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এক বা একাধিক কলামে ভিন্ন ভিন্ন রং প্রয়োগ করা যায়। বিশেষ প্রয়োজনে সারিতেও রং প্রয়োগ করা যায়। আরও নানা প্রকার সম্পাদনার কাজ সম্পর্কে ব্যবহারিক অংশে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

চার্ট/গ্রাফ

আগেই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকার জরিপমূলক কাজের ফল চার্ট বা গ্রাফ আকারে উপস্থাপন করা যায়। চার্ট বা গ্রাফ (Chart/Graph) দেখে একজন সাধারণ মানুষও উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারেন, সহজভাবে বুঝতে পারেন।
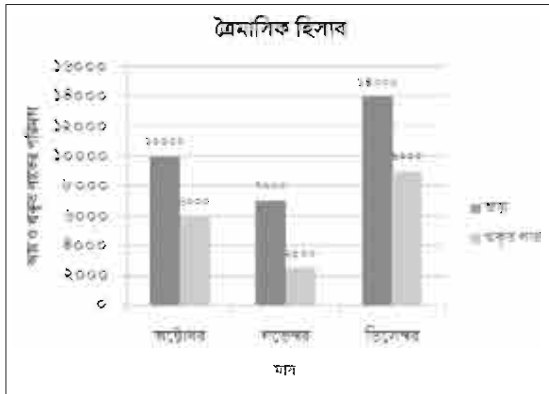
ওয়ার্কশিটে সন্নিবেশিত সংখ্যা, শিরোনাম, মাস/বছর ইত্যাদির ভিত্তিতে চার্ট বা গ্রাফ তৈরি করা হয়। চার্ট বা গ্রাফ বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন– কলাম, বার, লাইন, পাই, এক্সওয়াই (স্ক্যাটার), এরিয়া, ডুনাট, রাডার, সারফেস এবং বাবল। একেক নামের চার্ট বা গ্রাফের আকৃতি একেক রকমের। কিন্তু, ঐ চার্টে ব্যবহার করা তথ্য একই। এর মধ্যে কলাম, লাইন ও পাই চার্ট বেশি ব্যবহৃত হয়। বিষয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ধরনের চার্টও ব্যবহার করা হয়।

চার্টের উপর ক্লিক করলে চার্টটি সিলেক্টেড হয়। এ অবস্থায় চার্ট মেনু থেকে চার্ট টাইপ কমান্ড দিলে অন্যান্য চার্টের নমুনা বিশিষ্ট ডায়লগ বক্স আসে। ডায়লগ বক্সে বিভিন্ন প্রকার চার্টের নমুনা ও নামের তালিকা থাকে। এ তালিকা থেকে যে চার্ট সিলেক্ট করা হবে ডান দিকে সেই চার্টের অন্যান্য ধরন প্রদর্শিত হবে। এভাবে প্রয়োজন এবং পছন্দ অনুযায়ী চার্ট নির্বাচন করে OK বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা চার্টটি পরিবর্তিত রূপ লাভ করবে।

একবার একটি চার্ট তৈরি করার পর ঐ চার্টটি যে কোনো মুহূর্তে প্রয়োজন হলে, দু'একটি কমান্ড ব্যবহার করেই অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়।

গ্রাফ বা চার্টের উপরে-নিচে ও বাঁয়ে বিভিন্ন পরিচিতিমূলক লেখা থাকে। ডানে থাকে লিজেন্ড (Legend)। লিজেন্ড হচ্ছে গ্রাফ বা চার্টের ভেতর উপস্থাপিত বিভিন্ন স্তম্ভের রেখার/অন্যান্য চিহ্নের পরিচিতিমূলক প্রতীকী নমুনা। উপরের, নিচের, বাঁয়ের লেখার উপরে এবং লিজেন্ডের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে লেখাগুলোর বক্স সিলেক্টেড হয়। সিলেক্টেড অবস্থায় টুল বারের ফন্ট ও সাইজ পুল-ডাউন মেনু থেকে ফন্ট ও অক্ষরের আকার পরিবর্তন করা যায়। রিবনের বোল্ড, ইটালিক, আন্ডারলাইন ইত্যাদি টুলের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী লেখা বিন্যস্ত করা যায়।

ওয়ার্কশিট সংরক্ষণ

অন্যান্য এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মতোই, বিশেষ করে ইতোপূর্বে শেখা ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের মতো, একই নিয়মে ফাইল মেনু থেকে সেভ (Save) কমান্ড দিয়ে সেভ এ্যাজ (Save As) ডায়লগ বক্সে ফোল্ডার নির্বাচন ও ফাইলের নাম টাইপ করে ওয়ার্কশিট সংরক্ষণ করতে হবে।

সারমর্ম

কম্পিউটারের হিসেব-নিকেশ করার প্রোগ্রামকে বলা হয় স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম (Spreadsheet Program)। স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে সহজ হিসেব-নিকেশের কাজ থেকে শুরু করে কঠিন এবং জটিল হিসেব-নিকেশের কাজ করা যায়। সাধারণ হিসেব-নিকেশের কাজ থেকে বড় ধরনের হিসেবের কাজও ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে করা যায়। কিন্তু ক্যালকুলেটরের চেয়েও অনেক কম সময়ে স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে হিসেব করা যায়। ক্যালকুলেটরের হিসাব ভুল হয়ে গেলে আবার হয়তো প্রথম থেকে শুরু করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে শুধু ভুলের সংখ্যাটি শুদ্ধ করে দিলে ঐ সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব হিসেব আপনাআপনিই শুদ্ধ হয়ে যায়।

স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে একবার ফলাফল প্রাপ্তির পর যদি কোনো একটি বা অনেকগুলো সংখ্যা পরিবর্তন করা হয় তাহলে ঐ ফলাফল আপনাআপনিই পরিবর্তিত হয়ে নতুন সঠিক হিসাব অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু ক্যালকুলেটরের সাহায্যে এ রকম একটি হিসেবের কাজ নতুনভাবে করতে সময় লাগবে অনেক বেশি। এ ছাড়া কাগজে আবার পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো ঘষে তুলে নতুন সংখ্যাগুলো লিখতে হবে। কিন্তু স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে শুধু পরিবর্তিত সংখ্যাগুলো টাইপ করে দিলেই হবে। সম্পূর্ণ হিসেব আপনাআপনিই পুনর্বিন্যস্ত হয়ে যাবে। স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য বড় ও মিশ্র হিসাবের কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে বাজার প্রবণতার বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। চার-পাঁচ বছরের বাজার প্রবণতা বিশ্লেষণ করে আগামী দু'তিন বছরের বাজার কী রকম হতে পারে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রাফ বা চার্ট। জরিপমূলক কোনো তথ্য বা হিসাব গ্রাফ বা চার্ট আকারে উপস্থাপন করলে তা বিবরণমূলক লেখার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়।

স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের হিসেব-নিকেশের কাজ করা সহজ। প্রোগ্রামটি খোলার পর বা চালু করার পর পর্দায় অসংখ্য ঘর (Cell) বিশিষ্ট একটি হিসেবের ছক আসবে। এ ছকটিকে বলা হয় ওয়ার্কশিট (Worksheet)। কাজের সুবিধার জন্য এ ঘরগুলো সারি কলামে বিন্যস্ত করে নেওয়া হয়। যেমন– উপর থেকে নিচের দিকে বরাবর চলে যাওয়া ঘরগুলো এক সঙ্গে সারি (Row) হিসাবে পরিচিত। আবার প্রত্যেকটি ঘরেও কিন্তু নিজস্ব অবস্থানের একটি পরিচিতি বা ঠিকানা (Address) আছে। অনেক সময় নির্দিষ্ট কাজের জন্য বেশ কয়েকটি ঘর একসঙ্গে সিলেক্ট করে নিতে হয়। তখন সিলেক্ট করা ঐ সম্পূর্ণ এলাকাকে এক সঙ্গে বলা হয় রেঞ্জ (Range)। স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে হিসেব-নিকেশের কাজ করার জন্য বিভিন্নপ্রকার ফর্মুলা ও ফাংশন ব্যবহার করা হয়। যেমন– গাণিতিক ফর্মুলা, লজিক্যাল বা যুক্তিমূলক ফর্মুলা এবং টেক্সট ফর্মুলা ইত্যাদি।

উইন্ডোজ এবং মেকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেমে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল। মাইক্রোসফট কোম্পানি ১৯৮৫ সালে মেকিনটোশ কম্পিউটারের জন্য এক্সেল স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম তৈরি করে এবং ১৯৮৭ সালে আইবিএম পিসি কম্পাটিবল কম্পিউটারের উইন্ডোজ সিস্টেমের জন্য এক্সেল স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম তৈরি করে। এর আগে আইবিএম পার্সোনাল কম্পিউটারের ডস (DOS) অপারেটিং সিস্টেমে বহুল ব্যবহৃত স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম ছিল লোটাস ১-২-৩ (Lotus 1-2-3)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

Spread Sheet-টি দেখ এবং ১ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও ।

	A	B	C	D	E	F
1	Name	Bangla	English	Computer	Economics	Total
2	Sabita Rani	85	45	84	65	
3	Farzana Akter	69	56	82	75	
4	Shamim Ahmed	85	69	72	45	
5	Probal Barua	74	57	80	90	
6						

১. ওয়ার্কশিটটি থেকে চারটি বিষয়ের সমষ্টি নির্ণয়ের জন্য নিচের কোন ফর্মুলাটি সঠিক?

ক. = Sum (B2 : B5) খ. = Sum (B2 : E2)

গ. = Sum (B2 + B5) ঘ. = Sum (B2 + E5)

২. ওয়ার্কশিটটি দিয়ে যে কাজ করা সম্ভব–

i. লেখালেখির কাজ

ii. হিসেবনিকেশের কাজ

iii. গ্রাফ চিত্রের কাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. ওয়ার্কশিটটি ব্যবহার করে গ্রাফ তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমে কী করতে হয়?

ক. উইজার্ড চালু করে নিতে হয় খ. গ্রাফের ধরন ঠিক করে নিতে হয়

গ. ডাটা রেঞ্জ নির্বাচন করতে হয় ঘ. গ্রাফের শিরোনাম নির্ধারণ করতে হয়

৪. নিচের কোনটি ব্যবহার করে সহজে গ্রাফ বা চার্ট তৈরি করা যায়–

ক. টেবিল মেনু খ. চার্ট উইজার্ড

গ. চার্ট টাইটেল ঘ. চার্ট মেনু

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক্রমিক	নাম	মূল বেতন	চিকিৎসা ভাতা	মোট বেতন ভাতা
১	আমিনা	৭,০০০.০০	৫০০.০০	
২	প্রেমা	৬,৮০০.০০	৫০০.০০	
৩	সাহাদত	৮,০০০.০০	৫০০.০০	
৪	অপর্ণা	৫,১০০.০০	৫০০.০০	
৫	নাসরিন	৭,২০০.০০	৫০০.০০	
৬	সজল	৯,৫০০.০০	৫০০.০০	

এই Worksheet-টি Salary নামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা ৪০%।

ক. Worksheet বলতে কী বুঝ?

খ. স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

গ. মূল বেতন ও চিকিৎসা ভাতা-এর মাঝে বাড়িভাড়া নামে কীভাবে কলাম তৈরি করে মোট বেতন ভাতা নির্ধারণ করবে– বর্ণনা কর।

ঘ. স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম (Spread Sheet Program) ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে বেতন ভাতা নির্ধারণ করা যায়– বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়
ডাটাবেজ
(মাইক্রোসফট এক্সেস ২০০৭)

ডাটাবেজ

কম্পিউটারে তথ্য বা ডাটাকে ফাইল আকারে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত ফাইলকেই ডাটাবেজ (Database) বলা হয়। একটি ডাটাবেজ মূলত কলাম (Column) এবং সারি (Row) সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কলামের একটি করে হেডিং বা শিরোনাম থাকে। এই হেডিং বা শিরোনাম থেকে বোঝা যায় সেই কলামে কী ধরনের তথ্য বা ডাটা আছে। হেডিংগুলো ফিল্ড (Field) নামে পরিচিত। আর পাশাপাশি কয়েকটি কলামের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি সারি বা রো (Row)। প্রতিটি রো বা সারিকে বলা হয় রেকর্ড (Record)। নিচের ডাটাবেজটি লক্ষ করা যেতে পারে–

ক্রমিক	নাম	বয়স	পুরুষ/মহিলা
১	আব্দুল খালেক	২২	M
২	আব্দুল মালেক	৪০	M
৩	হামিদা খাতুন	৩৫	F

এখানে ক্রমিক, নাম, বয়স, পুরুষ/মহিলা হচ্ছে হেডিং বা শিরোনাম। এই শিরোনাম হচ্ছে ডাটাবেজের ফিল্ড (Field)। আর, ১, আব্দুল খালেক, ২২ এবং M এভাবে পাশাপাশি চলে যাওয়া সারিটি হচ্ছে রেকর্ড। উপরে প্রদর্শিত ডাটাবেজে ৪টি ফিল্ড এবং ৩টি রেকর্ড রয়েছে। সবগুলো রেকর্ড মিলে হচ্ছে একটি ডাটাবেজ (Database)।

ডাটাবেজকে বাংলায় তথ্য ভাণ্ডার বলা যায়। একটি তথ্য ভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করে রাখা তথ্য যে কোনো সময় সম্পাদনা করা যায়। তথ্য ভাণ্ডারে নতুন তথ্য যোগ করা যায়, অপ্রয়োজনীয় তথ্য ফেলে দেওয়া যায়। সংরক্ষিত তথ্য ভাণ্ডার থেকে যে কোনো সময় যে কোনো তথ্য জানা যায়, রিপোর্ট তৈরি করা যায়, মুদ্রিত আকারে সরবরাহ করা যায়। যেমন– একটি ডাটাবেজের সাহায্যে কোনো এলাকার মানুষের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এরূপ একটি তথ্য ভাণ্ডার থেকে ঐ এলাকার মোট জনসংখ্যার মধ্যে কতজন নারী, কতজন পুরুষ, ১৮ বছর বয়সের কম যুব শ্রেণীর সংখ্যা কত– এ সব তথ্য যে কোনো সময় এবং দু'এক মিনিটের মধ্যেই বের করা সম্ভব।

মাইক্রোসফট এক্সেস

ডাটাবেজের কাজ করার জন্য যে সব প্রোগ্রাম রয়েছে তার মধ্যে মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের মাইক্রোসফট এক্সেস (Microsoft Access) একটি জনপ্রিয় সফটওয়্যার। এক্সেস (Access) হচ্ছে উইন্ডোজ ভিত্তিক একটি শক্তিশালী রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RDBMS=Relational Database Management System)। এক্সেসের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ ডাটা বা তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং প্রক্রিয়াকরণ করা যায়।

এক্সেস ডাটাবেজের বিভিন্ন অবজেক্ট

এক্সেস প্রোগ্রামে কাজ করার জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় সে সকল উপকরণকে অবজেক্ট বলা হয়। যেমন–টেবিল, রেকর্ড, ফিল্ড, ফরমস, রিপোর্ট ইত্যাদি।

টেবিল

এক্সেস ডাটাবেজের প্রধান অবজেক্ট হচ্ছে টেবিল (Table)। টেবিল হচ্ছে ডাটাবেজের প্রাণ। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রাথমিকভাবে টেবিল হিসেবে ডাটাবেজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটি টেবিলে অন্তর্ভুক্ত ডাটা যে কোনো সময় সংশোধন করা যায়। একই টেবিলে নতুন তথ্য সংযোজন করা যায়। যখন যে তথ্য প্রয়োজন হয় তখন মূল টেবিল থেকে তথ্য আহরণ করে বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয় বা সরবরাহ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য একাধিক টেবিল তৈরি করা যায়। অনেক রকম বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে একাধিক টেবিল তৈরি করতে হয় এবং একটি টেবিলের সঙ্গে অন্য টেবিলের সংযোগ বা সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। এ পদ্ধতিকে বলা হয় রিলেশনাল ডাটাবেজ।

কোনো এলাকার মানুষের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরি করলে সেটি বড় আকারের ডাটাবেজ হবে। আবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী সমন্বয়েও ডাটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে। এ ধরনের একটি ডাটাবেজ সহজেই তৈরি করা যেতে পারে।

ফিল্ড ও রেকর্ড

কোনো একটি ডাটাবেজের ক্ষুদ্রতম একক তথ্য হচ্ছে ফিল্ড এবং একাধিক ফিল্ডের সমন্বয়ে তৈরি হয় রেকর্ড। উপরের টেবিলে ১, আব্দুল খালেক, ২২ এবং M ফিল্ড মিলে একটি রেকর্ড তৈরি হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে অনেকগুলো ফিল্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি রেকর্ড। একটি টেবিলে যতগুলো সারি থাকবে ততগুলো রেকর্ড হবে।

কোনো রেকর্ডের ক্ষুদ্রতম অংশই হচ্ছে ফিল্ড (Field)। টেবিলের প্রতিটি কলামের হেডিংগুলো হচ্ছে একেকটি ফিল্ডের শিরোনাম। উপরের টেবিলে ক্রমিক, নাম, বয়স, পুরুষ এবং মহিলা হচ্ছে একেকটি ফিল্ডের শিরোনাম।

ডাটা

একটি টেবিলের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার তথ্যই ডাটা (Data) হিসেবে পরিগণিত। মানুষের বা যে কোনো জিনিসের নাম যেমন ডাটা, বয়স বা টাকা-পয়সার হিসেব করার জন্য ব্যবহৃত সংখ্যাও তেমনি ডাটা। অর্থাৎ, ডাটা বর্ণ ভিত্তিক এবং সংখ্যাসূচক উভয় প্রকার হতে পারে। এ ছাড়াও আরও ডাটা হতে পারে। যেমন–

বর্ণ ভিত্তিক বা টেক্সট (Text) ডাটা : বর্ণ ভিত্তিক বা টেক্সট ডাটা টাইপে সর্বোচ্চ ২৫৫ বর্ণ ব্যবহার করা যায়। টেক্সট ফিল্ডে ডট, কমা, কোলন, সেমিকোলন ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। টেক্সট ফিল্ডের ডাটার সাহায্যে কোনো গাণিতিক হিসেব-নিকেশের কাজ, যেমন– যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করা যায় না।

সংখ্যাসূচক বা নম্বর (Number) ডাটা : সংখ্যাসূচক ডাটার সাহায্যে গাণিতিক হিসেব-নিকেশের কাজ, যেমন– যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ইত্যাদি কাজ করা হয়। প্রয়োজন হলে সে সমস্ত ডাটার ধরন Number নির্বাচন করতে হবে।

মুদ্রা বা কারেন্সি (Currency) ডাটা : টাকা-পয়সা সম্পর্কিত ডাটার জন্য মুদ্রা বা কারেন্সি (Currency) ডাটা টাইপ ব্যবহার করতে হয়। এ ফিল্ডে ব্যবহৃত সংখ্যার সাহায্যে গাণিতিক কাজও করা যায়। আবার, সংখ্যাসূচক বা নম্বর ডাটা টাইপ ঘরের সংখ্যা দিয়েও টাকা-পয়সার হিসেবের কাজ করা যায়।

দিন/তারিখ বা ডেট/টাইম (Date/Time) ডাটা : তারিখ ও সময় সম্পর্কিত ডাটার জন্য দিন/তারিখ বা ডেট/টাইম (Date/Time) ডাটা টাইপ ব্যবহার করতে হয়। ডেট/টাইম ফিল্ডে তারিখ অথবা সময় উভয়ই ব্যবহার করা যায়।

মেমো (Memo) ডাটা : রেকর্ডে সন্নিবেশিত কোনো ডাটা সম্পর্কে কোনো প্রকার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য মেমো (Memo) ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্যও মেমো ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

অটো নাম্বার (Auto Number) ডাটা : প্রতিটি রেকর্ডের পর্যায়ক্রমিক নম্বর ব্যবহার করা হয়। এ জন্য কোনো ফিল্ডে Auto Number সিলেক্ট করলে রেকর্ডসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্যায়ক্রমিক নম্বরযুক্ত হয়। তবে, এ প্রক্রিয়ায় নম্বর যুক্ত করা হলে পরবর্তীতে আর পরিবর্তন করা যায় না।

হ্যাঁ/না (Yes/No) : এমন কিছু ডাটা আছে যেগুলো এন্ট্রির ক্ষেত্রে Yes/No ব্যবহার করলেই চলে। এ ধরনের ডাটাকে Logical ডাটা বলে। Logical ডাটা এন্ট্রির সময় হ্যাঁ কে Y বা T দিয়ে এবং না কে N বা F দিয়ে নির্দেশ করা হয়। যেমন– কোনো ছাত্রের ফিস পরিশোধ করা আছে কি-না বুঝানোর জন্য Yes/No ডাটা টাইপ ব্যবহার করা যায়।

ফিল্ড প্রোপার্টি

ডাটাবেজের কাজ শুরু করার জন্য ফিল্ড তৈরির পর্যায়ে প্রতিটি ফিল্ডের জন্য কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। এ বিষয়গুলো ফিল্ড প্রোপার্টি (Fields Property) নামে অভিহিত। নির্দিষ্ট করে দেওয়া ফিল্ড প্রোপার্টির ভিত্তিতে ঐ ফিল্ডের ডাটাগুলো ব্যবহৃত হয়। টেক্সট ফিল্ডের প্রোপার্টিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফিল্ড সাইজ (Field Size) প্রোপার্টি।

ফিল্ড সাইজ (Field Size) : টেক্সট ফিল্ডের ধারণ ক্ষমতা কী পরিমাণ হবে তা এ ফিল্ড সাইজ প্রোপার্টির মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিতে হয়। প্রত্যেক ফিল্ডের নিজস্ব বা ডিফল্ট ধারণ ক্ষমতা থাকে। ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রমিত বা ডিফল্ট মান পরিবর্তন করে নিতে পারেন। যেমন– টেক্সট ফিল্ডের সাইজ প্রোপার্টির নিজস্ব বা ডিফল্ট ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে ৫০টি বর্ণ। ব্যবহারকারী প্রয়োজন মনে করলে ২৫৫টি পর্যন্ত বর্ণ ব্যবহার করতে পারেন। ফিল্ড সাইজ প্রোপার্টির ধারণ ক্ষমতা ১৫ নির্ধারণ করা হলে ১৫ বর্ণের পর আর কোনো বাড়তি বর্ণ দেখা যাবে না।

ফরমেট (Format) : কোনো ফিল্ডের তথ্য কীভাবে প্রদর্শিত হবে তা নির্ধারণ করে নিতে হয় ফরমেট প্রোপার্টির সাহায্যে। দিন-তারিখের ক্ষেত্রে ফরমেট ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে জেনারেল (General) সিলেক্ট করলে দিন/তারিখ প্রদর্শিত হবে এভাবে– ১/৭/২০০৭। লং ডেট (Long Date) সিলেক্ট করলে দিন/তারিখ প্রদর্শিত হবে এভাবে– জুলাই ১, ২০০৭। মিডিয়াম ডেট (Midium Date) সিলেক্ট করলে দিন/তারিখ প্রদর্শিত হবে এভাবে– ১-জুলাই-০৭।

একই নিয়মে অন্যান্য ফিল্ডের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোপার্টি নির্ধারণ করে নিতে হয়। তবে, কাজ শেখার প্রাথমিক অবস্থায় ডিফল্ট মান অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

তথ্য টেবিল সজ্জিতকরণ

একটি তথ্য টেবিলের রেকর্ডগুলো আরোহী (Ascending) এবং অবরোহী (Descending) উভয় বিন্যাসে বিন্যস্ত করা যায়। আরোহী পদ্ধতিতে ছোট থেকে বড় ক্রমের ভিত্তিতে এবং অবরোহী পদ্ধতিতে বড় থেকে ছোট ক্রমের ভিত্তিতে টেবিল বিন্যস্ত হয়। ক্রমিক নম্বর, বয়স, যে কোনো সংখ্যার ফিল্ড, দিন-তারিখ, নামের প্রথম বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে তথ্য টেবিলের রেকর্ডগুলো আরোহী এবং অবরোহী বিন্যাসে বিন্যস্ত করা যায়।

তথ্য অনুসন্ধান/আহরণ

সংগ্রহ করা বা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ডাটাবেজের টেবিল তৈরির কাজ সম্পন্ন করার পর ঐ ডাটাবেজ টেবিল থেকে কয়েকটি পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান (Query)/আহরণ করা যায়। যেমন– একটি এলাকার জনগোষ্ঠীর ডাটাবেজ থেকে যে কোনো একটি গ্রামের মানুষের তথ্য ভিন্নভাবে দেখা যেতে পারে। সম্পূর্ণ ডাটাবেজের শুধু মহিলাদের তথ্য দেখা যেতে পারে, নির্দিষ্ট বয়সের জনসংখ্যার তথ্য দেখা যেতে পারে। এ ছাড়াও, অন্যান্য শর্তের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। অনুসন্ধান ও প্রদর্শন ছাড়াও তথ্যগুলো বিভিন্ন আকারে সরবরাহ করা যেতে পারে। টেবিল আকারে তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। রিপোর্ট আকারে তথ্য সরবরাহ করা যায়।

সারমর্ম

কম্পিউটারের কাজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ডাটাবেজের কাজ। ডাটাবেজের কাজ বলতে মূলত তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ বোঝায়। ডাটা বা তথ্যকে নানাভাবে উপস্থাপন করার জন্য ডাটাবেজ ব্যবহার করা হয়। এক সময় ডাটাবেজ তৈরি করার জন্য অনেক জটিল প্রোগ্রামিংয়ের প্রয়োজন হত। আজকাল তা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। মাইক্রোসফট এক্সেস একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ডাটাবেজ সফটওয়্যার। মাইক্রোসফট এক্সেসের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ তথ্য নিয়ে কাজ করা যায়। ডাটাবেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এ জন্য ডাটাবেজকে তথ্য ভাণ্ডারও বলা হয়। সংরক্ষণ করে রাখা তথ্য প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময় ব্যবহার করা যায়।

ডাটাবেজে সংরক্ষিত তথ্য ফর্মস, রিপোর্ট, টেবিল ইত্যাদি আকারে উপস্থাপন করা যায়। ডাটাবেজে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নির্দিষ্ট তথ্য অনুসন্ধান করে উপস্থাপন করা যায়। কুয়েরি পদ্ধতিতে ডাটাবেজের তথ্য অনুসন্ধানের কাজ করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

তোমার বিদ্যালয়ের জন্য একটি Student Information System সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। সফটওয়্যারের নমুনাটি হবে নিম্নরূপ :

ID	Name	Class	Address	City	Grade
001	Tanin	IX	A	Dhaka	A
021	Jarin	IX	B	Comilla	A+
033	Jisan	IX	C	Rangpur	A+
121	Nisha	X	D	Sylhet	A+
002	Samrat	X	E	Chittagong	A+

এখানে ID কে প্রাইমারি কী (Primary Key) ধরা হয়েছে।

১. এখানে Address হলো–

ক. Byte   খ. Field

গ. Record   ঘ. Information

২. নবম শ্রেণীর A+ পাওয়া শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে ব্যবহার করতে হবে–

ক. Query   খ. Select

গ. Table   ঘ. Memo

৩. মনে কর তোমার বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীর একটি ডাটাবেজ ফাইল আছে। উক্ত ফাইল থেকে সকল ছাত্রীর নাম পৃথক করতে হলে তুমি নিচের কোন অপশন বাছাই করবে−

i. নতুন একটি টেবিল তৈরি করে

ii. কুয়েরি তৈরি করে

iii. রিপোর্ট তৈরি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i. খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪. তথ্যের মৌলিক একক কোনটি?

ক. ফিল্ড খ. রেকর্ড

গ. উপাত্ত ঘ. সেল

সৃজনশীল প্রশ্ন

ধরা যাক, সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জন্ম নিবন্ধনের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি ওয়ার্ডে Computer Based অফিস স্থাপন করেছে এবং প্রতিদিন জন্ম নিবন্ধনের তথ্য প্রেরণের জন্য ওয়ার্ড কমিশনারগণকে নির্দেশ দিয়েছে। জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় যে তথ্যগুলো নিতে হবে সেগুলো হলো− জন্ম তারিখ, নারী-পুরুষ, পিতার নাম, মাতার নাম, ধর্ম ও জন্মস্থান।

ক. ডাটাবেজ কী?

খ. উপরোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন ধরনের ডাটাবেজ সুবিধাজনক?

গ. উপরোক্ত তথ্য ফিল্ড নিয়ে ৫ জন শিশুর একটি নমুনা ডাটাবেজ উপস্থাপন কর।

ঘ. উক্ত ডাটাবেজ থেকে সিটি কর্পোরেশনের প্রাপ্ত সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা

আগেই বলা হয়েছে যে, কম্পিউটার হল হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সম্মিলিত রূপ। হার্ডওয়্যার স্পর্শ করা যায়। সফটওয়্যার স্পর্শ করা যায় না। তবে হার্ডওয়্যারের সাহায্যে কম্পিউটারের কাজ করার সময় সফটওয়্যারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম ছাড়া হার্ডওয়্যার প্রাণহীন। অচল। প্রকৃতপক্ষে সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম হল কতকগুলো নির্দেশের সমষ্টি। এ সব নির্দেশ যথাসময়ে পালন করে হার্ডওয়্যার যথাযথ কাজটি করে থাকে।

কম্পিউটার মূলত মানুষের মুখের ভাষা এবং লিখিত ভাষা বোঝে না। কম্পিউটার শুধু বোঝে বিদ্যুৎ আছে কি নেই। বিদ্যুতের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি থেকেই কম্পিউটার সকল প্রকার নির্দেশ বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করে। কম্পিউটারের এই বোধগম্য ভাষাকেই বলা হয় মেশিনের ভাষা বা মেশিন ল্যাংগুয়েজ। মেশিনের ভাষায় বিদ্যুতের অনুপস্থিতিকে ০ এবং উপস্থিতিকে ১ ধরা হয়। কিন্তু ০ এবং ১ দিয়ে লেখা মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটারের জন্য মানুষকে এই কঠিন কাজটি করতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মানুষ কম্পিউটারকে মানুষের ভাষার কাছাকাছি কিছু শব্দ চেনাতে সক্ষম হয়েছিল। এ রকম কৃত্রিমভাবে তৈরি ভাষা দিয়ে প্রণীত নির্দেশাবলি কম্পিউটার বুঝতে পারে। এই ভাষাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষা (Programming language)। কিন্তু প্রোগ্রামিং ভাষা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। প্রোগ্রামিং ভাষায় লিখিত নির্দেশকে কম্পিউটারের যান্ত্রিক ভাষায় পরিণত করার জন্য অনুবাদকের দরকার হয়। এই অনুবাদককে বলা হয় কম্পাইলার কিংবা ইন্টারপ্রেটর।

প্রোগ্রামিং ভাষার শ্রেণী বিভাগ

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

যান্ত্রিক ভাষা (Machine Language)

এ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)

উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language)

উল্লিখিত বিভাগ ছাড়াও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষাসমূহকে প্রজন্ম (Generation) অনুযায়ী ভাগ করা হয়। সাধারণত পূর্ব প্রজন্মের ভাষা থেকে পরবর্তী প্রজন্মের ভাষা অধিকতর শক্তিশালী ও ব্যবহারে সহজ হয়। এই হিসেবে মেশিন ল্যাংগুয়েজকে প্রথম প্রজন্মের ভাষা এবং এ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজকে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে তৃতীয় প্রজন্ম ও চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার যুগ চলছে। কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের যে চিন্তা মানুষের মাথায় রয়েছে তার জন্য ব্যবহৃত হবে পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা।

যান্ত্রিক ভাষা (Machine Language)

যান্ত্রিক ভাষার সহজ অর্থ হচ্ছে যন্ত্রের ভাষা। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটার যন্ত্র যে ভাষাটি বুঝতে পারে সে ভাষাকেই যান্ত্রিক ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আর তা হল বিদ্যুতের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি। এক (১) এবং শূন্য (০) দিয়ে লিখিত ভাষায়ই কম্পিউটার মানুষের দেওয়া নির্দেশ বুঝতে পারে। একজন ব্যবহারকারী কম্পিউটারের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত মনিটরে তার নিজের ভাষাতেই সব ধরনের ফলাফল দেখতে পান। কিন্তু কম্পিউটার কাজের শুরু থেকে ফলাফল প্রদর্শন পর্যন্ত সব কিছুই তার নিজস্ব ভাষা, অর্থাৎ– এক (১) এবং শূন্য (০)-এর সমন্বয়ে বা বাইনারি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু মানুষের পক্ষে বাইনারি পদ্ধতিতে কম্পিউটারকে সকল প্রকার ইনপুট এবং নির্দেশ প্রদান করা অত্যন্ত

কঠিন। বাইনারি পদ্ধতিতে ইনপুট এবং নির্দেশ প্রদান করতে হলে প্রচুর পরিমাণ সংখ্যা টাইপ করতে হয়। মানুষের ব্যবহৃত শব্দে প্রতিটি অক্ষরের জন্য সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা মুখস্থ করে রাখতে হয়। উপরন্তু প্রচুর পরিমাণ সংখ্যা টাইপ করার জন্য অনেক সময় ব্যয় হয় এবং বিষয়টি অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্যও বটে।

এ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)

যান্ত্রিক ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরি ও নির্বাহ করার সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং প্রোগ্রাম তৈরি ও নির্বাহের কাজ আরও সহজ এবং গতিশীল করার জন্য এ্যাসেম্বলি ভাষা উন্নয়ন করা হয়। যেমন কম্পিউটারকে যোগ করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য মেশিনের ভাষায় বা বাইনারি পদ্ধতিতে, ধরা যাক, ১০০০১০১ টাইপ করতে হত। কিন্তু, এ্যাসেম্বলি ভাষায় সরাসরি ADD টাইপ করেই যোগ করার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়। ADD নির্দেশটি কম্পিউটার সঙ্গে সঙ্গে ১০০০১০১ বাইনারি সংকেতে অনুবাদ করে বুঝতে পারে যোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অনুবাদের কাজটি করে এ্যাসেম্বলার (Assembler) নামের একটি সফটওয়্যার। এ্যাসেম্বলারের কাজ হচ্ছে এ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত নির্দেশকে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করা বা বাইনারি সংকেতে রূপান্তরিত করা।

এ্যাসেম্বলি ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা যায়। যান্ত্রিক ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার চেয়ে এ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে অনেক কম সময় লাগে। তবে এ্যাসেম্বলি ভাষায় সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন এ্যাসেম্বলি ভাষা যন্ত্র নির্ভর (Machine Dependent)। কাজেই এ্যাসেম্বলি ভাষা বিভিন্ন কম্পিউটারের জন্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলে এ্যাসেম্বলি ভাষা ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আবার এ্যাসেম্বলি ভাষায় যে ব্যক্তি এক ধরনের কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং করতে পারেন তিনিই যদি অন্য কম্পিউটারের এ্যাসেম্লি ভাষায় প্রোগ্রামের কাজ করতে চান তাহলে ঐ কম্পিউটারের এ্যাসেম্পলি ভাষা নতুন করে আয়ত্ত করতে হয়।

প্রোগ্রামিংয়ের কাজকে সহজতর এবং গতিশীল করার জন্য যান্ত্রিক ভাষার অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং এ্যাসেম্বলি ভাষার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য উচ্চ স্তরের ভাষা উন্নয়ন করা হয়েছে।

উচ্চ স্তরের ভাষা (High Lavel Language)

যান্ত্রিক ভাষা এবং এ্যাসেম্বলি ভাষাকে নিম্নস্তরের ভাষা (Low Lavel Language) হিসেবে অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে, বেসিক (BASIC), সি (C), সি++ (C++), প্যাসকাল (Pascal), ফোরট্রান (Fortran), কোবল (Cobol) ইত্যাদি প্রোগ্রামিংয়ের ভাষাকে উচ্চ স্তরের ভাষা (High Level Language) বলা হয়। এগুলোকে তৃতীয় প্রজন্মের ভাষাও বলা হয়ে থাকে। উচ্চস্তরের ভাষায় মানুষের বোধগম্য শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোনো একটি বিষয় আমরা ইংরেজি ভাষায় যেভাবে এবং যে শব্দ ও বাক্য দিয়ে ব্যক্ত করে থাকি উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিংয়েও প্রায় একইভাবে এবং একই ভাষা ব্যবহার করা হয়। উচ্চস্তরের ভাষাকে যন্ত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য কম্পাইলার ব্যবহার করা হয়। উচ্চ স্তরের ভাষাকে যন্ত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য কম্পাইলার (Compiler) বা ইন্টারপ্রেটার (Interpreter) নামের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। কাজেই, কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার ব্যবহার করে উচ্চস্তরের ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম যে কোনো ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। উচ্চ স্তরের ভাষার উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো হচ্ছে–

১. উচ্চস্তরের ভাষায় মানুষের পরিচিত বা ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করে প্রোগ্রামের কাজ করা যায়। ফলে যান্ত্রিক ভাষা এবং এ্যাসেম্লি ভাষার চেয়ে উচ্চস্তরের ভাষা সহজে শেখা যায়।
২. উচ্চস্তরের ভাষা যেহেতু যন্ত্র নির্ভর (Machine Dependent) নয়, সেহেতু উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম সামান্য পরিবর্তন করে বা কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই যে কোনো কম্পিউটারে চালানো যায়।
৩. উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রামিংয়ের কাজ করতে সময় অনেক কম লাগে।

৪. উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা সহজে শনাক্ত করা যায় এবং দুই একটি বর্ণ/লাইন সংশোধন করেই প্রোগ্রামটিকে শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। পক্ষান্তরে, যান্ত্রিক ভাষায় তৈরি প্রোগ্রামের ভুল শনাক্ত করা যেমন কঠিন, সংশোধন করাও তেমনি কঠিন।

অনুবাদক প্রোগ্রাম

উচ্চস্তরের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য যে প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় সে প্রোগ্রামকে বলা হয় ভাষা প্রক্রিয়াকারী প্রোগ্রাম (Language Processor Program)। উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামের নির্দেশ (Statement), প্রক্রিয়া (Grammar) এবং চিহ্ন (Syntax) ইত্যাদি পরীক্ষা করার পর কোনো প্রকার ভুল না পাওয়া গেলে ভাষা প্রক্রিয়াকারী প্রোগ্রাম উচ্চস্তরের প্রোগ্রামের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করে। উচ্চস্তরের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজকে অনুবাদ করার কাজ হিসাবে উল্লেখ করা যায় এবং ভাষা প্রক্রিয়াকারী প্রোগ্রামকে অনুবাদক (Translator) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অনুবাদক প্রোগ্রাম দুই ধরনের–

কম্পাইলার (Compiler)

ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)

কম্পাইলার (Compiler)

কম্পাইলার প্রথমে উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখে। কোনো প্রকার ভুল পাওয়া না গেলে কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একবারে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করে। এ ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে উৎস কোড (Source Code) এবং যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট কোড (Object Code) বলা হয়। উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হওয়ার পর কম্পিউটারের মেমোরিতে সঞ্চিত হয় এবং অবজেক্ট কোড হিসাবে প্রোগ্রামের কাজ সম্পন্ন হয়। কম্পাইলারের সাহায্যে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম যতবার প্রয়োজন ততবারই চালনা করা যায় বা কার্যকর করা যায়। প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার থাকে। এক ভাষার কম্পাইলার দিয়ে অন্য ভাষার অনুবাদের কাজ করা যায় না।

ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)

কম্পাইলারের মতো ইন্টারপ্রেটারও একটি অনুবাদক প্রোগ্রাম। ইন্টারপ্রেটার প্রোগ্রামও কম্পাইলারের মতোই উচ্চস্তরের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করে থাকে। তবে এর অনুবাদ করার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অন্যরকম। ইন্টারপ্রেটার একটি প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন ভিন্ন ভিন্নভাবে পর্যায়ক্রমে অনুবাদ করে এবং নির্বাহ করে। একটি লাইন অনুবাদ করে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজ নির্বাহ করা শেষ হলে পরবর্তী লাইনটি অনুবাদ করে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত ও নির্বাহ করে। ইন্টারপ্রেটার এভাবে প্রোগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি লাইন একটি একটি করে অনুবাদ, রূপান্তরিত ও নির্বাহের কাজ সম্পন্ন করে। কোনো লাইনে কোনো প্রকার ভুল ধরা পড়লে ইন্টারপ্রেটার সেখানে থেমে যায়। ভুল সংশোধন করে দেওয়ার পর আবার পর্যায়ক্রমে অনুবাদ, রূপান্তর ও নির্বাহের কাজ সম্পাদন করে। প্রোগ্রামের শেষ নির্দেশের অনুবাদ, রূপান্তর ও নির্বাহের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের তুলনামূলক সম্পর্ক

কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একবারে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করে। ফলে প্রোগ্রামের কোথায় বা কোনো লাইনে ভুল আছে এবং কী ধরনের ভুল আছে তা একবারে প্রদর্শিত হয়। পক্ষান্তরে ইন্টারপ্রেটার যেহেতু একটি একটি করে প্রতিটি লাইনের যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরের কাজ করে সেহেতু কোনো লাইনে ভুল ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হয় এবং প্রদর্শিত ভুল সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করে নিতে হয়।

কম্পাইলারের সাহায্যে একটি প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় বারবার রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয় না। একবার রূপান্তরিত করার পর যতবার প্রয়োজন ততবারই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ইন্টারপ্রেটারের সাহায্যে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত প্রোগ্রাম নিয়ে যখনই কাজ করতে হয় তখনই আবার নতুন করে প্রোগ্রামটিকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে হয়।

কম্পাইলার কাজ করে দ্রুত গতিতে। ইন্টারপ্রেটার কাজ করে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে।

প্রোগ্রাম রচনার বিভিন্ন ধাপ

প্রোগ্রাম রচনার সময় বা ব্যবহার করার সময় প্রোগ্রাম রচনাকারী বা ব্যবহারকারীকে শুদ্ধভাবে প্রোগ্রাম রচনা করা বা ব্যবহার করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। নির্ভুলভাবে প্রোগ্রাম রচনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রামকে প্রধানত ৪টি ধাপে বিভক্ত করা হয় এবং শুরু থেকে পর্যায়ক্রমে ধাপগুলো সম্পন্ন করে প্রোগ্রাম রচনার কাজ শুরু করতে হয়। ধাপগুলো হচ্ছে–

প্রয়োজন বা সমস্যা শনাক্ত বা নির্ধারণ করা এবং বিশ্লেষণ করা।
প্রবাহচিত্র (Flowchart) তৈরি করা
কোড লেখা (প্রোগ্রাম রচনা করা)।
ত্রুটি দূর করা (Debugging)।

প্রয়োজন বা সমস্যা শনাক্ত বা নির্ধারণ করা এবং বিশ্লেষণ করা

কম্পিউটারের প্রোগ্রামকে আগে কাগজে লিখে নিতে হয়। কোনো প্রয়োজনের বা সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানে উপনীত হওয়াই একটি প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য। কাজেই প্রথম কাজ হচ্ছে সমস্যা বা প্রয়োজনটিকে সঠিকভাবে শনাক্ত বা নির্ধারণ করা।

ধরা যাক, কোনো বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর জামাল, কামাল, হাসেম, কাসেম ও হাবিবের গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বলে দেওয়া হয়েছে। ঐ বিষয়ে যারা ৪০-এর কম পেয়েছে তারা ফেল করেছে। এ ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর নির্ধারিত সমস্যা হচ্ছে– কারা পাস করেছে এবং কারা ফেল করেছে। এখন সমাধান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত ধরা যাক, জামাল, কামাল, হাসেম, কাসেম ও হাবিবের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৩৩, ৭০, ৪০, ৬৫, ৩৮।

এ পর্যায়ে প্রোগ্রামটি কীভাবে রচনা করতে হবে, কীভাবে কার্যকর করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো কী রকম হবে ইত্যাদির গঠন নির্ধারণ করে নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্তক্রম তৈরি করে নিতে হবে। এরূপ সিদ্ধান্তক্রমকেই প্রোগ্রামিং ভাষায় বলা হয় এ্যালগরিদম (Algorithm)।

এ্যালগরিদম হচ্ছে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতির ব্যবহার কাগজ-কলমেও হতে পারে বা কম্পিউটারের প্রোগ্রাম লেখার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– অনেকগুলো সংখ্যা থেকে কীভাবে বড় সংখ্যাটি বের করতে হবে তার পদ্ধতি।

প্রবাহচিত্র (Flowchart)

প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্ট (Flowchart) হচ্ছে এ্যালগরিদম বা সিদ্ধান্তক্রমের ধাপসমূহের চিত্ররূপ। প্রোগ্রামের ধাপগুলো কোন পথে এবং কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তা চিত্র আকারে উপস্থাপন করাই হচ্ছে প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্টের মূল উদ্দেশ্য। এ্যালগরিদম বা সিদ্ধান্তক্রমের ভিত্তিতে প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্ট গঠন করা হয়। প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্ট গঠনের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে–

- প্রোগ্রামের প্রতিটি নির্দেশ প্রবাহচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয় না। সিদ্ধান্তক্রম বা এ্যালগরিদমের প্রতিটি ধাপও প্রবাহচিত্রের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। তবে প্রবাহচিত্র স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গঠিত হতে হবে, যেন দেখেই এর গতিপ্রবাহ বুঝা যায়।

- সমস্যা সমাধান বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেমন একাধিক পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা যায় তেমনি প্রবাহচিত্র গঠনেও একাধিক নিয়ম অনুসরণের সুযোগ রয়েছে। কাজেই একজন প্রোগ্রামারের লক্ষ্য হবে একটি উত্তম প্রবাহচিত্র গঠন করা। সর্বোত্তম প্রবাহচিত্র গঠনের চেষ্টা না করলেও চলবে।
- প্রবাহচিত্র প্রোগ্রাম নির্বিশেষে হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রবাহচিত্র এমন হওয়া উচিত যেন একই প্রবাহচিত্র দিয়ে প্রচলিত অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষাতেও কাজ করা যায়।
- প্রবাহচিত্র সরল এবং যতটা সম্ভব সরাসরি হওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় প্রত্যাবর্তক (Loop) এবং শাখা (Branches) পরিহার করা উচিত।
- শুধু নির্বাহযোগ্য নির্দেশ বা স্টেটমেন্ট প্রবাহচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উপাত্ত (Data) এবং মন্তব্য (Remark) জাতীয় নির্দেশ বা স্টেটমেন্ট প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কার্যকর হয় না। কাজেই এ জাতীয় নির্দেশ বা স্টেটমেন্টগুলো প্রবাহচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় না।

প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্ট হচ্ছে প্রোগ্রামের ভিত্তি। কাজেই প্রোগ্রামে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে প্রবাহচিত্র পুনর্বিন্যস্ত করে নিতে হয়। প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্টের বিষয়কে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় রূপান্তরিত করাকে কোডিং (Coding) বলা হয়।

সুডো কোড (Pseudo Code)

প্রোগ্রাম রচনা ও উন্নয়নে সুডো কোড একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। সুডো (Pseudo) গ্রীক শব্দ। সুডো শব্দের অর্থ হচ্ছে ছদ্ম। প্রোগ্রামিংয়ে সুডো কোড বলতে প্রকৃত প্রোগ্রামিং বোঝানো হয় না। প্রোগ্রামের ধরন ও কার্যাবলি তুলে ধরার জন্য কিছু সংখ্যক নির্দেশ বা স্টেটমেন্টের সমাহারকে সুডো কোড বলা হয়। এ্যালগরিদমের উদাহরণ প্রসঙ্গে একজন ছাত্রের বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত কাজটিকে তিন/চার ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রকৃত প্রোগ্রাম বা চূড়ান্ত এ্যালগরিদম তৈরির আগে সুডো কোড বা ছদ্ম প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। প্রয়োজন হলে একাধিক সুডো কোড তৈরি করা হয়। এ্যালগরিদম চূড়ান্ত করার জন্য একটির পর একটি সুডো কোড বা ছদ্ম প্রোগ্রাম তৈরির প্রয়োজন হতে পারে।

ত্রুটি সংশোধন (Debugging)

একটি প্রোগ্রাম লেখার কাজ শেষ করার পর প্রোগ্রামের ত্রুটি সংশোধন করতে বেশ সময় লেগে যায়। প্রোগ্রামের ত্রুটিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

চিহ্নাদির ত্রুটি (Syntax Error)

যুক্তি সংক্রান্ত ত্রুটি (Logical Error)

নির্বাহজনিত ত্রুটি (Execution Error)

এর যে কোনো একটি ত্রুটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রোগ্রাম নির্বাহ করা সম্ভব হয় না।

চিহ্নাদির ত্রুটি (Syntax Error)/Language-এর grammer-এর error

চিহ্নাদির ত্রুটি সাধারণত ভুল টাইপের জন্য হয়ে থাকে। যেমন– PRINT-এর জায়গায় ভুল করে PRIMT টাইপ করা। LET নির্দেশ বা স্টেটমেন্টে সমান চিহ্ন (=) ব্যবহার না করাও চিহ্নাদির ত্রুটি হিসাবে গণ্য হয়। LET নির্দেশ বা স্টেটমেন্টের সমান চিহ্নের (=) বাঁ পাশে কোনো গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করাও ত্রুটি হিসাবে গণ্য হয়।

PRINT নির্দেশ বা স্টেটমেন্টে প্রয়োজনীয় কোটেশন (" "), সেমিকোলন (;) এবং কমা (,) ব্যবহার না করাও ত্রুটি হিসাবে গণ্য হয়। চিহ্নাদির ত্রুটি সংশোধন করা সহজ। ভুল চিহ্ন মুছে শুদ্ধ চিহ্ন টাইপ করলেই ত্রুটি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়।

নির্বাহজনিত ত্রুটি (Execution Error)

নির্বাহজনিত ত্রুটি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের ত্রুটি । চিহ্নাদির ত্রুটি সংশোধন করে প্রোগ্রাম নির্বাহ করার পর্যায়ে এ ত্রুটি ধরা পড়ে । নির্বাহজনিত ত্রুটি ধরা পড়লে কম্পিউটার ত্রুটি বার্তা (Error Message) প্রদর্শন করে এবং ত্রুটি কোড নম্বর তুলে ধরে ।

গাণিতিক ভুলই প্রধানত নির্বাহজনিত ত্রুটির কারণ । যেমন– শূন্য (০) মান বিশিষ্ট কোনো চলক দিয়ে অন্য কোনো চলককে ভাগ করার জন্য চেষ্টা করলে, অঙ্কের সংখ্যা কম্পিউটার কর্তৃক গ্রহণযোগ্য সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে এবং এ ধরনের অন্যান্য ভুলের জন্য নির্বাহজনিত ত্রুটি দেখা দেয় ।

মান নিরপেক্ষ চলক ব্যবহারের ত্রুটি নির্বাহজনিত ত্রুটি হিসাবে প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে দেয় না । চিহ্নাদির ত্রুটি কম্পিউটার সরাসরি শনাক্ত করে দেয় । ফলে সংশোধনের কাজটিও সহজ হয় । কিন্তু নির্বাহজনিত ত্রুটির অবস্থান সহজে শনাক্ত করা যায় না এবং অনেক ত্রুটির কারণও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় না । ফলে নির্বাহজনিত ত্রুটি সংশোধন করাও কঠিন ।

যুক্তি সংক্রান্ত ত্রুটি (Logical Error)

প্রোগ্রাম নির্বাহের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ভুল বা অপ্রত্যাশিত ফল প্রদর্শিত হলে বুঝতে হবে যুক্তি সংক্রান্ত ত্রুটির কারণেই এরূপ ঘটেছে । যুক্তি সংক্রান্ত ত্রুটির কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Print নির্দেশ বা স্টেটমেন্ট না দেওয়ার ফলে প্রোগ্রাম নির্বাহ সম্পন্ন হলেও কোনো ফল প্রদর্শিত হবে না । ভুল উপাত্ত (Data) প্রদান করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভুল ফল পাওয়া যাবে ।

প্রোগ্রামিং ভাষার কিছু প্রয়োজনীয় শব্দ বা টার্ম

ধ্রুবক (Constant)

ধ্রুবক হচ্ছে একটি অর্থপূর্ণ নাম যা প্রোগ্রামে কোনো অপরিবর্তনশীল স্ট্রিং বা গাণিতিক মান সংরক্ষণ করে । প্রোগ্রামে যে স্থানে এ নামটি ব্যবহার করা হয় যথাসময়ে প্রদত্ত স্ট্রিং বা গাণিতিক মান দিয়ে এ নামটি প্রতিস্থাপিত হয় ।

ব্যবহারকারী কোনো শব্দকে ধ্রুবক হিসাবে ঘোষণা করতে পারে । ব্যবহারকারী ঘোষিত এরূপ ধ্রুবককে ব্যবহারকারী নির্বাচিত ধ্রুবক (User-defined Constants) বলা হয় ।

চলক (Variable)

চলক (Variable) হল কম্পিউটার মেমোরিতে সংরক্ষিত এমন একটি এলাকা যেখানে পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য ডাটা বা তথ্য অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় । প্রোগ্রাম রচনাকারী বা ব্যবহারকারী উভয়েই বিভিন্ন প্রকার তথ্য নিয়ে কাজ করেন । এ সমস্ত তথ্য প্রোগ্রাম রচনার সময় প্রোগ্রামার প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন । আবার ব্যবহারকারীও প্রোগ্রামের প্রয়োজনে তথ্য প্রদান করতে পারেন ।

প্রকৃতপক্ষে চলক যে তথ্য ধারণ করবে তা অজানা বিষয় । ধরা যাক, একটি ডিম বিক্রি করার দোকানের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে । দোকানটিতে ডিম একদামে বিক্রি হয় না । সুতরাং কী পরিমাণ ডিম বিক্রি হবে এবং কত দামে বিক্রি হবে তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয় । এ ক্ষেত্রে দুটি চলক ব্যবহার করা যায় অজানা মানসমূহ ধারণ করার জন্য । চলকগুলোর নাম দেওয়া হল Egg Price এবং Egg Sold. প্রতিবারই যখন ডিম বিক্রি হবে তখন প্রোগ্রামের ব্যবহারকারী প্রোগ্রামটিকে দুটি চলকের জন্য মান সরবরাহ করবে । সরবরাহকৃত মানের বিপরীতে প্রোগ্রাম মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হিসাব করে একটি টেক্সট বক্সে প্রকাশ করবে । প্রতিটি চলকেরই একটি নাম, ডাটা টাইপ এবং মান থাকে । চলকের মান ধ্রুবকের ন্যায় অপরিবর্তনশীল নয় । বরং চলকের মান বার বার পরিবর্তন হয়ে থাকে । বলা যায় মানের পরিবর্তন করাই চলকের বৈশিষ্ট্য । নিম্নলিখিত নিয়মের অধীনে একটি চলকের যে কোনো নাম প্রদান করা যায় ।

চলকের নাম যে কোনো ইংরেজি বর্ণ বা সংখ্যা দিয়ে লেখা যায়। তবে নামের শুরুতে কোনো সংখ্যা ব্যবহার করা যাবে না। নামে অক্ষরের সংখ্যা ২৫৫ এর বেশি হতে পারবে না। নামে ইচ্ছানুযায়ী ছোট হাতের ও বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা যাবে। নামে কোনো ফুলস্টপ (.) কমা (,), কোলন (:), সেমিকোলন (;) বা অন্যান্য স্পেশাল ক্যারেক্টার এবং স্পেস ব্যবহার করা যাবে না। তবে আন্ডার স্কোর (-) ব্যবহার করা যাবে।

ডাটা টাইপ (Data Type)

প্রোগ্রামে যেমন একক তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয় তেমনি আবার বিপুল সংখ্যক তথ্য নিয়েও কাজ করতে হতে পারে। তাই কোন ক্ষেত্রে কী পরিমাণ তথ্য নিয়ে কাজ করতে হবে তা প্রোগ্রাম রচনাকারীকে পূর্ব থেকেই ঠিক করে দিতে হয়। কারও বয়স লেখার জন্য বড় জোর তিনটি সংখ্যা লেখা যায় এমন একটি স্থান হলেই চলে। কিন্তু, সেখানে যদি অপরিকল্পিতভাবে ১০০ সংখ্যা লেখা যায় এরূপ স্থান সংরক্ষণ করা হয় তবে কম্পিউটার মেমোরি অযথাই ব্যবহার করা হবে। কোন ধরনের তথ্যের জন্য কী পরিমাণ স্থান সংরক্ষণ করতে হবে তা নির্ধারণের জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকে বিভিন্ন প্রকার ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। এগুলোর বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হল :

ডাটা টাইপ	রেঞ্জ	আকার
১. Byte	১ বাইট	0 থেকে 225
২. Boolean	২ বাইট	True বা False
৩. Interger	২ বাইট	-32.768 থেকে 32.767
৪. Long (Long Interger)	৪ বাইট	-2,147,483, 648 থেকে 2,147,483,647
৫. Single (single-precision)	৪ বাইট	ঋণাত্মক মানের জন্য-3.402823B38 থেকে floating-point) 1.401298B-45 ঋণাত্মক মানের জন্য- 1.401298B-45 থেকে 3.402823B38
৬. Double (double-precision)	৮ বাইট	ঋনাত্মক মানের জন্য (floating-point) -1.79769313486232E308 থেকে 4.94065645841247E-324; ঋনাত্মক মানের জন্য 4.9406545841247E-324 থেকে 1.79769313486232E308
৭. Date	৮ বাইট	জানুয়ারি ১.১০০ থেকে ডিসেম্বর ৩১,৯৯৯

প্রতিটি ডাটা টাইপ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ডাটা সংরক্ষণ করে এবং চলক ঘোষণার সময় ডাটা সংরক্ষণের সামর্থ্য অনুযায়ী ডাটা টাইপ নির্ধারণ করতে হয়।

টাইপ মিসম্যাচ (Type Mismatch) বা ওভার ফ্লো এরর (Overflow Error)

চলক ঘোষণার পর যে ধরনের ডাটা টাইপ সংশ্লিষ্ট করা হবে পরবর্তী সময়ে সেই ধরনের ডাটাই প্রদান করতে হবে। যেমন– কোনো চলকের সাথে ইন্টিজার ডাটা টাইপ সংশ্লিষ্ট করার পর তাতে যদি সংখ্যাসূচক কোনো মান প্রদান না করে টেক্সট প্রদান করা হয় তবে প্রজেক্টটি রান করা হলে এরর প্রদর্শন করবে। সুতরাং চলকের সাথে যে ধরনের ডাটা

টাইপ সংশ্লিষ্ট করা হবে পরবর্তীতে চলকের মান হিসাবে সে ধরনের ডাটাই প্রদান করতে হবে। অন্যরূপ মান প্রদান করা হলে কোনো কোনো অবস্থায় টাইপ মিসম্যাচ আবার কোনো অবস্থায় ওভার ফ্লো এরর প্রদর্শন করে।

প্রোপার্টি, ইভেন্ট ও মেথড

প্রোপার্টি, ইভেন্ট এবং মেথড হচ্ছে যে কোনো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের ভিত্তিস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি ভিজ্যুয়াল বেসিক এ্যাপ্লিকেশনের মূলে রয়েছে প্রোপার্টি, ইভেন্ট এবং মেথড।

প্রোপার্টি (Property) : প্রোপার্টি হল কোনো অবজেক্টের বৈশিষ্ট্যাবলি বা গুণাবলি যা অবজেক্টটির অবস্থা ও আচরণ প্রকাশ করে। যেমন– ফর্ম একটি অবজেক্ট। সাধারণভাবে এর আকার, এর নাম, ক্যাপশন, অবস্থান, রং এ সবই এর প্রোপার্টি। কোনো অবজেক্টের সংশ্লিষ্ট প্রোপার্টিসমূহ প্রোপার্টিজ উইন্ডোতে থাকে এবং এখানে এগুলোর মান পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু এমন কিছু প্রোপার্টি আছে যেগুলো প্রোপার্টিজ উইন্ডোতে থাকে না। সেগুলো কোড উইন্ডো থেকে নির্ধারণ করতে হয়।

ইভেন্ট (Event) : উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে রয়েছে ইভেন্ট ড্রাইভেন (Event-Driven) ও বার্তা (Message) নির্ভর প্রোগ্রামিং পরিবেশ। ভিজ্যুয়াল বেসিক দিয়ে উইন্ডোজ ভিত্তিক প্রোগ্রাম রচনা করা সহজ। কারণ, ভিজ্যুয়াল বেসিক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে উইন্ডোজ ভিত্তিক প্রোগ্রামিংয়ের এই জটিলতা ইভেন্ট প্রসিডিউরের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে পারে।

ইভেন্ট হল একটি ক্রিয়া যা ভিজ্যুয়াল বেসিক চলাকালে কন্ট্রোলের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। একটি ফর্মে কোন অবজেক্ট বা কন্ট্রোল কাজ করবে তা ইভেন্ট দিয়ে নির্ধারিত হয়। সহজভাবে বলতে গেলে কোন প্রোগ্রাম চলাকালে ব্যবহারকারী কী-বোর্ডের একটি বোতামে চাপ দিল বা মাউসের বোতামে ক্লিক করল তাই ইভেন্ট। এই ইভেন্টের বিপরীতে কোন প্রোগ্রাম কী কাজ করবে তা নির্ভর করে প্রোগ্রাম লিখিত কোডের উপর।

মেথড (Method) : মেথড হচ্ছে ভিজ্যুয়াল বেসিকের এমন কিছু অভ্যন্তরীণ প্রসিডিউর যেগুলো নির্দিষ্ট অবজেক্টের সাথে কার্যকর হয়। অর্থাৎ, কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করতে গিয়ে যে সমস্ত অবজেক্ট ব্যবহার করা হয় তার সাথে প্রয়োজনে কিছু মেথড ব্যবহার করা যায়। প্রতিটি অবজেক্টেই নিদিষ্ট কিছু মেথড রয়েছে। এগুলো পূর্ব-নির্ধারিত। এমনকি এগুলোর কার্যাবলিও পূর্ব-নির্ধারিত। প্রোগ্রামের কাজ হল কোন মেথডটি কোন অবজেক্টের সাথে কী কাজ করে তা জেনে প্রয়োজন অনুসারে এগুলো প্রোগ্রামে ব্যবহার করা। প্রোগ্রামার কোনো মেথডের কার্যাবলির পরিবর্তন করতে পারে না।

সংরক্ষিত শব্দ (Reserve Word)

ভিজ্যুয়াল বেসিকে এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলো নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য সংরক্ষিত। এগুলো ব্যবহার করে ব্যবহারকারী তার নিজস্ব কোনো কাজ যেমন– ধ্রুবক বা চলকের নাম প্রদান, এরূপ কিছু কাজ করতে পারে না। এ সমস্ত শব্দকে সংরক্ষিত শব্দ (Reserve Word) বলা হয়। ভিজ্যুয়াল বেসিকের উল্লেখযোগ্য কিছু সংরক্ষিত শব্দ হচ্ছে–

All, As Asc/Desc, Binary, By, ByRef, By Val, CREATE, Data, Drop, Else, Empty, Error, False, For, Friend, Get, In, Index, Input, Into, Is, join, Len, Let, Lock, Me, Mid, New, Next, Nothing, Null On, Option, Optional, PatamArray, Print, Private, Property, Public, Resume, Seek, Select, Set, Static, Sten, String, Table, Rhen, Time, To, True, With, WithEvents.

প্রোগ্রাম স্টার্ট করা

সাধারণভাবে কম্পিউটারে কোনো এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। এর ভেতর থেকে যে কোনো একটি অবলম্বন করে ভিজ্যুয়াল বেসিক শুরু করা যায়।

উইন্ডোজ ৮৫/৯৮/এনটি/২০০০ অপারেটিং সিস্টেমে ভিজ্যুয়াল বেসিক শুরু করার জন্য নিচের নিয়মটি প্রযোজ্য।

টাস্কবারের বাম দিকে অবস্থিত Start বোতামে ক্লিক করলে একটি পপ-আপ মেনু আসে। উক্ত মেনুর Programs-এর উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে ডান দিকে বিভিন্ন ফোল্ডার ও এ্যাপ্লিকেশনের তালিকা পাওয়া যায়। সেখান থেকে Microsoft Visual Studio 6.0>Microsoft Visual Basic 6.0 বাছাই করে ক্লিক করলে Microsoft Visual Basic 6.0 চালু হয়ে যাবে।

ভিজ্যুয়াল বেসিক ৬.০ শুরু করার জন্য উপরের পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে পর্যায়ক্রমে প্রোগ্রামটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে New Project উইন্ডো পর্দায় হাজির হয়। উক্ত উইন্ডোতে New/Exisiting/Recent এই তিনটি ট্যাব দেখা যায়। অবশ্য ডিফল্টভাবে New ট্যাবই থাকে। পূর্ব থেকে তৈরি করা কোনো প্রজেক্ট খুলতে হলে Exisiting ট্যাবের এবং সম্প্রতি কাজ করা হয়েছে এরূপ কোনো প্রজেক্ট খুলতে হলে Recent ট্যাবের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। New ট্যাবের অধীনে অনেকগুলো প্রজেক্ট দেখা যায়। এর মধ্যে Standard EXE হল প্রথম প্রজেক্ট এবং ডিফল্টভাবে এই প্রজেক্টটি সিলেক্টেড অবস্থায় থাকে। কোনো এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করতে হলে এই প্রজেক্ট দিয়েই কাজ শুরু করতে হয়। আর এর জন্য নিচের যে কোনো একটি কাজ করতে হবে–

Standard EXE আইকনে দুইবার ক্লিক করতে হবে।

Standard EXE সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় Open বোতামে ক্লিক করতে হবে।

Project-Microsoft Visual Basic [Design] মোড প্রদর্শিত হবে। এটাই ভিজ্যুয়াল বেসিকের প্রোগ্রামিং পরিবেশ যাকে Project Development Environment (PDE) বলা হয়। ভিজ্যুয়াল বেসিকের এই প্রোগ্রামিং পরিবেশটি কয়েকটি উইন্ডো এবং অপশন নিয়ে গঠিত। যেমন– এ্যাপ্লিকেশন টাইটেলবার, মেনুবার এবং স্ট্যান্ডার্ড টুলবার।

পর্দার মাঝখানে Project-Format (Form) উইন্ডো অবস্থান করে। যার মধ্যে একটি স্ক্রোলবারবিহীন উইন্ডো দেখা যায়। ডিফল্টভাবে উক্ত উইন্ডোর নাম
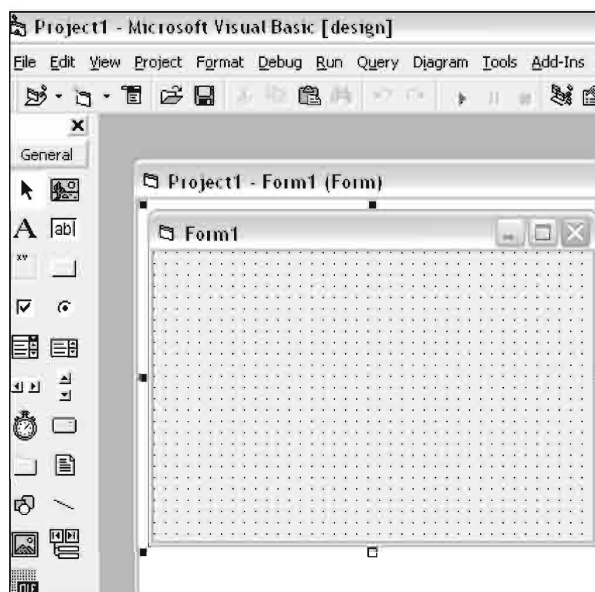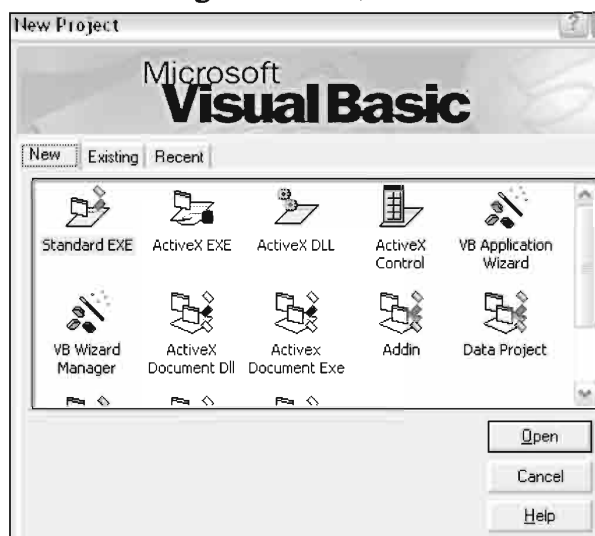
Form-1 । এর উপর গ্রাফিক্যাল এলিমেন্টসমূহ স্থাপন করে প্রোগ্রামের জন্য গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করা হয় । এই গ্রাফিক্যাল এলিমেন্টসমূহ কন্ট্রোলও বলা হয় ।

পর্দার বাঁ পাশে টুলবক্সের অবস্থান । উক্ত টুলবক্সে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার কন্ট্রোল ।

পর্দার ডান পাশে Project Explorer এবং Properties উইন্ডো প্রদর্শিত হয় ।

এছাড়া প্রয়োজনে Form Layout উইন্ডো পর্দায় হাজির করা যায় এবং তা Properties উইন্ডোর নিচে অবস্থান গ্রহণ করে ।

কোড লেখার উইন্ডো এবং ডিবাগ করার জন্য উইন্ডো পর্দায় সাধারণভাবে অবস্থান করে না । ফর্ম বা কোনো কন্ট্রোলের উপর দুইবার ক্লিক করা হলে সাথে সাথে কোড উইন্ডো পর্দায় হাজির হয় ।

প্রোগ্রাম বন্ধ করা

প্রোগ্রাম শুরু করার পর এক সময় তা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় । ভিজ্যুয়াল বেসিক বন্ধ করার জন্য File মেনু থেকে Exit কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে ।

ভিজ্যুয়াল বেসিকের মৌলিক বিষয়সমূহ

ভিজ্যুয়াল বেসিকের Project Development Environment (PDE) পরিবেশে প্রদর্শিত উইন্ডো এবং অপশনসমূহ কোনো এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য অতি প্রয়োজনীয় । এগুলো নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে । পরে আরও কিছু বিষয় নিয়ে এ অধ্যায় আলোচনা করা হবে যেগুলো ভিজ্যুয়াল বেসিক দিয়ে কোনো প্রজেক্ট তৈরি করতে গেলে প্রয়োজন হয় ।

মেনুবার

প্রতিটি উইন্ডোজ এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামেরই একটি মেনুবার থাকে । ভিজ্যুয়াল বেসিক এর ব্যতিক্রম নয় । তবে এ্যাপ্লিকেশন ভেদে মেনুবারে অবস্থিত মেনুসমূহের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায় । এ্যাপ্লিকেশনস প্রোগ্রামের কাজ করার ক্ষেত্রে এবং কার্য সম্পাদনের সামর্থ্য অনুযায়ী মেনুসমূহের এই ভিন্নতা হয়ে থাকে । ভিজ্যুয়াল বেসিক শুরু হওয়ার পর টাইটেল বারের নিচে মেনু সংবলিত আনুভূমিক যে বারটি দেখা যায় তার নাম মেনু বার ।

ভিজ্যুয়াল বেসিক মেনুবারে File, Edit, View, Project, Format, Debug, Run, Query, Diagram, Tools, Add-Ins, Window এবং Help ইত্যাদি মেনুসমূহ রয়েছে ।

টুলবার

মেনুবারের নিচে আনুভূমিক অপর যে বারটি রয়েছে এর নাম টুলবার । উক্ত টুলবারটিকে Standard টুলবার বলা হয় । Standard টুলবারটি ডিফল্টভাবে মেনুবারের নিচে অবস্থান করে । উক্ত টুলবারে এমন কতকগুলো টুল রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে মেনুবারে উপস্থিত এবং প্রায়শ কাজে লাগে এমন কিছু কমান্ডকে অতি সহজে কার্যকর করা যায় ।

প্রজেক্ট উইন্ডোজ এবং ফরম

New Project ডায়লগ বক্সের অধীন যে সমস্ত প্রজেক্ট রয়েছে এর ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় প্রজেক্টটি নিয়ে কাজ করা যায় । তবে নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য Standard Exe প্রজেক্ট দিয়েই কাজ শুরু করতে হয় । New Project ডায়লগ বক্স থেকে Standard Exe প্রজেক্ট সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করলে যে উইন্ডো পর্দায় হাজির হয় তাই প্রজেক্ট উইন্ডো । এই প্রজেক্ট উইন্ডোই হল ভিজ্যুয়াল বেসিকে প্রোগ্রাম তৈরি করার ক্ষেত্র এবং এর অধীনেই একটি নতুন এ্যাপ্লিকেশন তৈরির সকল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয় । প্রজেক্ট উইন্ডোর ভেতর Form 1 নামে একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হয় ।

এই উইন্ডোটিকে ফর্ম বলা হয়। এই ফরমের উপর ভিত্তি করেই ভিজুয়্যাল বেসিকে প্রোগ্রাম ইন্টারফেস তৈরি করা হয়। কোনো প্রোগ্রামের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন প্রোগ্রামটিকে রান করা হয় তখন এই ফর্মটি একটি উইন্ডোতে রূপান্তরিত হয়। যার মধ্যে টাইটেল বার, মেনু বার ইত্যাদি বিভিন্ন অপশনসমূহ থাকতে পারে।

কন্ট্রোল ও টুলবক্স

কন্ট্রোল হল ভিজ্যুয়াল বেসিকের বিশেষ ধরনের কিছু অবজেক্ট যেগুলো ফরমের উপর স্থাপন করে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ইন্টারফেস তৈরি করা হয়। যেমন– টেক্সট বক্স, চেক বক্স, কম্বো বক্স, কমান্ড বোতাম, অপশন বোতাম, স্ক্রোলবার ইত্যাদি।

প্রোগ্রাম ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই বক্স ও বোতামগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল বেসিকে অতি সহজে প্রোগ্রাম ইন্টারফেস তৈরি করা যায়।

ভিজ্যুয়াল বেসিকের টুলবক্সটি পয়েন্টার টুল এবং বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু কন্ট্রোল নামে পরিচিত। ফরমের উপর প্রোগ্রামের ইন্টারফেস তৈরি করার জন্য টুলবক্স থেকে নির্দিষ্ট কন্ট্রোল সিলেক্ট করে ফরমে স্থাপন করতে হয়। ফরমে কন্ট্রোল স্থাপনের জন্য নিম্নের পদ্ধতিগুলো থেকে যে কোনো একটি অবলম্বন করা যায়–

১. নির্দিষ্ট টুলের উপর দুইবার ক্লিক করলে একটি ডিফল্ট আকৃতির কন্ট্রোল ফরমের কেন্দ্র স্থাপিত হবে।

   - এভাবে যতবার এবং যতটি টুলের উপর দুইবার ক্লিক করা হবে প্রতিটি দুইবার ক্লিকেই এক একটি কন্ট্রোল ফরমের কেন্দ্রে স্থাপিত হবে। পরবর্তী সময়ে ড্রাগ করে এ সমস্ত কন্ট্রোলকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় এবং প্রয়োজনে এগুলোর আকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায়।

২. নির্দিষ্ট টুল সিলেক্ট করে ফরমের কোনো স্থানে ক্লিক ও ড্র্যাগ করলে ড্র্যাগের বিস্তৃতি অনুযায়ী একটি কন্ট্রোল ফরমে স্থাপিত হবে।

   - এ পদ্ধতিতে যে কোনো আকৃতির কন্ট্রোল শুরুতেই ফরমে স্থাপন করা যায়। অবশ্য সিলেক্ট করা কন্ট্রোলের চারদিকে অবস্থিত হাতলসমূহের যে কোনোটিতে পয়েন্টার টুলের সাহায্যে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে কন্ট্রোলের আকার পরিবর্তন করা যায়। কোনো কন্ট্রোলের আকার-আকৃতি পরিবর্তন প্রোপার্টিজ উইন্ডোর সাহায্যেও করা যায়।

বিঃদ্রঃ ড্র্যাগ হল মাউসের বাম দিকের বোতামটি চেপে ধরে কোনো অবজেক্টকে মাউসের সাথে স্থানান্তর করা। টুলবক্স থেকে ফরমে কোনো কন্ট্রোল স্থাপনের পর এগুলোকে পুনরাকৃতি দান করা, স্থানান্তর করা ও লক করা যায়। কোনো কন্ট্রোল সিলেক্ট করা হলে এর চারদিকে ৮টি হাতল দৃশ্যমান হয়। এগুলোর সাহায্যে কোনো কন্ট্রোলের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা যায়। এছাড়া মাউস, কী-বোর্ড এবং মেনু কমান্ডসমূহ ব্যবহার করে কোনো কন্ট্রোল স্থানান্তর, লক-আনলক এবং তাদের অবস্থানের বিন্যাস করা যায়।

কন্ট্রোলের আকৃতি পরিবর্তন করার পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ–

- কন্ট্রোলের আকার পরিবর্তন করার জন্য কন্ট্রোলটি মাউসের সাহায্যে ক্লিক করে সিলেক্ট করলে এর চারপাশে হাতলসমূহ প্রদর্শিত হবে।
- যে কোনো একটি হাতলের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক ও ড্র্যাগ করতে হবে।
- আপনার পছন্দমতো আকৃতিপ্রাপ্ত হলে মাউস মুক্ত করে দিতে হবে অথবা Shift বোতাম চেপে ধরে কী-বোর্ডে অবস্থিত Arrow কী-সমূহ ব্যবহার করতে হবে কোনো সিলেক্ট করা কন্ট্রোলের আকার পরিবর্তন করার জন্য।
- প্রোপার্টিজ উইন্ডোর Height এবং Width প্রোপার্টির মান প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করতে হবে। কন্ট্রোলকে স্থানান্তর করার জন্য নিচের যে কোনো একটি কাজ করতে হবে–

- মাউসের সাহায্যে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে কন্ট্রোলকে ফরমের এক স্থান থেকে নতুন স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। প্রোপার্টিজ উইন্ডো থেকে Top এবং Left প্রোপার্টির মান পরিবর্তন করে কোনো কন্ট্রোল স্থানান্তর করতে হবে। কোনো কন্ট্রোলকে স্থানান্তর করার জন্য কী-বোর্ড থেকে Ctrl বোতাম চেপে ধরে Arrow কী-সমূহ ব্যবহার করতে হবে। Arrow কী-সমূহের কোনো একটি কী-এর প্রতি চাপে যেন কন্ট্রোল এক গ্রিড ইউনিট পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে। আর যদি গ্রিড কার্যকর অবস্থায় না থাকে তবে প্রতি বারে এক পিক্সেল স্থান অতিক্রম করে।

টুলবক্সে অবস্থিত কিছু ডিফল্ট টুল

Pointer : ফরমে অবস্থিত কোনো অবজেক্ট সিলেক্ট ও স্থানান্তর করার জন্য এ টুলটি ব্যবহার করা হয়। এ টুল দিয়ে সিলেক্ট করা হলে কোনো অবজেক্টের চারপাশের আটটি বর্গ প্রদর্শিত হয়। এ বর্গগুলোকে হাতল বলা হয়। উক্ত হাতলগুলোর যে কোনো একটিতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অবজেক্টটির আকার পরিবর্তন করা যায়। অন্য কোনো টুল সিলেক্ট করে কোনো কার্য সম্পাদন করা হলে Pointer টুল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেক্ট হয়ে যায়।

PictureBox : ফরমে কোনো ছবি স্থাপন করার জন্য পিকচার বক্স টুল ব্যবহার করা হয়।

Label : ফরমে অবস্থিত কোনো অবজেক্টের পরিচয় সংক্রান্ত কোনো লেবেল বা অন্য কোনো প্রয়োজনে কোনো ক্যাপশন লেখার প্রয়োজন হলে এ টুল ব্যবহার করা হয়।

TextBox : প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে যে সমস্ত বক্সে কোনো টেক্সট লেখা ও এডিট করা যায় সে সমস্ত বক্সকে টেক্সট বক্স বলা হয়। এ টুলের সাহায্যে সেরূপ টেক্সট বক্স তৈরি করা যায়।

Frame : এ টুলের সাহায্যে ফরমের কন্ট্রোলসমূহকে একটি গ্রুপের আওতায় আনা যায়।

CommandButton : এ টুলের সাহায্যে কোনো কমান্ড বোতাম তৈরি করা যায়। যেমন কোনো উইন্ডোতে অবস্থিত OK, Open, Cancel ইত্যাদি এক একটি কমান্ড বোতাম।

CheckBox : কোনো অপশন কার্যকর হবে কি হবে না তা নির্ধারণ করা হয় সেই অপশনের পাশে অবস্থিত একটি বর্গাকৃতি বক্সের মাধ্যমে। উক্ত বক্সটিকে চেক বক্স বলা হয়। এরূপ কোনো চেকবক্স তৈরি করার জন্য এ টুলটি ব্যবহার করা হয়।

OptionButton : এ টুল দিয়ে যে গোলাকৃতি বোতাম তৈরি করা হয় সাধারণত সেগুলোকে রেডিও বোতাম বলা হয়। প্রোগ্রামে অবস্থিত একাধিক অপশন থেকে একটি অপশন সিলেক্ট করার জন্য এরূপ বোতাম ব্যবহার করা হয়।

ComboBox : এ বোতামটি দিয়ে কম্বো বক্স তৈরি করা যায়। কম্বো বক্সের ডান দিকে একটি ছোট ত্রিভুজ সংবলিত বক্স থাকে যার উপর ক্লিক করা হলে একটি লিস্ট প্রকাশিত হয়। এ লিস্ট থেকে যে কোনো একটি অপশন সিলেক্ট করা যায়।

HScrollBar : কোনো উইন্ডোতে যদি অনেক তথ্য থাকে এবং তা পাশাপাশি দেখার প্রয়োজন হয় তবে এ টুলটি ব্যবহার করে হরাইজন্টাল স্ক্রোলবার কন্ট্রোল তৈরি করতে হয়।

VScrollBar : কোনো উইন্ডোতে যদি অনেক তথ্য থাকে এবং তা উপর থেকে নিচে দেখার প্রয়োজন হয় তবে এ টুলটি ব্যবহার করে ভার্টিক্যাল স্ক্রোলবার কন্ট্রোল তৈরি করতে হয়।

Time : সময় নিরূপণ সংক্রান্ত কাজে এ টুলটি ব্যবহার করে টাইমার কন্ট্রোল তৈরি করা যায়।

DriveListBox : ডিস্ক ড্রাইভের তালিকা প্রদর্শন করার কন্ট্রোল এ টুলটি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এরূপ কন্ট্রোল কম্পিউটারে অবস্থিত সব কয়টি ড্রাইভ প্রদর্শন করে উক্ত ড্রাইভের তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় ড্রাইভটি সিলেক্ট করে তাতে কাজ করা যায়।

DirListBox : ডিরেক্টরি বা ফোল্ডারের তালিকা প্রদর্শন করার কন্ট্রোল এ টুলটি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

FileList Box : ডিরেক্টরি বা ফোল্ডারে অবস্থিত ফাইলসমূহের তালিকা প্রদর্শন করার কন্ট্রোল এ টুলটি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

Shape : এ টুলটি দিয়ে বর্গ, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, উপবৃত্ত, গোলাকার, কোণ বিশিষ্ট, আয়তাকার ক্ষেত্র ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

Line : বিভিন্ন প্রকার লাইন অংকন করার জন্য এ টুলটি ব্যবহার করা হয়।

Image : ফরমে কোনো ইমেজ আমদানি করার জন্য এ টুলটি ব্যবহার করা হয়।

Data : এ টুলটি দিয়ে ফরমে একটি ডাটাবেজ কন্ট্রোল তৈরি করা যায়, যা দিয়ে কোনো ডাটাসোর্স থেকে ডাটা ইমপোর্ট করা যায়।

OLE : অন্য এ্যাপ্লিকেশনের কোনো OLE অবজেক্টের সাথে Link বা Embed করার জন্য এ টুলটি ব্যবহার করা হয়।

কন্ট্রোল লক করা ও লক থেকে মুক্ত করা

কোন ফরমে স্থাপিত কন্ট্রোলসমূহ লক করে রাখা যায়। লক করার পর কোনো কন্ট্রোল স্থানান্তর করা যায় না বা ছোট-বড় করা যায় না। ফরমে অবস্থিত কন্ট্রোলসমূহ লক করার জন্য সেই ফরমটি কার্যকর করে নিচের যে কোনো একটি কাজ করতে হবে−

Format মেনু থেকে Lock Controls কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে।

ফরম এডিটর টুলবার থেকে Lock Controls Toggle ক্লিক করতে হবে।

লক করার উল্লিখিত কমান্ডসমূহ যেহেতু একটি টোগল কমান্ড তাই একই কমান্ড দিয়ে কন্ট্রোলসমূহকে লক থেকে মুক্তও করা যায়।

প্রোপার্টিজ উইন্ডো

ভিজুয়াল বেসিকে একটি প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য নানারূপ অবজেক্ট ব্যবহার করতে হয়। অবজেক্ট হল প্রজেক্টে ব্যবহৃত কোনো কম্পোনেন্ট। যেমন− ফরম, কন্ট্রোল ইত্যাদি। এ সমস্ত অবজেক্টে যেমন কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে তেমনি থাকে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভিজুয়াল বেসিকের ভাষায় এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রোপার্টিজ উইন্ডো বলা হয়। আর অবজেক্টের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা প্রোপার্টি যেখানে প্রদর্শিত হয় তাকে প্রেপার্টিজ উইন্ডো বলা হয়। সাধারণত প্রোপার্টিজ উইন্ডো যে সমস্ত অবজেক্টের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে থাকে এরূপ কয়েকটি অবজেক্টের পূর্ণ নাম ও সংক্ষিপ্ত নাম নিচে প্রদান করা হল। কোনো অবজেক্টের সংক্ষিপ্ত নাম প্রোপার্টিজ উইন্ডো ও অন্যান্য স্থানে কখনও কখনও প্রয়োজন হয়। এ সকল সংরক্ষিত নামসমূহের মধ্যে রয়েছে−

অবজেক্টের পূর্ণ নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	অবজেক্টের পূর্ণ নাম	সংক্ষিপ্ত নাম
Combobox	cbo	Checkbox	chk
Commandbutton	cmd	Directorylistbox	dir
Image	img	Label	lbl
Picturebox	pic	Resource	res
Textbox	txt	User-defined data	typ

প্রোপার্টিজ উইন্ডোর শুরুতেই এর টাইটেল বার থাকে। এরপর একটি অবজেক্ট বক্সে কোনো সক্রিয় প্রজেক্টে ব্যবহৃত অবজেক্টসমূহের তালিকা থাকে। উক্ত অবজেক্ট বক্স প্রকৃতপক্ষে একটি কম্বো বক্স। উক্ত তালিকায় প্রতিটি টাইটেল প্রথমে অবজেক্টের নাম পরে এটি কোন জাতীয় অবজেক্ট তার পরিচয় লেখা থাকে। আর উক্ত অবজেক্ট বক্সের লিস্ট

থেকে যে অবজেক্টটি সিলেক্ট করা হয় প্রেপার্টিজ উইন্ডোতে সে অবজেক্টটির বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রদর্শিত হয়।

ফরম লে-আউট উইন্ডো

ভিজ্যুয়াল বেসিকের গ্রাফিক্যাল উইজার ইন্টারফেসের প্রধান এলিমেন্টটি হল ফরম। প্রজেক্ট তৈরির পর তা রান করা হলে ফরমটি একটি উইন্ডোতে পরিবর্তিত হয়ে কম্পিউটারের পর্দায় অবস্থান গ্রহণ করে। কম্পিউটারের পর্দায় কোন স্থানে উক্ত ফরম প্রদর্শিত হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকে ফরম লে আউট উইন্ডো নামে একটি উইন্ডো রয়েছে। এটি পর্দায় হাজির না থাকলে View>Form Layout Window সিলেক্ট করতে হবে। উক্ত উইন্ডোতে একটি কম্পিউটার মনিটরের চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং সেখানে ফরমের অবস্থান রান করার পর কোথায় হবে তা প্রদর্শিত হয়। ইচ্ছে করলে এর অবস্থান পরিবর্তন করা যায়। পয়েন্টার টুল দিয়ে ফরম লে-আউট উইন্ডোতে অবস্থিত ফরমের থাম্বলেইন ইমেজের উপর ক্লিক ও ড্র্যাগ করে স্ক্রিনের যে কোনো স্থানে ফরমটি স্থানান্তর করা যায়। অতঃপর ফরমটি রান করা হলে কম্পিউটারের প্রকৃত পর্দার সেই স্থানেই তা প্রদর্শিত হবে।

ইমিডিয়েট উইন্ডো

ভিজ্যুয়াল বেসিকে ডিবাগ উইন্ডো ইমিডিয়েট উইন্ডো হিসাবে পরিচিত। উক্ত উইন্ডোর প্রধান কাজ হল ডিবাগিং করা। ডিবাগিং হল প্রোগ্রাম কোড লিখতে গিয়ে কোথাও ভুল থাকলে সেই ভুল খুঁজে বের করে সংশোধন করার পদ্ধতি। ভিজ্যুয়াল বেসিকের কোনো স্টেটমেন্ট টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দেওয়া হলে এর ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত উইন্ডোতে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া উক্ত উইন্ডোর সাহায্যে প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে ডিবাগিং করা যায়। এই উইন্ডো পর্দায় উপস্থিত না থাকলে View>Immediate Windo সিলেক্ট করতে হবে অথবা Ctrl+G নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

গাণিতিক, রিলেশনাল ও লজিক্যাল অপারেটরের ব্যবহার

প্রোগ্রামে কোনো ডাটা সংরক্ষণ করার পর এ সমস্ত ডাটা নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া কখনও কখনও একটি ডাটার সাথে অন্য কোনো ডাটার তুলনা করার প্রয়োজন হয়। অন্য সকল প্রোগ্রামিং ভাষার মতো ভিজ্যুয়াল বেসিক এ সমস্ত কাজ করার জন্য কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ চিহ্নগুলোকে অপারেটর বলা হয়।

প্রধানত ভিজ্যুয়াল বেসিকে ৩ ধরনের অপারেটর ব্যবহার করা হয়। যেমন–

১. গাণিতিক অপারেটর (Mathematical Operator)

২. রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator)

৩. লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator)

গাণিতিক অপারেটর (Mathematical Operator)

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি গাণিতিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে সকল অপারেটর ব্যবহার করা হয় তাকে গাণিতিক অপারেটর (Mathematical Operator) বলা হয়। যেমন–

+ যোগ (Addition) : যোগ করার জন্য এই অপারেটর ব্যবহার হয়। যেমন : ৪+৩ = ৭।

- বিয়োগ (Subtraction) : বিয়োগ করার জন্য এই অপারেটর ব্যবহার করা হয়। যেমন : ৪-৩ = ১।

* গুণ (Multiplication) : গুণ করার জন্য এই অপারেটর ব্যবহার করা হয়। যেমন : ৪*৩ = ১২।

/ ভাগ (Division) : ভাগ করার জন্য এই অপারেটর ব্যবহার করা হলে ভাগফল দশমিকসহ পাওয়া যায়।
যেমন : ৪/৩ = ১.৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩

/ ভাগ (Interger Division) : ভাগ করার জন্য এই অপারেটর ব্যবহার করা হলে ভাগফল পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া

যায়। যেমন : ৪/৩ =১।

Mod ভাগশেষ (Modulus) ভাগ করার পর ভাগশেষ বের করার জন্য এই অপারেটর ব্যবহার করা হয়।

যেমন : ৪ Mod ৩=১।

রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator)

সমজাতীয় উপাদানের মধ্যে তুলনা করার জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকে কিছু অপারেটর ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator) বলা হয়। যেমন–

অপারেটর	**উদ্দেশ্য**
<	ক্ষুদ্রতর (Less than)
>	বৃহত্তর (Greater than)
=	সমান (Equal to)
<>	অসমান (Not equal)
<=	ক্ষুদ্রতর বা সমান (Less than or equal to)
>=	বৃহত্তর বা সমান (Greater than or equal to)

অপারেটরগুলো দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা করার পর সত্য (True) বা মিথ্যা (False) ফলাফল পাওয়ার জন্য লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহার করা হয়। ভিজ্যুয়াল বেসিকে লজিক্যাল অপারেটরগুলো হল–

And Operator

Not Operator

Or Operator

Xor Operator

এছাড়াও আরও দুই ধরনের লজিক্যাল অপারেটর ভিজ্যুয়াল বেসিকে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

Eqv Operator

Imp Operator

ব্যবহারকারীর নিকট থেকে তথ্য গ্রহণ করার জন্য এবং সেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পর ব্যবহারকারীকে ফলাফল প্রদান করার জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকে কিছু ইনপুট আউটপুট সংক্রান্ত নির্দেশাবলি রয়েছে। এই নির্দেশাবলির মধ্যে প্রধান হল ফাংশন এবং একটি প্রসিডিউর। এগুলোর সাহায্যে ভিজ্যুয়াল বেসিকের ইনপুট আউটপুট সংক্রান্ত নির্দেশাবলি কার্যকর করা যায়। ইনপুট নির্দেশ কার্যকর করার জন্য (InputBox) ফাংশন এবং আউটপুট নির্দেশ কার্যকর করার জন্য (MSBox) ফাংশন এবং (MSgBox) প্রসিডিউর রয়েছে।

InputBox ফাংশন : ব্যবহারকারীর নিকট থেকে কোনো তথ্য নেওয়ার জন্য এই ফাংশন ব্যবহার করা হয়। এই ফাংশনটি একটি ডায়লগ বক্স প্রদর্শন করে এবং সাধারণত এই ডায়লগ বক্সের মধ্যে একটি প্রম্পট (Prompt), একটি OK কমান্ড বোতাম, একটি Cancel কমান্ড বোতাম এবং একটি টেক্সট বক্স থাকে। এছাড়াও ফাংশন প্রদত্ত আর্গুমেন্ট অনুযায়ী এর ডায়লগ বক্সের মধ্যে একটি Help বোতাম প্রদর্শিত হতে পারে। উক্ত ফাংশনের সিনটেক্স হল–

InputBox (Prompt[,title] [,default] [,xpos] [spos] [,helpfile, context])

টেক্সট বক্সে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার পর ব্যবহারকারী যদি OK কমান্ড বোতামে ক্লিক করে বা কী-বোর্ডে Enter করে তবে InputBox ফাংশন প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রদান করে। আর যদি ব্যবহারকারী Cancel

বোতামে ক্লিক করে তবে ডায়লগ বক্সটি পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

MsgBox ফাংশন : ব্যবহারকারীর নিকট থেকে কোনো তথ্য নেওয়ার জন্য ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তথ্য গ্রহণ করার পর এই তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্যবহারকারীকে ফলাফল বা আউটপুট প্রদান করা প্রোগ্রামের একটি প্রধান কাজ। আর এই আউটপুট প্রদানের কাজটিই MsgBox ফাংশন দক্ষতার সাথে করে থাকে। উক্ত ফাংশনের সিনটেক্স হল–

MsgBox (Message, Button, title, helpfile, context)

MsgBox ফাংশনে ব্যবহৃত ধ্রুবকসমূহ নিম্নরূপ–

ধ্রুবক	মান	বর্ণনা
vbOkonly	0	শুধু OK বোতাম প্রদর্শন করে।
vbOkCancel	1	OK এবং Cancel বোতামসমূহ প্রদর্শন করে।
vbAbortRetryIgnore	2	Abort, Retry এবং Ignore বোতামসমূহ প্রদর্শন করে।
vbYesNo Cance	13	Yes. No বোতামদ্বয় প্রদর্শন করে।
vbYesNo	4	Yes. No বোতামদ্বয় প্রদর্শন করে।
vbRetry Cancel	5	Retry এবং Cancel বোতামদ্বয় প্রদর্শন করে।
vbCritical	16	Critical Message আইকন প্রদর্শন করে।
vbQuestion	32	Warning Query আইকন প্রদর্শন করে।
vbExclamation	48	Warning Message আইকন প্রদর্শন করে।
vbInformation	64	Information Message আইকন প্রদর্শন করে।

অ্যারে ও ফাংশন

অ্যারে (Array)

-অ্যারে হল এক ধরনের চলক (variable); কিন্তু এর বিশেষত্ব হল এতে একই নামে অনেক সংখ্যক ডাটা সংরক্ষণ করা যায় যেখানে সাধারণ চলকের ক্ষেত্রে একই নামে শুধুমাত্র একটি ডাটা সংরক্ষণ করা যায়। চলকের মতোই অ্যারে ঘোষণার সময় এর নাম ও ডাটা টাইপ ঘোষণা করতে হয়। অ্যারে ঘোষণার সিনটেক্স নিম্নরূপ :

```
Dim Array_name (range) As Datatype
```

অ্যারে নামের যে বন্ধনী রয়েছে সেখানে রেঞ্জ লিখতে হয়। এই অংশটুকু ছাড়া বাকি অংশ সবই চলকের মতো লিখতে হয়। এই রেঞ্জ ঘোষণার দ্বারা চলক এবং অ্যারের মধ্যে মূল পার্থক্য সূচিত হয়। array'র নামের পর ()-বন্ধনীর মধ্যে range-এর জন্য একটা সংখ্যা লিখে নির্ধারণ করা হয় যে কোনো array-তে কয়টা স্বতন্ত্র element থাকবে।

ফাংশন (Function)

ফাংশন হল ভিজ্যুয়াল বেসিক কোডের একটি অংশ যা তথ্য গ্রহণ করে এবং নিজে নিজে এই তথ্য প্রক্রিয়া করে একটি নতুন মান বা ফলাফল প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ Aqr() একটি ভিজ্যুয়াল বেসিক ফাংশন। কোনো ধনাত্মক সংখ্যার বর্গমূল বের করার জন্য এই ফাংশন ব্যবহার করা হয়। ফাংশন যে মান প্রদর্শন করে তাকে Return Value বলা হয়।

ভিজ্যুয়াল বেসিকে বিভিন্ন ফলাফল পাওয়ার জন্য অনেক ফাংশন রয়েছে। ভিজ্যুয়াল বেসিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন হল ইনপুট/আউটপুট ফাংশন। এই ফাংশনদ্বয় নিয়ে ইনপুট-আউটপুট সংক্রান্ত নির্দেশাবলি নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন নিয়ে আলোচনা করা হল–

Val() ফাংশন : স্ট্রিংকে সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য এই ফাংশন ব্যবহার করা হয়। এই ফাংশনের সিনটেক্স হল Val (string)।

Date ফাংশন : বর্তমান তারিখ জানার জন্য এই ফাংশন ব্যবহার করা হয়। এই ফাংশনের সিনটেক্স হলো Date।

Time() ফাংশন : AM/PM ফরমেটে বর্তমান সময় জানার জন্য এই ফাংশন ব্যবহার করা হয় এই ফাংশনের সিনটেক্স হল : Time()।

Now ফাংশন : বর্তমান তারিখ এবং AM/PM ফরমেটে বর্তমান সময় জানার জন্য এই ফাংশন ব্যবহার করা হয়। এই ফাংশনের সিনটেক্স হল Now ()।

Day () ফাংশন : কোনো তারিখ থেকে দিনের সংখ্যা বের করার জন্য এই ফাংশন ব্যবহার করা হয়। এই ফাংশনের সিনটেক্স হল Day (Time)।

Month() ফাংশন : কোনো তারিখ থেকে মাসের সংখ্যা বের করার জন্য এই ফাংশন ব্যবহার করা হয়। এই ফাংশনের সিনটেক্স হল Month (Date)।

Year() ফাংশন : কোনো তারিখ থেকে বছরের সংখ্যা বের করার জন্য এই ফাংশন করা হয়। এই ফাংশনের সিনটেক্স হল Year(Date)

সারমর্ম

কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারিক কর্মসূচি (Application Program) পাওয়া যায়। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে যা পুরোপুরিভাবে কর্মসূচির সাহায্যে করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের কাজের জন্য বিশেষভাবে কর্মসূচি তৈরি করে নিতে হয়। কর্মসূচি তৈরি করতে হয় বিভিন্ন প্রকার প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা ব্যবহার করে।

প্রোগ্রামিংয়ের ভাষাকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন যান্ত্রিক ভাষা (Machine Language), এসেম্বলি ভাষা (Assembly Language) এবং উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language)। যান্ত্রিক ভাষা হচ্ছে কম্পিউটারের যান্ত্রিক ভাষা। দুটি মাত্র বর্ণ আছে; শূন্য (০) এবং এক (১)। শুধুমাত্র এ দুটি সংখ্যার সাহায্যে হিসাবের পদ্ধতিকে বলা হয় বাইনারি পদ্ধতি। কম্পিউটার এই বাইনারি পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে দেওয়া নির্দেশ বুঝতে পারে না। কিন্তু বাইনারি পদ্ধতিতে সকল কাজের নির্দেশ দেওয়া কঠিন ব্যাপার। সামান্য দুই একটি শব্দ বা সংখ্যার জন্য বিপুল পরিমাণ সংখ্যা বাইনারি পদ্ধতিতে টাইপ করার প্রয়োজন হয়। কাজেই প্রোগ্রাম তৈরি করা বা প্রোগ্রামের সাহায্যে কাজ করার জন্য যান্ত্রিক ভাষা ব্যবহার করা হয় না।

যান্ত্রিক ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরি ও নির্বাহের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য এ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language) উন্নয়ন করা হয়। এ্যাসেম্বলি ভাষার একটি সমস্যা হল যন্ত্র নির্ভরতা। অর্থাৎ একেক ধরনের কম্পিউটারের জন্য একেক রকম এ্যাসেম্বলি ভাষা ব্যবহার করা হয়। এক কম্পিউটারের এ্যাসেম্বলি ভাষা অন্য কম্পিউটারের জন্য চালানো যায় না। এ্যাসেম্বলি ভাষার এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য উচ্চ স্তরের ভাষাগুলো হচ্ছে বেসিক (BASIC) প্যাসকাল (Pascal), ফোরট্রান (Fortran), কোবল (Cobol) ইত্যাদি। উচ্চস্তরের ভাষা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। তাই উচ্চ স্তরের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য কম্পাইলার (Compiler) এবং ইন্টারপ্রেটার (Interpreter) নামক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

প্রোগ্রাম রচনা করার পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলোর গঠন নির্ধারণ করে নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্তক্রম তৈরি করে নিতে হয়। এরূপ সিদ্ধান্তক্রমকেই প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় এ্যালগরিদম (Algorithm) বলা হয়। এ্যালগরিদম বা সিদ্ধান্তক্রমের ধাপসমূহের চিত্ররূপকে প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্ট (Flowchart) বলা হয়। প্রবাহিত বা ফ্লোচার্ট হচ্ছে প্রোগ্রামের ভিত্তি। প্রবাহচিত্র বা ফ্লোচার্টের বিষয়কে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় রূপান্তরিত করাকে কোডিং (Coding) বলা হয়। প্রোগ্রাম রচনা ও উন্নয়নে সুডো কোড একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। সুডো (Pseudo) গ্রীক শব্দ। সুডো শব্দের অর্থ হচ্ছে ছদ্ম বা যা সত্য নয়। প্রোগ্রামিং-এর ক্ষেত্রেও সুডো কোড বলতে প্রকৃত প্রোগ্রামিং বোঝানো হয় না। প্রোগ্রামের ধরন ও কার্যাবলি তুলে ধরার জন্য কিছু সংখ্যক নির্দেশ বা স্টেটমেন্টের সমাহারকে সুডো কোড বলা হয়। প্রকৃত প্রোগ্রাম বা চূড়ান্ত এ্যালগরিদম তৈরির আগে সুডো কোড বা ছদ্ম প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। প্রয়োজন হলে একাধিক সুডো কোড তৈরি করা হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ডার্টমাউথ কলেজের জন কেমেনি (John Kemeny) এবং টমার্স কুর্টজ (Thomas Kurtz) মূল বেসিক প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার তৈরি করেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মাইক্রো কম্পিউটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কম্পিউটারের জন্য বেসিককেই প্রোগ্রামিংয়ের প্রমিত (Standard) ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউট (এএনএআই) ১৯৭৮ সালে বেসিকের বিভিন্ন সংস্করণের ঐক্য (Uniformity) আনার উদ্দেশ্যে বেসিকের প্রয়োজনীয় অংশগুলো প্রমিতকৃত করে।

১৯৯১ সালে বিখ্যাত সফটওয়্যার নির্মাতা কোম্পানি মাইক্রোসফট কর্পোরেশন ভিজ্যুয়াল বেসিক বাজারজাত করে। ভিজ্যুয়াল বেসিকের আগমনের ফলে প্রোগ্রামিংয়ের জটিলতা অনেক কমে যায়। এর মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল পরিবেশে, অল্প সময়ে এবং অনেক কম কোড লিখেই একটি প্রোগ্রাম করা সম্ভব। ভিজ্যুয়াল বেসিকের রয়েছে একটি শক্তিশালী Integrated Development Environment। এটি এখন একটি সর্বজন স্বীকৃত প্রোগ্রামিং পরিবেশ যা অতি সহজে ও দ্রুত নিজে নিজে চলতে পারে। এর দ্বারা যে কোনো এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল প্রোগ্রাম রচনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ–

i. সমস্যা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ
ii. প্রবাহচিত্র তৈরি
iii. ডিবাগিং ও কোডিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি ২-৪ নম্বর প্রশ্নের জন্য প্রযোজ্য]
শিক্ষার্থীদের একটি স্কুলের লাইব্রেরি প্রজেক্ট-এর কাজ ভিজ্যুয়াল বেসিক-এ করতে বলা হল–

২. ছাত্ররা চলক ঘোষণার জন্য কোন কমান্ড ব্যবহার করবে–

ক. Print   খ. MsgBox
গ. CMD   ঘ. DIM

৩. সময় বাঁচানোর জন্য কোন ধরনের অনুবাদক ব্যবহার করা সুবিধাজনক–

ক. কম্পাইলার   খ. ইন্টারপ্রেটার
গ. এসেম্বলার   ঘ. ডিবাগার

৪. ভিজ্যুয়াল বেসিকে লেখা প্রোগ্রামকে বলা হয়–

ক. সোর্স কোড   খ. অবজেক্ট কোড
গ. ইউনিকোড   ঘ. আসকি কোড

সৃজনশীল প্রশ্ন

চিত্রটি লক্ষ কর–
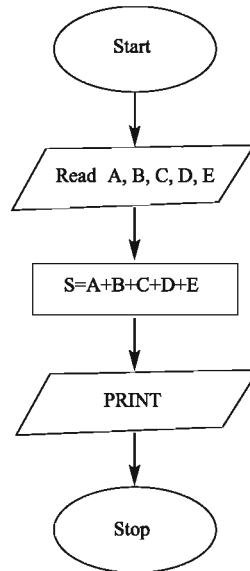
ক. প্রবাহচিত্রটি কী নির্দেশ করে?
খ. চিত্রে ব্যবহৃত ঘরের কাজ বর্ণনা কর।
গ. ১+২+৩+............+ ঘ ধারাটির যোগফল বের করার জন্য উপরিউক্ত ঘরগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে? বর্ণনা কর।
ঘ. কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ প্রবাহ চিত্র কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বিশ্লেষণ কর।

নবম অধ্যায়

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট

সনাতনী ধারণায় পার্সোনাল কম্পিউটারে (পিসি বা মাইক্রোকম্পিউটার) কাজ করার ব্যাপারটাকে কেবল ব্যক্তিগত কাজ করাকে বোঝায়। নাম থেকেই বোঝা যায় পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার মানে হল পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত কম্পিউটার। ব্যক্তিগতভাবে একক ব্যবহারের জন্য এই কম্পিউটার। বাড়িতে প্রথমে হয়ত একটি পিসি দিয়েই কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়। খুব ছোট অফিসেও একটি কম্পিউটার দিয়ে কাজ শুরু করা হতে পারে। আমাদের দেশে অনেক স্কুল কলেজ বা ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানেও একটি কম্পিউটার দিয়ে কাজ করা শুরু হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সেই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার করার আগে একটি কম্পিউটার বা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে একটি কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (সিপিইউ) নিয়ে অনেক লোক কাজ করতেন। একটি সিপিইউ ব্যবহার করতেন অনেক মানুষ বা ব্যবহারকারী। পার্সোনাল কম্পিউটার সেই ব্যবহারের ব্যাপারটিকে ব্যক্তিগত করে তোলে। কিন্তু ক্রমশই কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়ছে। কোনো একটি বাড়িতে, অফিসে বা প্রতিষ্ঠানে একটি কম্পিউটার দিয়ে কাজ শুরু হলেও কিছুদিন পরই একটি কম্পিউটারের বদলে কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাজের চাহিদাও বাড়তে থাকে। এমনকি বাড়িতেও একাধিক কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি কম্পিউটারে যখন এককভাবে কাজ করা হয় তখন তার সকল আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিই এককভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন একটি প্রিন্টার একজন ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আবার একটি প্রিন্টার বেশ কয়েকজন ব্যবহারকারী তার কাজে লাগাতে পারেন। কারণ কম্পিউটার যতই ব্যবহার করা হোক না কেন, প্রিন্টার ব্যবহার করা হয় তার তুলনায় অনেক কম সময়ের জন্য। বেশির ভাগ সময়েই একটি প্রিন্টার একজন ব্যবহারকারীকে সেবা দেওয়ার পর অলসভাবে পড়ে থাকে। অন্যদিকে প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে আলাদা আলাদাভাবে প্রিন্টার বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কিনতে হলেও ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। যদি একটি প্রিন্টার বিশ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয় এবং দশটি কম্পিউটারের জন্য দশটি প্রিন্টার কেনা হয় তাতে হয়ত ব্যয় হয়ে যাবে দুই লাখ টাকা। কিন্তু একটি বিশ হাজার টাকার প্রিন্টারকেই নেটওয়ার্ক করে বা প্রিন্টার শেয়ার করার ব্যবস্থা করে সবকটি কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করতে পারলে এক লাখ আশি হাজার টাকা বাঁচানো যায়। তাছাড়া পরস্পরের মাঝে তথ্য আদান-প্রদান করাটাও এখন ভীষণ প্রয়োজন।

আজকের দিনে ইন্টারনেট ব্যবহার করাও একটি বিরাট কাজ। ইন্টারনেটও এক ধরনের নেটওয়ার্ক। আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা বা পরস্পর তথ্য আদান প্রদান করার কাজটি যখন কোনো কম্পিউটার ব্যবস্থায় করা হয় তখন তাকে নেটওয়ার্ক বলে। আজকের দিনে এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি একটি কম্পিউটার ব্যবস্থা।

নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

নেটওয়ার্কে যুক্ত কম্পিউটারসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা থেকে কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক দুই প্রকার হতে পারে।

ক) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক

খ) ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক

যেসব নেটওয়ার্ক খুব কাছাকাছি অবস্থিত কম্পিউটারসমূহ বা যন্ত্রপাতির মাঝে করা হয়ে থাকে তাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) বলা হয়। আবার যেসব নেটওয়ার্ক দূরবর্তী স্থানসমূহের মাঝে করা হয় তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) বলা হয়। ধরা যাক, একটি ২ তলা ভবনে বিভিন্ন তলায় একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা স্থাপন করা হল। প্রচলিতভাবে একে বলা হবে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। আবার ঢাকা, চট্টগ্রাম, নিউইয়র্ক এমন তিনটি শহরের

মাঝে যদি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয় তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হবে।

একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে যার সাহায্যে সংযোগ দেওয়া হয় সেটিকে বলা হয় মাধ্যম (Media)। মাধ্যম হতে পারে দু রকম।

ক. তারের সাহায্যে

খ. বেতার ব্যবস্থায়।

সাধারণত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তারের সাহায্যে গড়ে তোলা হয়। একটি যন্ত্রের সাথে অন্য একটি যন্ত্রকে সরাসরি তারের সাহায্যে যুক্ত করা হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে সেটি তারের সাহায্যেই করা হবে, নাকি বেতার ব্যবস্থায় গড়ে তোলা হবে। তারের ব্যবস্থাটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হতে পারে। একটি উপায় হতে পারে যে কেবল কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্যই তার ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা হল। আবার টেলিফোন বা অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহৃত তারকেও কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে। বর্তমানে ওয়াইফাই, ওয়াইম্যাক্স, মোবাইল ইত্যাদি বেতার ব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এবং এর ফলে তারহীন নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের টপোলজি

টপোলজি হচ্ছে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারসমূহের অবস্থাগত এবং সংযোগ বিন্যাসের কাঠামো। টপোলজিকে তাই সাধারণভাবে নেটওয়ার্কের সংগঠন বা আর্কিটেকচার হিসাবে অভিহিত করা হয়। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের প্রধান কয়েকটি সংগঠন হচ্ছে ক) বাস সংগঠন, খ) রিং সংগঠন, গ) স্টার সংগঠন, ঘ) শাখা-প্রশাখা সংগঠন, ঙ) পরস্পর সংযুক্ত সংগঠন এবং চ) সংকর সংগঠন।

বাস সংগঠন

বাস সংগঠনে নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি একটি বাস বা ডাটা চলাচল পথের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ডাটা বাসের মাধ্যমে যে কোনো কম্পিউটার অন্য যে কোনো কম্পিউটারে সংকেত বা ডাটা প্রেরণ করতে পারে। ডাটা চলাচলের পথ অভিন্ন। তাই প্রেরিত ডাটা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রত্যেক কম্পিউটার ডাটা পরীক্ষা করে দেখে। একমাত্র যে কম্পিউটারের উদ্দেশ্যে ডাটা প্রেরণ করা হয়েছে সেই কম্পিউটারই উক্ত ডাটা গ্রহণ করে। এ ধরনের সংগঠনে প্রত্যেকটি কম্পিউটার/ডিভাইস স্বতন্ত্রভাবে ডাটা বাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে কোনো কম্পিউটার/ডিভাইস খুলে নিলে নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা ব্যাহত হয় না। আবার নতুন করে কম্পিউটার/ ডিভাইস ডাটা বাসের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেটওয়ার্কভুক্ত করা যায়। বাস সংগঠনে কোনো কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে না। কাজেই প্রত্যেকটি কম্পিউটার/ডিভাইসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয়।
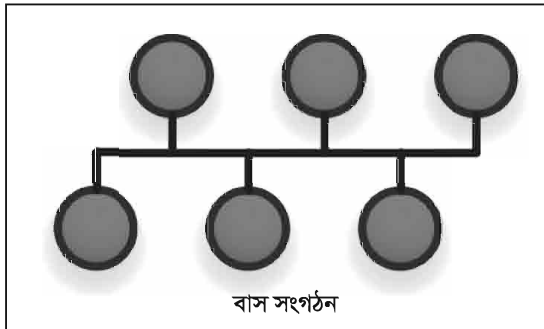
বাস সংগঠন

রিং সংগঠন

রিং সংগঠন নেটওয়ার্কের সংগঠন হচ্ছে বৃত্তাকার। এ ধরনের নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার তার দুই দিকের দুটি কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কোনো কম্পিউটার থেকে প্রেরিত ডাটা বা সংকেত বৃত্তাকারে এক কম্পিউটার থেকে পরবর্তী কম্পিউটারে ঘুরতে থাকে। প্রত্যেকটি কম্পিউটার পরিভ্রমণরত ডাটা পরীক্ষা করে দেখে। ডাটা যদি তার

রিং সংগঠন

উদ্দেশে প্রেরিত হয় তাহলে গ্রহণ করে অন্যথায় পরবর্তী কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে গ্রাহক কম্পিউটার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রেরিত ডাটা বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করতে থাকে। রিং সংগঠনের নেটওয়ার্কে নিয়ন্ত্রণকারী কোনো কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে না। কাজেই নেটওয়ার্কভুক্ত প্রত্যেকটি কম্পিউটারকেই ডাটা প্রেরণ, গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয়। এই নেটওয়ার্কের আওতায় কোনো কম্পিউটার ডাটা প্রেরণ বা গ্রহণে অপারগ হলে এ নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। এছাড়া নতুন কম্পিউটার যোগ করতে হলে সম্পূর্ণ রিং ভেঙে নতুন সংগঠন তৈরি করতে হয়। এছাড়া আরও একটি বড় অসুবিধা হল যে এই পদ্ধতিতে নেটওয়ার্ক যত বড় হয় তথ্য পারাপারের গতি তত কম হয়।
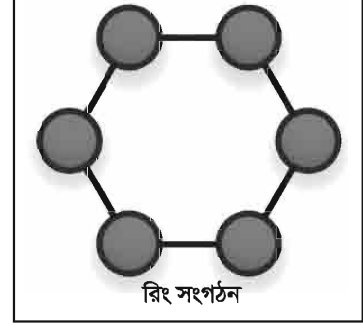
স্টার সংগঠন

স্টার সংগঠনে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে অন্যান্য কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে। এ সংগঠনের নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটাগুলো পরস্পরের মধ্যে সরাসরি সংকেত বা ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে না। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটারের মাধ্যমে এক কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সঙ্গে ডাটা বা সংকেত আদান-প্রদান করে থাকে। হোস্ট কম্পিউটার কেন্দ্রীয়ভাবে অন্যান্য কম্পিউটারের মধ্যে সংকেত ও ডাটা আদান-প্রদানের সংযোগ স্থাপন করে এবং সংকেত ও ডাটা আদান-প্রদানের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। স্টার সংগঠনের নেটওয়ার্কে হোস্ট কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিলে গোটা নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু নেটওয়ার্কভুক্ত কোনো একটি বা একাধিক কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিলে নেটওয়ার্কের কাজ শুধু ঐ সমস্যাযুক্ত কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। অন্য অংশের কাজ ব্যাহত হয় না।

স্টার সংগঠন
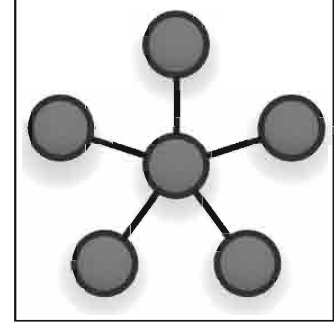
শাখা-প্রশাখা সংগঠন

শাখা-প্রশাখা সংগঠন

শাখা-প্রশাখা সংগঠন আসলে স্টার সংগঠনেরই সম্প্রসারিত রূপ। এ সংগঠনে এক বা একাধিক স্তরের কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারের সঙ্গে আবার তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার বা কম্পিউটারগুলো প্রকারান্তরে তৃতীয় স্তরের কম্পিউটারের হোস্ট হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার সরাসরি মূল কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না।
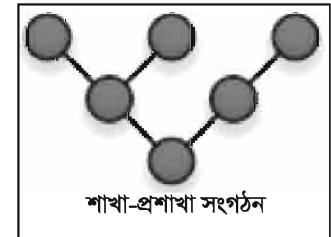
পরস্পর সংযুক্ত সংগঠন

পরস্পর সংযুক্ত সংগঠন

পরস্পর সংযুক্ত সংগঠনের নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের নেটওয়ার্কে কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে না। নেটওয়ার্কযুক্ত প্রত্যেক কম্পিউটার অন্য যে কোনো কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি স্থাপন এবং সংকেত ও ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে। এ ধরনের নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট লিংক বলে অভিহিত করা হয়।
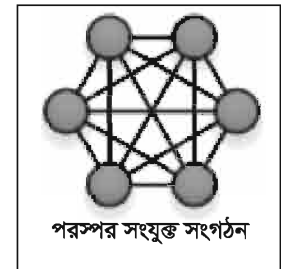
সংকর সংগঠন

সংকর সংগঠনের নেটওয়ার্কে প্রত্যেকটি সংগঠনেরই কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া যে কোনো একটি মাত্র সংগঠনের নেটওয়ার্ক কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নাও হতে পারে। এজন্য কয়েক প্রকার সংগঠনের সমন্বয়ে অনেক সময় সংকর সংগঠনের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়। রিং, স্টার এবং পরস্পর সংযুক্ত নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংকর নেটওয়ার্ক তৈরি হতে পারে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে হোস্ট কম্পিউটার/সার্ভারের সঙ্গে অন্যান্য কম্পিউটার/ওয়ার্কস্টেশন এবং প্রিন্টার, স্টোরেজ ডিভাইস ও অন্যান্য যন্ত্রাদির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য সাধারণ কো এক্সিয়াল ক্যাবল বা তার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রিং সংগঠন, পরস্পর সংযুক্ত সংগঠন ইত্যাদি সংগঠনের নেটওয়ার্কেও সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশন হিসাবেও পিসি ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের নেটওয়ার্ককে পিসি নেটওয়ার্ক হিসাবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। জেরোক্স করপোরেশনের তৈরি ইথারনেট একটি বহুল ব্যবহৃত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক পদ্ধতি। এ নেটওয়ার্কে ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার এবং যন্ত্রাদি ক্যাবলের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য কন্ট্রোলার নামক বিশেষ ধরনের সমন্বিত সার্কিট বিশিষ্ট চিপ ব্যবহার করা হয়। নেটওয়ার্কভুক্ত প্রত্যেক যন্ত্রের সঙ্গে ট্রান্সিভার নামক একটি ছোট বক্স ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সিভার ক্যাবলের মাধ্যমে ডাটা প্রেরণ করে এবং আগত ডাটা গ্রহণ করে। ইথারনেট নেটওয়ার্কে বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি কম্পিউটার এবং যন্ত্রাদি ব্যবহার করা যায়। ইথারনেটের মতোই আরও একটি বহুল ব্যবহৃত স্থানিক নেটওয়ার্ক পদ্ধতি হচ্ছে করভাস সিস্টেম-এর তৈরি অমনিনেট। এ নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতেও আইবিএম পিসি কমপাটিবল কম্পিউটার বা মেকিনটোশ কম্পিউটার ইত্যাদি পার্সোনাল কম্পিউটার একই সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

মেকিনটোশের একটি কার্যকর ও সহজ নেটওয়ার্ক পদ্ধতি হচ্ছে লোকাল টক। মেকিনটোশ কম্পিউটারে এটি একটি বেশ জনপ্রিয় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

স্থানীয়ভাবে নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য প্রথমত কম্পিউটারটির হার্ডওয়্যার এমন হতে হবে যাতে একাধিক কম্পিউটারের মাঝে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই কাজটি দুই ধরনের হার্ডওয়্যার দিয়ে হতে পারে। সচরাচর তারের সাহায্যে যদি এই ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তবে তার জন্য ব্যবহার করা হয় একটি নেটওয়ার্ক কার্ড। কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের ভিতরে এই কার্ডটি স্থাপন করা হয়। মাদারবোর্ড-এর এক্সপানশন স্লটে কার্ডটির সংযোগ দিতে হয়। এই কার্ডটিতে তারের সংযোগ দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি কম্পিউটারের সাথে অন্য একটি কম্পিউটারের সরাসরি তারের সংযোগ প্রদান করা হতে পারে। তবে যা সচরাচর করা হয় তা হল একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় কম্পিউটারের বা অন্যান্য যন্ত্রপাতির সংযোগ দেওয়ার জন্য। এই হাবগুলোতে ৮/১২/৩২ বা তার চেয়েও বেশি পোর্ট থাকতে পারে। প্রতিটি কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রের তারের সংযোগ এই হাবে প্রদান করা হয়। এছাড়াও কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক সংযোগ ওয়্যারলেস বা বেতার পদ্ধতিতে হতে পারে। এরকম পদ্ধতির জন্য একটি বেজ স্টেশন বসানো হয়। এছাড়া কম্পিউটারে একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক কার্ড এবং এন্টেনা বসানো হয়। অন্যদিকে কম্পিউটারের সংকেতকে টেলিফোনের সংকেতে এবং টেলিফোনের সংকেতকে কম্পিউটারের সংকেতে রূপান্তরিত করার জন্য কম্পিউটারে মডেম বসানো হয় এবং তার সাথে টেলিফোন লাইন, ভি-স্যাট, ফাইবার অপটিক্স লাইন ইত্যাদির সংযোগ দেওয়া হয়।

এক সময়ে কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার বা বিশেষ ধরনের নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন হত। এখন উইন্ডোজ ৯৮/২০০০ অপারেটিং সিস্টেম বা ম্যাক ওএস

অপারেটিং সিস্টেমে আলাদা কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয় না। অপারেটিং সিস্টেমকে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন প্যারামিটার দিয়ে সেটআপ করলেই কম্পিউটারের সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে। তবে একটু ভালো ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সার্ভার সফটওয়্যার বা অপারেটিং সিস্টেমের সার্ভার সংস্করণ এবং ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়।

ওয়াইফাই ডিভাইস

ওয়াইফাই
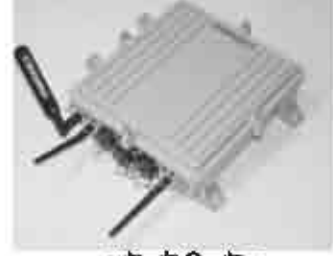
ওয়াইফাই হচ্ছে এমন এক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যার সাহায্যে নির্দিষ্ট ক্ষুদ্রায়তনের এলাকায় তারবিহীন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যায়। এই ব্যবস্থায় ওয়াইফাই জোনের যে কোনো স্থান থেকেই কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপিত হতে পারে।

ব্লুটুথ

ওয়াইফাইয়ের মতোই ক্ষুদ্রায়তনের মাঝে ব্লুটুথ নামক তারবিহীন নেটওয়ার্ক স্থাপিত হতে পারে। এই ব্যবস্থায় মোবাইল ও ইন্টারনেট একই সাথে কাজ করতে পারে।

ওয়াইড এরিয়া বা দূরবর্তী নেটওয়ার্কের যন্ত্রপাতি

দূরবর্তী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার জন্য সরাসরি তারের সংযোগ, ভি-স্যাট, ওয়াইম্যাক্স, ওজি ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফাইবার অপটিক্স ক্যাবলের সংযোগ সবচেয়ে দ্রুতগতির। ওয়াইম্যাক্স এবং ওজি পদ্ধতিতে ব্রডব্যান্ড পর্যায়ের তথ্য পারাপার ব্যবস্থা স্থাপিত হতে পারে।

ইন্টারনেটের ধারণা ও ইতিহাস

ইন্টারনেট (Internet)-এর শব্দগত বিশ্লেষণ করলে তাকে International Network-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে পাওয়া যায়। আর এর কার্যগত বিশ্লেষণে গেলে এটি হল নেটওয়ার্কসমূহের নেটওয়ার্ক। LAN, MAN, WAN, ISDN ইত্যাদি বেশ কিছু নেটওয়ার্ক সিস্টেম বহুদিন ধরে সীমিত পরিসরে বা অপেক্ষাকৃত বড় পরিসরে তথ্য আদান-প্রদান সৃষ্টি করে আসছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন– কর্পোরেশন, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্থা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সিস্টেম ব্যবহার করে আসছে। এক পর্যায়ে টেলিফোন ও স্যাটেলাইট, অর্থাৎ টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা কম্পিউটারের সাথে একীভূত হয়ে যেতে থাকলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ তাদের নেটওয়ার্কের বৃত্তকে আরও বৃহৎ করার প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন। এ অবস্থায় ৯০-এর দশকের শুরুতে ভিন্ন দেশের প্রধান শহরে স্থাপিত সার্ভারগুলো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত হতে থাকলে কম্পিউটারে ব্যাপক ভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের এক নতুন দুয়ার খুলে যায় এবং তা রাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে। এ প্রক্রিয়ায় তথ্য আদান-প্রদান করা সহজ ও অতি সস্তা হয়ে পড়লে অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৯৪ সালে তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের এ ব্যবস্থাটি ইন্টারনেট নামে অভিহিত হতে শুরু করে। ইন্টারনেটকে আজ বিশ্ব নেটওয়ার্ক বা নেটওয়ার্কসমূহের নেটওয়ার্ক যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন এর রূপ প্রতিনিয়তই মানুষের নিকট স্পষ্ট হচ্ছে। এমন একদিন সম্ভবত বেশি দূরে নয় যখন এটি অনেকগুলো প্রচলিত ব্যবস্থাকে চিরতরে ইতিহাসে পরিণত করে দেবে।

ইন্টারনেট সার্ভার

আজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার মানুষ তার নিজ নিজ পেশা সম্পর্কে বিস্তারিত ও সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। ব্যবসায়ীরা অতি অল্প খরচে ও সহজে তাদের তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সহজে ও চাওয়ামাত্র বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে এবং শিক্ষা অর্জন করতে পারছে।

আর এই বিশাল তথ্য বিপ্লব নীরবে নিভৃতে ঘটে যাচ্ছে। এর ব্যাপক ব্যবহারের শুরু হিসাবে ১৯৯০ সালকে চিহ্নিত করা হলেও এর প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ হয় ১৯৬৯ সালে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দফতর সে বছর Advance Research Projects Agency Network (ARPAnet) চালু করে। এটিই কম্পিউটার নেটওয়ার্কের জগতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। শুরুতে বিষয়টি প্রতিরক্ষার সাথে যুক্ত থাকলেও কালক্রমে তা আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণের পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি তারা এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একজন অন্যজনের কম্পিউটারে রক্ষিত প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার চালাতে সক্ষম হয়।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে ইন্টারনেট প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা। একটি কপিরাইটের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত এবং সম্ভবত এ কারণেই অনেকটা নীরবে ও নিভৃতে এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে চলেছে।

ইন্টারনেটের প্রচলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হলেও তা কিন্তু বিশৃঙ্খল বা একেবারে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে হচ্ছে না। এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে এটি ব্যবহার করার নিয়ম-কানুন। যেমন– যিনিই ইন্টারনেটের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হতে চান তার প্রয়োজন হয় একটি বিশেষ পরিচয় বা ঠিকানার। এ ঠিকানা নির্দিষ্ট ফি প্রদান করে আমেরিকার নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ইন্টারনেটে কিছু অভ্যন্তরীণ নিয়ম-নীতিরও উদ্ভব ঘটেছে। এ নিয়ম-নীতিগুলোকে কমিউনিকেশন প্রটোকল বলা হয়। এরূপ ২টি প্রটোকল হলো ১) UUCP, 2) PCP/IP (UNIX to UNIX Copy Program)। PCP/IP দিয়েই ইন্টারনেট প্রথম কাজ শুরু করে। এর মাধ্যমে ডাটা, ভয়েস ও গ্রাফিক্স ইত্যাদি সকল ধরনের তথ্যই আদান প্রদান করা যায়। কিন্তু এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে আর তা হল তথ্য গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে যত পথ অতিক্রম করতে হয় তার সবই নির্দেশ (Command) দানের সময় উল্লেখ করতে হয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি এর তুলনায় অনেক সহজ। PCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) পদ্ধতিতে তথ্য পাঠাতে হলে শুধু গন্তব্যস্থানের ঠিকানা দরকার। যদিও এ দুটি প্রটোকলে তথ্যের স্থানান্তর একই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। তবু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রথমটি অপেক্ষা ব্যবহারকারীদের জন্য অধিকতর সহজ। তবে এ সমস্ত প্রটোকল ব্যবহার করতে গিয়ে কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিলে ঐ অবস্থায় একটি (Gateway) বসিয়ে দেওয়া হয়। তবে ব্যবহারকারীদের সাথে এই PCP/IP বা Gateway-এর সরাসরি কোনো যোগাযোগ থাকে না। ব্যবহারকারী যে যোগাযোগ সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করে সেগুলোই যথাযথভাবে যখন যা করার প্রয়োজন তা ব্যবহারকারীদের অলক্ষ্যেই করে যায়। ১৯৯০ সালে ইন্টারনেটের কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৯৪ সালের পূর্বে তাকে এ নামে ডাকা হত না। ১৯৯৪ সালেই প্রথম ইন্টারনেট শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং তা ব্যাপকভাবে পরিচিত হতে থাকে। তখনও ইন্টারনেট ইউরোপ-আমেরিকার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করেনি। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই ইন্টারনেট সেই সীমা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী এর জাল বিস্তার করতে শুরু করে। আজ বিশ্বব্যাপী টেলিফোন, ফ্যাক্স বা চিঠি প্রেরণ, ডাটা করফারেন্সিং, মার্কেটিং, শিক্ষা, গবেষণা, অফিস ব্যবস্থাপনা, টিভি সম্প্রচার, প্রতিরক্ষা অথবা চিকিৎসা অথবা সকলকে ইন্টারনেট একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে এবং তথ্যের মহাসড়ক (Information Super Highway) নামে এক ব্যাপক ভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যম শীর্ষ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ফলে পৃথিবীর বড় বড় লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, প্রতিরক্ষা দফতর, স্টক এক্সচেঞ্জ অগণিত ব্যক্তিগত স্থাপনা আজ পরস্পরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়েছে। তাই যেখানেই যে কেউ থাকুক না কেন একটি কম্পিউটার ও টেলিফোন

সংযোগের সাহায্যে এ তথ্যের মহাসরণি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড় করে নিতে পারছে অত্যন্ত দ্রুত ও কম খরচে।

ইন্টারনেট ভিত্তিক কম্পিউটার তথ্য ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই একটি Global Information Infrastructure (GII) গড়ে তুলছে। বিশ্বের সব ধরনের তথ্য ব্যবস্থাই এই GII-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই উন্নত বিশ্ব এই সুপার হাইওয়েতে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। অস্তিত্বের প্রশ্নেই আজ উন্নয়নশীল বিশ্বও এর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। বলা যায় GII সকলের সামনেই তথ্য প্রবাহের এক নতুন দুনিয়া খুলে দিয়েছে। যেখানে সম্পদের স্বল্পতা ও অন্যান্য কারণে ছাত্র-গবেষক ও পেশাদারগণ তাদের জ্ঞান ও শিক্ষাকে বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছে না, সেখানে GII তার সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে সে অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে। আজ কোনো বই বা তথ্য পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে এবং খুবই অল্প মূল্যের বিনিময়ে যে কেউ তা নিজের কম্পিউটারে নিয়ে আসতে পারছে GII-এর কল্যাণে।

ইন্টারনেট ডকুমেন্ট

Webpage, Gopher, FTP file ইত্যাদিকে ইন্টারনেট ডকুমেন্ট বলা হয়। এ সমস্ত ডকুমেন্টের আলাদা আলাদা ঠিকানা রয়েছে। ঠিকানা দেখেই বলে দেওয়া যায় কোনটি কোন ধরনের ডকুমেন্ট। এ সমস্ত ঠিকানাকে আশ্রয় করে কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট ডকুমেন্টে পৌঁছে যেতে পারেন। এ সমস্ত ঠিকানাকে বলা হয় Uniform Resource Locator (URL)। এ ঠিকানার প্রথম অংশ ইন্টারনেট ফরমেট বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা ব্রাউজারের Resource পাওয়ার পথ বর্ণনা করা হয়। এরূপ ১০ প্রকার বা তার চেয়েও বেশি প্রচলিত ফরমেট রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত তিনটি হল– World Wide Web. এর জন্য http: প্রটোকল, গোফার মেনু বা ডকুমেন্টের জন্য Gopher এবং FTP ফাইলসমূহের জন্য ftp ইত্যাদি। অতঃপর কোলন (:) চিহ্নের পর ২টি ফরওয়ার্ড পেস (//) থাকে। এরপরের অংশটি হল ইন্টারনেট ঠিকানা এবং তা (,) চিহ্ন দিয়ে তিনভাগে বিভক্ত থাকে। প্রথম অংশ ইন্টারনেট ডকুমেন্ট ধারণকারী কম্পিউটারে সেকশনকে বোঝায় যেমন ww.,gopher. বা ftp ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশ হোস্ট সার্ভার বা যেখানে তথ্য থাকে তার নাম বা পরিচয় এবং তৃতীয় অংশ দিয়ে বুঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন– com দ্বারা Commercial বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় এবং .org দ্বারা কোনো অবাণিজ্যিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বা Organization বুঝায়। এ ঠিকানার আরেকটি অংশ রয়েছে যা সর্বশেষে যুক্ত হতে দেখা যায়। আর তা হল ২টি ইংরেজি অক্ষরের সমাবেশে কোনো দেশের পরিচয়। যেমন .sg দিয়ে সিঙ্গাপুরকে বুঝায়।

নেটিজেন

নেটিজেন (Natizen) শব্দটির সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয় না থাকলেও সিটিজেন শব্দটির সাথে সকল শিক্ষিতজনই পরিচিত। সিটিজেন বা নাগরিক হল কোনো দেশের আইনগত অধিবাসী যিনি সেই দেশের পাসপোর্ট ও অন্যান্য বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হয়ে থাকেন। তদ্রুপ সিটিজেনশিপের মতোই ইন্টারনেটের একাউন্ট গ্রহণকারীদের আজকাল নেটিজেনশিপ গ্রহণকারী বলা হচ্ছে। আর এই নেটিজেনদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আর এ যেন অনেকটা আন্তর্জাতিক নাগরিকত্ব লাভ।

ইন্টারনেট সংযোগ নিতে যা যা প্রয়োজন হয়

যিনি ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করতে চান তাকে অবশ্যই এতদসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং প্রোগ্রাম সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। একটি ইন্টারনেট সংযোগ নিতে হলে কী কী সামগ্রীর প্রয়োজন হয় এবং এর মধ্যে কোনটি ব্যবহার করলে খরচ কম হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে।

কম্পিউটার : একটি বর্তমান মানের কম্পিউটার হলেই ইন্টারনেট চালানো যাবে। অধিকতর উচ্চ গতি সম্পন্ন কম্পিউটার ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক।

মডেম : মডেম হল ডিজিটাল থেকে এনালগ (মডুলেশন প্রক্রিয়া) এবং এনালগ থেকে ডিজিটাল (ডিমডুলেশন প্রক্রিয়া) সংকেত পরিবর্তনকারী একটি যন্ত্র। MODEM শব্দটি Modulator ও DEModulator শব্দদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইন্টারনেট সংযোগের জন্য তাই মডেম একটি অতি প্রয়োজনীয় ডিভাইস বা যন্ত্র। এই মডেম এক্সটারনাল বা ইন্টারনাল যে কোনোরূপ হতে পারে। মডেমসমূহ সাধারণত ১৪.৪, ২৮.৮, ৩৩.৬ এবং ৫৬ কেবিপিএস গতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। যদিও এক্সটারনাল মডেম বেশি প্রচলিত। তবে ইন্টারনাল মডেমও ব্যবহার করা যায়। দামের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল মডেম অনেক সস্তা। এর জন্য আলাদা এডাপটার প্রয়োজন হয় না। এছাড়া এটি বাড়তি স্থান জুড়ে থাকে না এবং এর জন্য ভিন্ন কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ বা সিরিয়াল ক্যাবলের প্রয়োজন হয় না। এটি মাদারবোর্ডের এক্সটেনশন স্লটে লাগাতে হয়। তবে কেউ যদি একটি মডেম একাধিক কম্পিউটারে ব্যবহার করতে চান তবে তার জন্য এক্সটারনাল মডেমই উত্তম। এক্সটারনাল মডেমের আরেকটি সুবিধা হল এর রয়েছে বিভিন্ন স্ট্যাটাস বাতি, যাদের সাহায্যে মডেমটি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত কিনা, ডাটা গৃহীত কিংবা প্রেরিত হচ্ছে কিনা এসব বিষয় জানা যায়। অল্প সংখ্যক সাধারণ মেইল ও ফ্যাক্সের জন্য ১৪.৪ কেবিপিএস-এর মডেমই যথেষ্ট। কেউ যদি অনেক ডাটা প্রেরণ করতে চান তবে ২৮.৮ কেবিপিএস বা তার অধিক গতি সম্পন্ন মডেম তার জন্য উপযোগী।

টেলিফোন লাইন : ইন্টারনেটের জন্য সাধারণত ডিজিটাল টেলিফোন উপযোগী। টেলিফোন লাইন যদি অপেক্ষাকৃত উচ্চগতি সম্পন্ন হয় তবে খুবই ভালো। এখন অবশ্য নতুন সকল টেলিফোন সংযোগই ডিজিটাল পদ্ধতির।

সফটওয়্যার : ইন্টারনেটে ওয়েব ব্রাউজিং ও ই-মেইল করার জন্য বিশেষ সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়। যেমন– Netscape Communicator, Interner Explorer, Eudora Pro, Outlook Express ইত্যাদি।

আইএসপি : এটি হল Internet Service Provider (ISP) বা ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী কোনো সংস্থা। তাদের কাজ হল সাধারণ গ্রাহককে ইন্টারনেটের সংযোগ ও এ সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা প্রদান করা। সাধারণত আইএসপিদের নিজস্ব ASAT এবং সার্ভার থাকে। বাংলাদেশে Internet-এর সেবা প্রদানকারী এরূপ কিছু ISP হল আইএসএন, গ্রামীণ সাইবার নেট, প্রশিকা নেট, ব্র্যাক বিডি মেইল, প্রদেস্টা নেট, অগ্নি সিস্টেমস, বিওএল কায়েফ নেট, ফস্ট নেট ইত্যাদি। এরা নির্দিষ্ট একটি ফির বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একটি ঠিকানা প্রদান করে। এই সদস্য ফি ছাড়াও ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

মোবাইল ইন্টারনেট

বর্তমানে বাংলাদেশেও ব্যাপকহারে মোবাইল ইন্টানেটের ব্যবহার হচ্ছে। কোনো কোনো মোবাইল সেট জিপিআরএস বা সিডিএমএ সমর্থিত হলে সে সব সেট দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। আবার মোবাইল ফোনকে মডেম হিসেবে ব্যবহার করেও কম্পিউটার দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথ কম হলেও ৩জি নেটওয়ার্কে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পাওয়া যায়।

নেটওয়ার্ক ঠিকানা

যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হতে আগ্রহী হলে তাঁর একটি ইন্টারনেট একাউন্ট বা ঠিকানা থাকা আবশ্যক। আর এই একাউন্ট বা ঠিকানাটি ইন্টারনেট, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও অন্যান্য ইন্টারনেট ডকুমেন্টের পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি। সকল নেটওয়ার্ক ঠিকানা যুক্তরাষ্ট্রের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ বা ডাইরেক্টরির মধ্যে সংরক্ষিত আছে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারীগণ এই ডাইরেক্টরি ব্যবহার করে বিশ্বজোড়া তাদের কোটি কোটি গ্রাহককে ইন্টারনেট সার্ভারে যুক্ত হওয়ার সুবিধা প্রদান করে আসছে। শুরুতে কিছু শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেট ডাইরেক্টরি ও মূল সার্ভারমূহ নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে ইন্টারনেট যখন দ্রুত জনপ্রিয় হতে থাকে তখন

যুক্তরাষ্ট্রের National Science Foundation (NSF) তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারনেটের বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে দেয়। এর মধ্যে Network Solution ঠিকানাসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও মূল ডাইরেক্টরি নিয়ন্ত্রণ, AT&T ডাইরেক্টরিসমূহের মধ্যে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) সংযোগ এবং Genera Actomic (GA) কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। এরপর এ তিনটি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টার বা INTERNIC প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি থেকে ইন্টারনিক তার কার্যক্রম শুরু করে। যে কেউ ১০০ ডলারের বিনিময়ে Network Solution-এর নিকট থেকে একটি নেটওয়ার্ক ঠিকানা গ্রহণ করে ২ বছরের জন্য রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে পারে। পরবর্তী সময়ে সে এ রেজিস্ট্রেশন অব্যাহত রাখতে আগ্রহী হলে প্রতি বছর তাকে ৫০ ডলার ফি প্রদান করতে হয়। নেটওয়ার্ক সলিউশন এভাবে একটি প্রধান ইন্টারনেট ডাইরেক্টরি গড়ে তোলে। এ প্রতিষ্ঠান এটাও নিশ্চিত করে যে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একটি একক ও অনন্য ঠিকানা থাকবে। অর্থাৎ একই ঠিকানা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হবে না। উক্ত প্রধান ডাইরেক্টরি থেকে প্রতিনিয়ত তথ্যসমূহ ৯টি মূল সার্ভারে প্রেরিত হচ্ছে ISP এবং অন্যান্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ এসমস্ত সার্ভার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এই ঠিকানা বরাদ্দ করে।

WWW: (WORLD WIDE WEB)

সুইজারল্যান্ড CERN-এর বিজ্ঞানীগণ তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্মের বিস্তারিত বিবরণ, গ্রাফিক্স ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাদি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে একটি বিশেষ তথ্য আহরণ ও সেবা প্রদান ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তাদের উদ্ভাবিত এই ব্যবস্থাই পরবর্তীতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একে সংক্ষেপে শুধু ওয়েবও বলা হয়। এর মাধ্যমে ভ্রমণ করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে তথ্যভাণ্ডার রয়েছে তার যে কোনোটিতে পৌঁছে যেতে পারেন। সাধারণ টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও বা ভিডিও যেভাবেই এর তথ্যসমূহ সংরক্ষিত থাকুক না কেন ওয়েব সাইট ব্যবহারকারীগণ নিজের কম্পিউটারের পর্দায় তা অরিজিনাল অবস্থায় উপস্থাপন করতে পারেন। একে ইন্টারনেটের মাল্টিমিডিয়াও বলা হয়।

ওয়েবে কাজ করার জন্য কিছু বিশেষ সফটওয়্যারের দরকার হয়। এগুলোকে ওয়েব সফটওয়্যার বা ব্রাউজার বলা হয়। এ সমস্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঠিকানা উল্লেখ করে মুহূর্তের মধ্যে আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেস থেকে কোনো বই পড়া যায়। পরবর্তী মুহূর্তেই লন্ডনের কোনো কম্পিউটার দোকানের ওয়েব সাইটে প্রবেশ করা যায়। আবার ইচ্ছে করলে পরবর্তী মুহূর্তেই টোকিওর কোন ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানির উৎপাদিত সামগ্রী সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা যায়। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল যোগাযোগ মাধ্যমের এ ব্যবস্থাটিকে যোগাযোগ ও তথ্য আহরণের এক বিস্ময়কর পর্যায় উন্নীত করেছে।

উল্লিখিত ওয়েব সাইটে কাজ করার জন্য বিশেষ সফটওয়্যার অর্থাৎ ব্রাউজারের প্রয়োজন হয়। ১৯৯৩ সালে মার্ক এন্ড্রিস মোকাইক নামের একটি ব্রাউজার প্রথম তৈরি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সুপার কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন এই ব্রাউজারটি বাজারজাত করে। বলা যায়, এটি বাজারে আসার পরই 'ওয়েব' জনপ্রিয়তার এক বিশেষ স্তরে প্রবেশ করে। যখন দেখা গেল মানুষ ব্যাপকভাবে ওয়েবের ব্যবহার করছে তখন মানুষের নিকট তথ্য পৌঁছে দেওয়ার সহজ উপায় হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ওয়েবে হোম পেজ-এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রতিনিয়তই জুড়ে দিচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের উন্নত অংশ তো বটেই, এমনটি পশ্চাদপদ অংশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহও তাদের কোনো তথ্য প্রচারের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসাবে ওয়েবকে বেছে নিচ্ছে। এভাবে প্রতিদিন ওয়েব সাইটের সাথে মানুষের সংশ্লিষ্টতা বেড়েই চলেছে।

ওয়েব নিয়ে আলোচনার এ পর্যায়ে 'হাইপার টেক্সট' নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। হাইপারটেক্সট এমন একটি

তথ্য উপস্থাপনের পদ্ধতি যা অন্য তথ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। ধরা যাক, কেউ ওয়েবে কম্পিউটার সম্পর্কে একটি আলোচনা দেখছেন। এক পর্যায়ে তিনি দেখতে পারেন প্রিন্টার শব্দটি অন্য কোন রঙে প্রদর্শিত হয়েছে এবং এটি আন্ডারলাইন করা আছে। এ অবস্থায় তিনি যদি এ শব্দটির উপর মাউসের বোতামে ক্লিক করে তবে তাঁর সামনে প্রিন্টার সম্পর্কিত তথ্যসমূহও হাজির হয়ে যাবে। আবার প্রিন্টারের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এরূপ আরও লিংক বা সংযোগের সন্ধান পেতে পারেন। যে প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এরূপ হাইপার টেক্স ডকুমেন্ট পড়া যায় তার নাম হল ব্রাউজার। আর এ সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ওয়েবে বিচরণ করার নাম হল ব্রাউজিং। এক Link থেকে অন্য Link-এ গমন করার নাম নেভিগেশন। বিভিন্ন হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টকে কোনো বিষয়বস্তুর শুরুতেই একটি তালিকার আকারে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এই তালিকাটিকে Home Page বলে। এরূপ টেক্সট লেখার জন্য HTML বা 'হাইপার টেক্স মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ' ব্যবহার করা হয়। এরূপ ডকুমেন্টে শুধুমাত্র লেখাই থাকবে এমন নয়। এরূপ একটি ডকুমেন্টে যেমন থাকতে পারে কোনো গ্রাফ, গ্রাফিক্স, স্থিরচিত্র বা চলমানচিত্র, তেমনি থাকতে পারে এগুলোর সম্মিলিত রূপ। যে হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টে এমন বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহৃত হয় সে ডকুমেন্টকে হাইপার মিডিয়া বলা হয়। এছাড়া ইন্টারনেট যে প্রটোকলের অধীনে এ সমস্ত হাইপার টেক্সট আদান প্রদান করে তাকে HTML বা হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল বলা হয়।

তথ্যের মধ্যে লিংক স্থাপনের ক্ষমতা ওয়েব তার ব্যবহারকারীদের নিকট এত জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান একটি কারণ। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় কোনো স্থানে পৌঁছতে এই লিংক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো টেকনিক্যাল বিষয়ের সম্মুখীন হন না। শুধুমাত্র মাউসের একটি ক্লিকের মতো নির্দেশ পেয়েই ব্রাউজার ব্যবহারকারীকে তার ঈপ্সিত তথ্যের নিকট পৌঁছে দেয়। এর ফলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সময় অচিন্তনীয়ভাবে বেঁচে যায়।

ব্রাউজার ব্যবহারকারীকে কোনো ওয়েব সাইটে পৌঁছতে হলে ব্রাউজার উইন্ডোর নির্দিষ্ট স্থানে (Location box) ঠিকানা টাইপ করতে হয়। কম্পিউটারের ভাষায় এরূপভাবে ইন্টারনেটে প্রবেশ করাকে log on বলা হয়।

ওয়েব পেজ ও অন-লাইন এ্যাপ্লিকেশন

শুরুতে ওয়েব পেজ একটি সাদা কাগজ ও কিছু সাধারণ টেক্সট ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। এরপর পর্যায়ক্রমে ওয়েব পেজে গ্রাফিক্স, অডিও এবং ভিডিও যোগ হয়। বর্তমানে অন-লাইন এ্যাপ্লিকেশনের যুগ চলছে। এ এ্যাপ্লিকেশন কী? কেউ একটি কম্পিউটার কিনতে চায়। তখন সে ইন্টারনেটে কোনো একটি কম্পিউটার দোকানের ওয়েব পেজে গেল। অতঃপর ওয়েব পেজে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন কোম্পানির মাদারবোর্ড, মাইক্রোপ্রসেসর, র‌্যাম, মনিটর, সিডি ড্রাইভ, কার্ড ইত্যাদি থেকে পছন্দসই কম্পোনেন্টগুলো নিয়ে সে নিজেই অন-লাইনে একটি ভার্চুয়াল কম্পিউটার তৈরি করল। এতদসঙ্গে সে এর মূল্যটাও দেখে নিল এবং হিসেব-নিকেশ করে পছন্দমতো কনফিগারেশন ঠিক করে সেই দোকানের ওয়েব পেজে পাঠিয়ে দিল। যদি তার ক্রেডিট কার্ড থাকে তবে ওয়েব পেজেই মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে ফর্মালিটিজ সম্পন্ন করল। এভাবে দোকানে স্বশরীরে উপস্থিত না হয়েও কেউ ওয়েব পেজের মাধ্যমে একটি কম্পিউটার বা অন্য যে কোনো সামগ্রী ঘরে বসেই পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ওয়েব পেজে যে কাজটি করল তাই অন-লাইন এ্যাপ্লিকেশন।

Web Browsing করার পদ্ধতি

Browse-এর অর্থ হল 'উপভোগের নিমিত্ত বইয়ের এখানে-ওখানে পড়া।' কিন্তু কম্পিউটারে Browse-এর অর্থ কিছুটা ভিন্ন। আর তাহল 'কোনো লিস্ট থেকে কোনো কিছু খোঁজ করা।' আর ইন্টারনেটে Browsing মানে হচ্ছে ওয়েব পেজ থেকে অন্য ওয়েব পেজে ভ্রমণ করা।' ইন্টারনেটে Web Browsing করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ওয়েব পেজসমূহে দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এ কাজের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়।

এগুলোর মধ্যে Netscape Communicator, Internet Explorer ইত্যাদি অধিক প্রচলিত। Netscape Communicator সফটওয়্যারের মাধ্যমে কীভাবে কাজ করা যায় সে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কোনো Web Page ওপেন করতে হলে প্রথমে ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হয়। এরপর Network আইকনে ডবল-ক্লিক করলে Web Page-এর ঠিকানা লেখার জন্য একটি ডায়লগ বক্স আসে। তার Location ঘরে কোনো একটি Web Page-এর ঠিকানা লিখে Enter দিলে দেখা যাবে Status Bar-এ একের পর এক Web Side Found, Waiting for reply, Connect to host ইত্যাদি লেখা আসছে। অতঃপর কম্পিউটারে ডাটা আসা শুরু হলে Status Bar-এ দেখা যাবে কত পার্সেন্ট ডাটা ওপেন হচ্ছে। ওয়েব পেজটি সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটার এসে গেলে তা Off line-এ বসে পড়া ভালো। কারণ যতক্ষণ ব্যবহারকারী On Line-এ থাকবে ততক্ষণ তার বিল উঠতে থাকবে। অথচ Web Page টি নিজের কম্পিউটারে সেভ করে তা Off line-এ বসে দেখা সম্ভব।
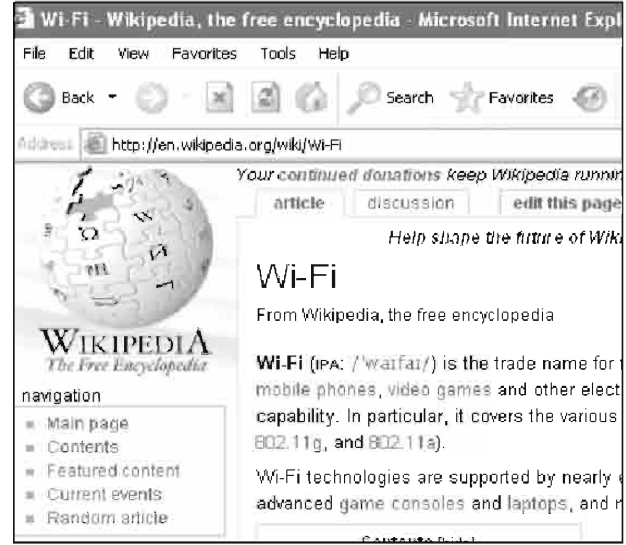
Web Page-এ কাজ করার সময় এক পৃষ্ঠা থেকে অপর পৃষ্ঠায় যাওয়া যায়। টুলবারের Forward বোতামে ক্লিক করলে পরবর্তী পৃষ্ঠায় এবং Back বোতামে ক্লিক করলে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় যাওয়া যায়। একেবারে শুরুতে ফিরে আসতে হলে Home বোতামে ক্লিক করতে হয়। কোনো Link-এর উপর কার্সার এলে এটি হাতের ন্যায় দেখাবে। তখন সেই Link-এর উপর ক্লিক করলে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

বুকমার্ক তৈরি করা

ব্যবহারকারী বারবার ব্যবহৃত ওয়েব ঠিকানাসমূহ যাতে প্রতিবার কাজের সময় টাইপ করতে না হয় এ জন্য বুকমার্ক তৈরি করে সেখানে সেগুলো রেখে দেওয়া যায়। বুকমার্ক তৈরি করার সহজ উপায় হল যে ওয়েব সাইট লোড হচ্ছে তা সম্পূর্ণ হওয়ার পর বুকমার্ক মেনুতে গিয়ে Add Bookmark-এ ক্লিক করা। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে ওয়েব সাইটের বুকমার্ক তৈরি হয়ে যাবে। বুকমার্ক তৈরি করার ২য় পদ্ধতি হল Window মেনু থেকে বুকমার্ক সিলেক্ট করা। তখন বুকমার্ক ডায়লগ বক্স দেখা যাবে। এ ডায়লগ বক্সে 'আইটেম'-এর 'ইনসার্ট'-এ ক্লিক করলে 'বুকমার্ক প্রপার্টি' ডায়লগ বক্স আসবে। তাতে ওয়েব পেজের নাম ঠিকানা, ইত্যাদি টাইপ করে OK করলে বুকমার্ক তৈরি হবে। এভাবে সংযোজিত ঠিকানাসমূহ বুকমার্ক মেনুর নিচে প্রদর্শিত হয়।

Web Search করার পদ্ধতি

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে Web Page-এর বিশাল ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে। এ সমস্ত Web Page-এ রয়েছে বিভিন্ন তথ্য ও ডাটা। কোনো ব্যবহারকারীর পক্ষেই জানা সম্ভব নয় যে কোনো বিষয়ের তথ্য পৃথিবীর কোথায় কোথায় জমা আছে। এ বিষয়ে ব্যবহারকারীকে সাহায্য করার জন্য Web-এ খুঁজে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। দুভাবে এ খোঁজার কাজটি করা যায়। প্রথমত Toolbar থেকে Search বোতামে ক্লিক করে এবং দ্বিতীয়ত Location ঘরের কোনো Search Engine-এর ঠিকানা টাইপ করে। Search Engine হল এমন কিছু ওয়েব পেজ যেগুলো ব্যবহারকারীর পক্ষে থেকে তার প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে বের করে দেয়। এরূপ কিছু Search Engine হল Yahoo.com, Altavista.com,

Weberawler.com ইত্যাদি। তবে Yahoo.com খুবই জনপ্রিয় একটি সার্চ ইঞ্জিন। যদি এ সার্চ ইঞ্জিনটি দিয়ে কোনো কিছু খুঁজতে হয় তবে Location-এর ঘরে http://www.yahoo.com টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই YAHOO! ওয়েব পেজ কম্পিউটারের পর্দায় আসবে। দেখা যাবে পেজটির মধ্যে একটি খালি বক্স আছে এবং তার পাশে Search লেখা আছে। এ বক্সে প্রয়োজনীয় সার্চ করার বিষয়টি টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিলে দেখা যাবে Yahoo! Category Matches (1-20 of....) শিরোনামে ওয়েব পেজ এসেছে। এখানে টাইপকৃত বিষয়ের উপর অনেকগুলো ওয়েব পেজের নাম থাকবে। এগুলোতে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

ই-মেইল (E-Mail)

ই-মেইল হল ইলেক্ট্রনিক মেইল (Electronic Mail)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর কাজ হচ্ছে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা ফ্যাক্স মেশিনে তথ্য পাঠানো। ১৭৮৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কৃত হওয়ার পর দূরবর্তী যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মাত্রা যোগ হয়। অতঃপর টেলেক্স, ফ্যাক্সসহ আরও বেশ কিছু যোগাযোগ ব্যবস্থা ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ই-মেইল যোগাযোগের ধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে তা অন্য কোনোটি পারেনি।

এটা যেমন দ্রুততর, তেমনি বিশ্বস্ত ও সাশ্রয়ী। বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ যেখানে টেলিফোন বা ফ্যাক্সে মিনিটে ৫০ টাকার ওপর খরচ হয় সেখানে ই-মেইলে খরচ হয় মাত্র ৩ টাকা। ইন্টারনেটে সংযোগ স্থাপন করে দেশে কিংবা বিদেশে যে কোনো ঠিকানায় E-Mail পাঠানো যায়। পাঠানো ই-মেইলটি প্রেরকের ISP সার্ভারে রক্ষিত Mail Box-এ জমা হয়। অতঃপর প্রাপক যখন Mail Check করে তখন তা কম্পিউটারে চলে আসে।

E-Mail ঠিকানা

E-Mail ঠিকানা হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগযোগ করার একটি পরিচয়। যেমনভাবে কারও নিকট কোনো চিঠি পৌঁছতে হলে তার একটি পোস্টাল ঠিকানা থাকা প্রয়োজন বা টেলিফোন কল পেতে হলে একটি টেলিফোন নাম্বার থাকা দরকার, তেমনই E-Mail-এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে হলে একটি E-Mail ঠিকানা থাকা জরুরি। এ ঠিকানা User name@Domain নিয়ে গঠিত হয়। যেমন ananda@bdlink.com.bd একটি E-Mail ঠিকানা। লক্ষণীয় যে, E-Mail ঠিকানা চিহ্ন দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অর্থাৎ @ চিহ্নের আগের অংশে User name অর্থাৎ ব্যবহারকারীর পরিচয় থাকে। এই User নামে কতগুলো অক্ষর ব্যবহার করা যাবে এর কোনো
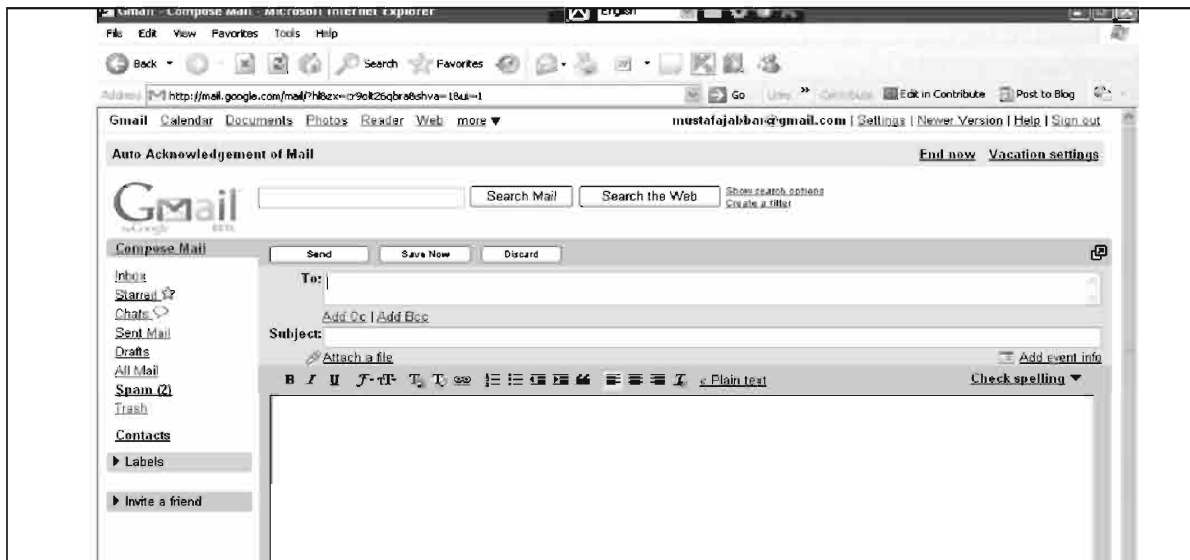
সীমা নির্দিষ্ট নেই। তবে তা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে ইংরেজি অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তবে নামের শুরুতে কোনো অবস্থাতেই কোনো সংখ্যা ব্যবহার করা যাবে না এবং শব্দ বা অক্ষরের মাঝে কোনো খালি জায়গাও থাকা চলবে না।

E-Mail ঠিকানা @ চিহ্নের পরের অংশটি হলো Domain name, আর ডোমেইন নেম (,) চিহ্ন দ্বারা কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়। @ চিহ্নের পরের প্রথম শব্দটি হোস্ট মেশিন নেম বলা হয়। উক্ত ঠিকানায় bdlink হল হোস্ট মেশিন নেম। এ হোস্ট মেশিন নামের পরের শব্দটি দিয়ে বুঝা যাবে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন com দ্বারা commercial বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় এবং .org দ্বারা কোনো অ-বাণিজ্যিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বা অর্গানাইজেশনকে বুঝায়। এছাড়া .net দিয়ে Network প্রতিষ্ঠান, .gov দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান Military ,.co দিয়ে Companies, edu দিয়ে Educational, ac দিয়ে Academic institution বুঝায়। ডোমেইন নামের সর্বশেষ অংশটিকে TLD বা Top Level Domain বলা হয়। আর তা হল কোনো দেশের পরিচয়মূলক দুই অক্ষর বিশিষ্ট একটি শব্দ। যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে .bd হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট TLD এখানে এরূপ আরও কিছু TLD-এর উদাহরণ প্রদান করা হল। যুক্তরাজ্য .uk, যুক্তরাষ্ট্র .us সৌদি আরব .sa, সুইজারল্যান্ড .ch, দক্ষিণ আফ্রিকা .za, অস্ট্রেলিয়া .au, সিঙ্গাপুর .sg, ইন্ডিয়া .in, জাপান .ja, কানাডা পধ আর্জেন্টিনা .ar অস্ট্রিয়া .at, বেলজিয়াম .be, ফ্রান্স .fr, হংকং .hk, মালয়েশিয়া .my ইত্যাদি। ডোমেইন নাম-এর ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে IP ঠিকানা। এই IP ঠিকানা হচ্ছে এমন কতকগুলো সংখ্যার সমষ্টি যা তিনটি (.) চিহ্ন দ্বারা বিভক্ত থাকে। এই ঠিকানাটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের IANA (International Assigne Numbers Authority) নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রদান করে থাকে। সাধারণত সংখ্যাভিত্তিক IP ঠিকানা প্রদান করা হয়। তবে ডোমেইন নাম এবং নাম্বারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ডেডিকেটেড কম্পিউটার সার্ভার রয়েছে।

ই-মেইল ব্যবহারের পদ্ধতি

ই-মেইল ব্যবহার করতে হলে একটি বিশেষ সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়। ই-মেইলের জন্য বর্তমানে প্রচলিত সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে Netscape Communicatior অন্যতম নাম জনপ্রিয় সফটওয়্যার। এখানে এ সফটওয়্যারগুলোর মাধ্যমে e-mail ব্যবহার করার নিয়ম-কানুন আলোচনা করা যেতে পারে। যদি এ সফটওয়্যারটির ব্যবহার পদ্ধতি আয়ত্ত করা যায় তবে এ বিষয়ে অপরাপর সফটওয়্যারসমূহ ব্যবহার করতে তেমন অসুবিধা হবে না। কারণ সকল সফটওয়্যারেরই সাধারণ বিষয়গুলোর মধ্যে মিল রয়েছে এবং এগুলো বেশ ইউজার ফ্রেন্ডলি। এছাড়াও এ সফটওয়্যারটির অন্যতম একটি সুবিধা হল এর সাহায্যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার সময়ও ই-মেইল করা যায়।

ই-মেইল পাঠানোর নিয়ম

Netscape Communication দিয়ে ই-মেইল করার জন্য নিম্নলিখিত প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো নিতে হয়–

১. Netscape Communication চালু অবস্থায় না থাকলে তাকে যথানিয়মে চালু করা হলে প্রথমেই ইন্টারনেট ব্রাউজিং উইন্ডো পর্দায় হাজির হবে।

২. Communicator>Messenger Mailbox সিলেক্ট করতে হবে। অথবা Ctrl+2 (win) নির্দেশ প্রদান করতে হবে। তাহলে Inbox-Netscape Folder উইন্ডোতে হাজির হবে। উক্ত উইন্ডো থেকে Messenger-New Message সিলেক্ট করতে হবে অথবা Ctrl+M (win) নির্দেশ প্রদান করতে হবে অথবা টুলবারে অবস্থিত New Msg বোতামে ক্লিক করতে হবে। তাহলে Composition উইন্ডো পর্দায় হাজির হবে। উক্ত উইন্ডোই হলো ই-মেইল প্রস্তুত করার স্থান।

কোনো ই-মেইল প্রস্তুত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হয়–

Composition উইন্ডোর প্রথমে যে পপ-আপ মেনু রয়েছে তাতে To:, Cc:, Bcc:, Group:, Reply-To: এবং Followup-to: বিষয়গুলো রয়েছে। এর যে কোনো একটি সিলেক্ট করা হলে এর ডান পাশে একটি টেক্সট বক্স প্রদর্শিত হয়। উক্ত টেক্সট বক্সে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার প্রয়োজন হয়। যেমন-

To: ঘরে প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা টাইপ করতে হয়।

Cc: ঘরে সে সমস্ত ঠিকানা টাইপ করতে হয় যাদের বরাবর প্রেরক ই-মেইল কপি পাঠাতে চায়। এখানে ই-মেইল ঠিকানাগুলোর পরপর কমা (,) দিয়ে টাইপ করতে হয়। Cc দিয়ে Carbon Copy বুঝায়।

Bcc: ঘরে সে সমস্ত ঠিকানা টাইপ করতে হয় যাদের প্রেরক ই-মেইল কপি পাঠাতে চায় কিন্তু প্রাপকদের জানাতে চায় না কাকে কাকে এর কপি পাঠানো হয়েছে। Cc এবং Bcc:-এর কাজ প্রায় একই রকম। তবে Cc -তে যাদের উল্লেখ থাকে ই-মেইলের প্রাপক ডকুমেন্টের শেষে তাদের প্রত্যেকের ঠিকানা ছাপানো অবস্থায় দেখতে পায়। অর্থাৎ প্রাপক ই-মেইলটি পেয়ে বুঝতে পারে কাকে কাকে এর কপি প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু Bcc:-তে টাইপ করা ঠিকানাসমূহ ডকুমেন্টের সাথে যাবে না। ফলে প্রাপক জানতে পারবে না কাদের ই-মেইলের কপি পাঠানো হয়েছে। Bcc হল Blind carbon copy.

Group: ঘরে পূর্ব থেকে তৈরি করা কোনো গ্রুপের নাম প্রদান করা যায়।

Reply-to: ঘরে প্রেরকের ই-মেইল ঠিকানা প্রদান করতে হয়।

Followup-to: ঘরে যাদের পরবর্তীতে ফলোআপ করার প্রয়োজন তাদের ই-মেইল ঠিকানা লেখা হয়।

Subject: টেক্সট বক্সের নিচে একটি টুলবার রয়েছে, যাতে একটি টেক্সট এডিটরের জন্য প্রয়োজনীয় টুলসমূহ রয়েছে। এখানে ফন্ট, ফন্টের সাইজ ও বিভিন্ন ফরমেট ইত্যাদি বাছাই করা হয়। অবশ্য টেক্সট ফরমেটের কাজ Format মেনুর সাহায্যেও করা যায়। অতঃপর একটি খালি স্থান রয়েছে যা দেখতে একটি কাগজের পৃষ্ঠার মতো। এখানেই ই-মেইলের মূল অংশ অর্থাৎ বিষয়বস্তু টাইপ করতে হয়।

Attached: ঘরে সেই ফাইলের নাম ও পাথ টাইপ করতে হয় যা প্রেরক উক্ত ই-মেইলের সাথে সংযুক্ত করে পাঠাতে চান। ই-মেইলের বিষয়বস্তুর অংশে সাধারণত বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কিছু লেখা যায় না। তাই এই সংযুক্তি ফাইল পাঠানোর ব্যবস্থা। এই সংযুক্তি যে প্রোগ্রামেই বা যে ফরমেটেই থাকুক না কেন তা হুবহু সেভাবেই প্রাপক পেয়ে যান এবং সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম দিয়ে সে ফাইলটি ওপেন করতে পারেন এবং কাজে লাগাতে পারেন। যদি এক্সেলের কোনো ফাইল সংযুক্ত করা হয় তবে প্রাপক তা এক্সেল দিয়ে খুলতে পারবেন।

ই-মেইল টাইপ ও ফরমেটিংয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এর সাথে কোনো ফাইল সংযুক্ত করতে হলে File>Attach>File সিলেক্ট করতে হবে অথবা টুলবার থেকে Attach বোতামে ক্লিক করতে হবে অথবা Attach File Document ট্যাব সিলেক্ট করে এর ডান পাশের খালি স্থানে ক্লিক করতে হবে। তাহলে Enter File to Attach উইন্ডো পর্দায় হাজির হবে। যে ফাইলটি সংযুক্ত করা প্রয়োজন সেখান থেকে সেটি খুঁজে বের করে সিলেক্ট করতে হবে এবং Open বোতামে ক্লিক করতে হবে। ফাইলটি Attach Files Document ট্যাবের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এভাবে একাধিক ফাইল সংযুক্ত করা যায়।

ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন

ই-মেইল কম্পোজ করার কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় মূল কাজটি হল ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা। এর জন্য ডেস্কটপে Dial-Up-Netowrk-এর আইকনে ডবল-ক্লিক করলে Connect To ডায়লগ বক্স আসবে। তাতে Password টাইপ করে Connect বাটনে ক্লিক করলে কম্পিউটার ইন্টারনেটে সংযুক্ত হবে।

ই-মেইল প্রেরণ

ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পর ফাইল মেনু থেকে Send Now সিলেক্ট করতে হবে অথবা কী-বোর্ড থেকে Ctrl+Enter (win) নির্দেশ প্রদান করতে হবে অথবা টুল বারে অবস্থিত Send আইকনে ক্লিক করতে হবে। এ কমান্ডের মাধ্যমে ই-মেইল তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের পথে চলে যাবে। কোনো ই-মেইল পাঠানো হয়ে গেলে এটি Sent ফোল্ডারে অবস্থান করে। যদি মুছে ফেলার দরকার হয় তবে ই-মেইলটি সিলেক্ট করে কী-বোর্ড থেকে Delete বোতামটি চাপতে হবে অথবা Edit>Delete Message সিলেক্ট করতে হবে।

ই- মেইল প্রিন্ট করা

কোনো ই-মেইল প্রিন্ট করতে হলে এটা Open করে File>Print সিলেক্ট করতে হবে অথবা Ctrl+P (Win) নির্দেশ প্রদান করতে হবে অথবা টুলবারে অবস্থিত Print আইকনে ক্লিক করতে হবে। তাহলে ই-মেইলটি প্রিন্ট হবে।

আগত ই-মেইল চেক করা

কোন ই-মেইল এলে তা ISP-এর সার্ভারে অবস্থিত প্রাপকের মেইল বক্সে জমা থাকে। প্রাপক অবসর মতো তা তার কম্পিউটারে নিয়ে আসতে পারে। আর এই কাজটি করতে হলে প্রাপককে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করে Inbox-Netscape Folder উইন্ডো থেকে File>Get Messages >New সিলেক্ট করতে হবে অথবা Ctrl +T(Win) নির্দেশ প্রদান করতে হবে; অথবা টুলবারে Get Msg বোতামে ক্লিক করতে হবে। তাহলে Getting New Message ডায়লগ বক্স পর্দায় হাজির হবে। ISP সার্ভারে যদি কোনো মেইল থাকে তবে উক্ত ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে প্রাপকের কম্পিউটারে চলে আসবে এবং ইনবক্স-এ জমা হবে। অতঃপর ইন্টারনেটে আর কোনো কাজ না থাকলে অন-লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ কম্পিউটার ইন্টারনেটের অন-লাইনে সংযোগ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ প্রতি মিনিটে বিল উঠতে থাকে। সুতরাং এ দিকটি বিবেচনা করে যে কাজগুলো সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, অর্থাৎ Off Line অবস্থায় করা সম্ভব তা সেভাবেই করা উচিত। যেমন– আগত ই-মেইল পাঠ করা এবং তার জবাব তৈরি করার কাজটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় করণীয়। প্রাপকের নিকট আগত কোনো মেইলের উত্তর যদি সে তাৎক্ষণিকভাবে দিতে চায় তবে তা সিলেক্ট করে Message মেনু থেকে Reply কমান্ড বা কী-বোর্ডে Ctrl + R অথবা টুলবারে Reply বোতামে ক্লিক করতে হয়। অতঃপর ই-মেইল বডিতে মেসেজ টাইপ করে যথানিয়মে তা প্রেরণ করতে হয়। যদি কোনো ঠিকানায় বারবার ই-মেইল পাঠাতে হয় তবে সে ঠিকানাসমূহ Address Book-এ সংরক্ষিত করে রাখা যায়। এর সুবিধা হল ই-মেইল করার সময় সে ঠিকানা আর পুনরায় টাইপ করতে হয় না এবং একটি কমান্ড দিয়ে তা সহজেই পাওয়া যায়।

Address Book-এ ই-মেইল ঠিকানাসমূহ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

Communicator মেনু থেকে Address Book সিলেক্ট করলে অথবা Ctrl+Shift+2 নির্দেশ প্রদান করলে কম্পিউটারের পর্দায় Address Book উইন্ডো আসে। উক্ত উইন্ডো থেকে File>New Card সিলেক্ট করতে হবে অথবা টুলবারের New Card আইকনে ক্লিক করতে হবে। তাহলে New Card ডায়লগ বক্স পর্দায় হাজির হবে। এখানে যাবতীয় তথ্য প্রদান করে OK বোতাম ক্লিক করলে কোনো ই-মেইল ঠিকানা Address Book-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করতে অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলো হলো–

ক. কম্পিউটার, স্ক্যানার, টেলিফোন লাইন, সফটওয়্যার
খ. কম্পিউটার, মডেম, ডিস্ক ড্রাইভার, সফটওয়্যার
গ. কম্পিউটার, মডেম, টেলিফোন লাইন, সফটওয়্যার
ঘ. কম্পিউটার, মডেম, প্রিন্টার, সফটওয়্যার

[নিচের অনুচ্ছেদটি ২-৫ প্রশ্নের জন্য প্রযোজ্য]

১০ তলা বিশিষ্ট ঢাকার একটি ব্যাংক ভবনের বিভিন্ন তলায় স্থাপিত তাদের সকল কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২. তাদের নেটওয়ার্কটি গড়ে উঠতে পারে-

ক. ক্যাবল ব্যবহারের মাধ্যমে
খ. স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে
গ. রেডিও লিংক ব্যবহারের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩. তাদের নেটওয়ার্কটি কী ধরনের হবে?

ক. LAN
খ. WAN
গ. MAN
ঘ. ISDN

৪. নেটওয়ার্কটি চালু করার পর তাঁরা–

i. সবাই মিলে সফটওয়্যারসমূহ ব্যবহার করতে পারবেন
ii. সকল কম্পিউটারের কাজের মধ্যে সমন্বয় করতে পারবেন
iii. এক কম্পিউটারের ডিভাইস অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তর করতে পারবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

চিত্রগুলো লক্ষ কর–
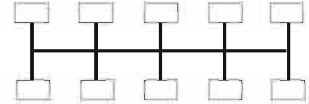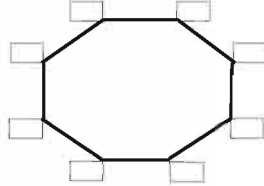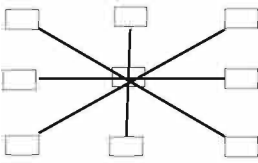
বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিগত কম্পিউটারগুলো (PC) ক্রমশই চিত্রের LAN- সমূহ অথবা অন্য কোনো নেটওয়ার্কের আওতায় তথ্য আদান-প্রদান করছে। রিমিদের স্কুলে ১০টি কম্পিউটার আছে। রিমি ও তার সহপাঠীদের ব্যবহারের জন্য তাদের স্কুল সম্প্রতি ইন্টারনেট সংযোগ ও LAN স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক. ইন্টারনেট কী?
খ. চিত্রে প্রদর্শিত LAN ও সংগঠনের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
গ. রিমিদের স্কুলের জন্য চিত্রের কোন নেটওয়ার্কটি উপযোগী এবং কেন?
ঘ. রিমিদের স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগের পক্ষে যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়

কম্পিউটারের প্রয়োগ ও মাল্টিমিডিয়া

কম্পিউটারের ব্যবহার

কম্পিউটার কাজ করে ডাটা (Data) বা উপাত্ত নিয়ে। কম্পিউটারে বর্ণ, সংখ্যা, ছবি, শব্দ, চলমান চিত্র ইত্যাদি ইনপুট হিসেবে প্রদান করা হয়। এ সব কিছুই কম্পিউটার ডাটা হিসেবেই গণ্য করে এবং তা প্রক্রিয়াকরণ করে। যখন কম্পিউটার দিয়ে গণনার কাজ বা হিসেব-নিকেশের কাজ করা হয় তখন সংখ্যা হয় কম্পিউটারের উপাত্ত। আবার যখন কম্পিউটার গ্রাফিক্স বা চলমান গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করা হয় তখন ইমেজ এলিমেশন হয় কম্পিউটারের উপাত্ত। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এসব উপাত্তকে যন্ত্রের ভাষায় প্রক্রিয়াকরণ করে। কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম ও এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামসমূহ বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন বা শব্দ ইত্যাদির রূপ ফুটিয়ে তোলে। এখনকার কম্পিউটারের যে কোনো ধরনের উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করা যায়। ছোটখাটো যোগ-বিয়োগ থেকে শুরু করে কোটি কোটি অঙ্কের হিসেব-নিকেশ বা গণনা কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। চিত্র বা শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

এক সময়ে দু'একটি কাজের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হত এখন তা আর তেমনি দু'একটি কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার সীমিত নয়। বিচিত্র ধরনের কাজ করা যায় এই কম্পিউটারের সাহায্যে। সমাজ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের কাজেই কম্পিউটারের ব্যবহার অপরিহার্য উঠছে। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের চারপাশের প্রায় সকল কাজেই এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা যায়। যদিও আমাদের দেশে এখনো সকল খাতেই তেমনভাবে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়নি– তবুও প্রতিদিন এর গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্প্রসারিত হচ্ছে। কয়েকটি খাতে কম্পিউটারের ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা এবং এর প্রায়োগিক সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে কম্পিউটার

আমাদের এই কৃষি-প্রধান দেশে আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার তেমন হয়নি। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখনো হাট-বাজারে ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু নগরগুলো ক্রমশ আধুনিকতার ছোঁয়া পাচ্ছে। এক সময়ে আড়তদারি-দোকানদারি এখন শপিং প্লাজা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমরা সবাই জানি ব্যবসায়-বাণিজ্য মানে অনেক হিসেব-নিকেশের ব্যাপার। ব্যবসায় যত বড় হিসেব-নিকেশ তত বেশি। কম্পিউটার খুব সঙ্গত কারণেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের হিসেব-নিকেশের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখছে। মালামালের মজুদ, বিক্রি, আমদানি, রপ্তানি, বিল তৈরি, বকেয়া পাওনা আদায়ের অবস্থা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, হাজিরা ইত্যাদি ছাড়াও দেশ-বিদেশে যোগাযোগ এবং বাজার প্রবণতা বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

তবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কম্পিউটার যে আধুনিক ধারণাটি নিয়ে এসেছে তার নাম হল ই-কমার্স। ইলেক্ট্রনিক কমার্স বা ই-কমার্স হচ্ছে একুশ শতকের ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বরূপ। ধারণা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে ইন্টারনেটের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে। এখনই উন্নত বিশ্বের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের দেশের কোনো কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট তৈরি করে পণ্য বেচা-কেনা করছে। বিশ্বের বৃহত্তম যে বইয়ের দোকানটি তা এখন ইন্টারনেটে অবস্থিত। মানুষের কাপড়চোপড় থেকে গৃহস্থালি পণ্য বা শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি পর্যন্ত ই-কমার্সের সাহায্যে বেচা-কেনা হচ্ছে।

আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যেই এ ধরনের ব্যবসা শুরু করেছে। আমাদের দেশের কম্পিউটারের ব্যবহার তেমনভাবে সম্প্রসারিত না হওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্য এখনো তেমনভাবে কম্পিউটার নির্ভর হয়নি। ই-কমার্সের

প্রভাবও তাই সেভাবে হয়নি। তবে আগামীতে ই-কমার্সই হবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন– এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একসময়ের টাইপরাইটার, ক্যালকুলেটর, ফ্যাক্স মেশিন, পিএবিএক্স, টিভি, ভিসিপি, অডিও প্লেয়ার ইত্যাদি সব যন্ত্রের জায়গাগুলো পর্যায়ক্রমে দখল করে নিচ্ছে কম্পিউটার। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের সভা সেমিনার, বাজারজাতকরণ প্রচেষ্টা, শেয়ার ব্যবস্থাপনা, তথ্য গ্রহণ, বিবরণ, লিফলেট, ব্রশিউর, গবেষণাপত্র, প্রোজেক্ট প্রোফাইল, পণ্য পরিচিতি, ড্রইং ডিজাইন ও উপস্থাপনাসহ এমন কোনো কাজ নেই যা কম্পিউটারে করা যায় না। কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারে তাহলে ভবিষ্যতে সে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হবে।

ব্যাংক ব্যবস্থাকে যদি আমরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে সেখানেও কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যাবে। আমাদের দেশে এখন দিনে রাতে ব্যাংকিং সেবা পাবার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো ব্যাংকের এমন অনেক ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে যে মানুষজন ছাড়াই ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া, টাকা তোলা, বিল পরিশোধ করা, হিসাবের বিবরণী পাওয়া ইত্যাদি অনেক কাজ করা যায়। আর এসব কাজ করা যায় দিনে-রাতে যে কোনো সময়। কোনো কোনো ব্যাংক আছে যাতে দেশের যে কোনো জায়গা থেকে একটি হিসেব খোলা হলে দেশের যে কোনো জায়গায় সেই ব্যাংকের শাখা থেকে লেনদেন বা ব্যাংকিং করা যায়। বীমার জগতসহ ব্যবসায়ের অন্যান্য খাতেও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, যোগাযোগ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, হিসেব-নিকেশ সকল কাজেই কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার

যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। সুদূর অতীত থেকে ব্যবস্থাপকগণ কায়িক শ্রমের সাহায্যে ব্যবস্থাপনার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনার কাজের জন্য তাই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপক প্রয়োজন হয়েছে। আর ব্যবস্থাপনার কাজটি এতই জটিল বহুমুখী ও শ্রমনির্ভর যে সবাই প্রথমেই এ কাজটিকে গুরুত্ব প্রদান করে। কম্পিউটার চালু হওয়ার পর থেকে অর্থ ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, কর্ম ব্যবস্থাপনা, এমন অসংখ্য ব্যবস্থাপনায় কায়িক শ্রমের হার কমে এসেছে এবং সেই সঙ্গে কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনো কাজের উপাত্ত বিন্যস্ত করা, সতর্ক করা, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা, জরুরি ফলাফল প্রদান করা, ক্রয় বা বিক্রয়ের পরিস্থিতি জানানো, চাহিদার নির্দেশনা প্রদান করা ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, দ্রুত গতিতে এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটারের সাহায্যে অনেক কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন করা যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, পাঠাগারের জন্য বই ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ছাড়াও যোগাযোগ বা তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কম্পিউটার একটি অপরিহার্য যন্ত্র।

প্রকাশনায় কম্পিউটার

প্রকাশনার জগতে কম্পিউটার এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এখন উন্নত দেশগুলোতে সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মুদ্রণ যন্ত্র রয়েছে। অনেক ব্যয়বহুল বলে আমাদের দেশে এর ব্যবহার নেই। সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এ সব যন্ত্রে কাগজ তুলে দেওয়ার পর বাদ-বাকি কাজ, যেমন– কতগুলো ছাপা হবে, কালি কম-বেশি হচ্ছে কি-না, ছেঁড়া-ফাটা কাগজ আছে কি-না ইত্যাদি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ ও যাচাই করে সুন্দরভাবে ছাপার কাজ সম্পন্ন করার পর একেবারে ভাঁজ করে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজই কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মুদ্রণ জগতের কাজ হচ্ছে কোনো লেখা বা বিষয় ছেপে দেওয়া। কিন্তু তার আগে অক্ষর বসিয়ে লেখা সাজিয়ে দিতে হয়। এই কাজকে বলা হয় কম্পোজ। আমাদের দেশে আগে কম্পোজ করা হত সীসার অক্ষর দিয়ে। সীসার অক্ষর দিয়ে কম্পোজ করার ছাপাখানাকে বলা হত লেটার প্রেস। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণভাবে লেটার প্রেসের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। লেটার প্রেসে আবার পোস্টার জাতীয় কাজে বড় অক্ষর ব্যবহার করার জন্য কাঠের তৈরি হরফ ব্যবহার করা হত। কয়েকবার ব্যবহার করার পর সীসার হরফগুলো কাজের অনুপযোগী হয়ে যেত। কোনোটি হয়তো উপরের দিক থেকে ভেঙ্গে যেত, কোনোটি হয়তো নিচের দিক থেকে, কোনোটি আবার পুরোটাই। ফলে ছাপার পরে দেখা যেত কোনো কোনো অক্ষর ঠিকমতো ছাপা হয়নি।

আশির দশকের শেষ দিক থেকে আমাদের দেশে কম্পিউটারের সাহায্যে কম্পোজের কাজ শুরু হয়। এখন আমাদের দেশে দৈনিক পত্রিকাসহ সকল প্রকার পত্র-পত্রিকা এবং বই কম্পিউটারে কম্পোজ হয়। নিতান্তই ছোটখাটো ছাপার কাজের জন্য এখনও কিছু লেটার প্রেসে কম্পোজের কাজ হয়। লেটার প্রেসের চেয়ে কম্পিউটারে কম্পোজ করা বিষয়ের ছাপার কাজ অনেক উন্নত মানের হয়।

কম্পিউটারে কম্পোজ করার উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো হচ্ছে :

- দ্রুত কম্পোজ করা যায়।
- একই কম্পিউটারে বাংলা, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় কম্পোজ করা যায়।
- অক্ষর কখনও ভাঙ্গা হয় না, লাইন আঁকাবাঁকা হয় না।
- অক্ষরের আকার অনেক বড় এবং একেবারে ছোট করা যায়।
- লাইনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা প্রয়োজনমতো কম-বেশি করা যায়।
- কম্পোজ করা বিষয় বা লেখা কম্পিউটারের স্মৃতিতে রেখে দেওয়া যায়। প্রয়োজন হলে ঐ বিষয়টি আবারও ব্যবহার করা যায়। নতুন করে কম্পোজ করতে হয় না। কয়েক হাজার পৃষ্ঠার বই কম্পিউটারের স্মৃতিতে রেখে দেওয়া যায়।
- ছাপার কাজের বিষয়বস্তু ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মিডিয়াতেও ব্যবহার করা যায়।

প্রকাশনায় কম্পিউটার ব্যবহার করার ফলে কম্পোজ ছাড়াও পৃষ্ঠাসজ্জাকরণ, গ্রাফিক্সের ব্যবহার, রং পৃথকীকরণ ইত্যাদি কাজও সহজ ও সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়েছে। সংবাদপত্র, বই, প্রচারপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদিসহ সকল কাগজে মুদ্রিত বিষয়বস্তুর জন্যই এখন কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের প্রকাশনা, ডিজিটাল প্রকাশনা এসব কাজও করা হচ্ছে। ওয়েব পেজ তৈরি, ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক তৈরি ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার এক অত্যাধুনিক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

শিক্ষায় কম্পিউটার

কম্পিউটার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন এক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, বই খাতা-কলম-পেন্সিল দিয়ে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু রয়েছে কম্পিউটার তার বদলে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ভিত্তিক ও ইন্টারনেট ভিত্তিক এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে। একসময় শিক্ষার্থীরা বই থেকে যেভাবে তথ্য পেত মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ও ইন্টারনেটের সাহায্যে তার চাইতে আরও অনেক উন্নত ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে এখন তারা তথ্য পাচ্ছে। শিক্ষার জন্যে যে তথ্য কাগজে পাওয়া যেত তা হয়ে উঠেছে ডিজিটাল। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক রয়েছে। যেমন–

শিক্ষাদান : ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কম্পিউটারের জুড়ি নেই। শুধু তাই নয়, পাঠ্য বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য কম্পিউটার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। কোনো কিছু শেখানোর জন্য শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের যত বেশি ইন্দ্রিয় কাজে লাগানো যায় তাতে দ্রুত তারা বিষয়টি শিখতে পারে এবং শেখা বিষয়টি মনেও

থাকে বেশি দিন। যেমন– মুখে মুখে পাঠদান করলে শিক্ষা গ্রহণে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়কেই কাজে লাগানো হয়। পাঠদানের বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বোর্ডে লিখে দিলে দর্শনেন্দ্রিয় কাজে লাগানো হয়। কিন্তু কোনো ছবি এঁকে দেখালে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিতে ঐ ছবিটির স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয় এবং ছবির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কথাও মনে থাকে অনেক দিন। এটাই নিয়ম। আর ছবি যদি সচল হয় তাহলে তো কথাই নেই। কোনো একটি কাহিনী শোনার চেয়ে ঐ কাহিনী নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র অনেক বেশি রেখাপাত করে। কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এর সবগুলো সুযোগ গ্রহণ করা যায়। নিচের দিকের শ্রেণীতে বিভিন্ন গল্প, ইতিহাস ইত্যাদি কার্টুন চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়। উপরের শ্রেণীগুলোতেও ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় রঙিন চিত্রাবলির সাহায্যে দেখিয়ে পাঠদান করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, যেমন– নভোমণ্ডল, গ্রহ-উপগ্রহ, সৌরজগত, প্রাণী জগতের খুঁটিনাটি সচল চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। এসব অনেক বিষয় তৈরি পাওয়া যায়। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করেও নেওয়া যায়। পৃথিবীতে মোট কতটি দেশ আছে, কোন দেশের রাজধানীর নাম কী, মুদ্রার নাম কী, জনসংখ্যা কত, শিক্ষার হার কত ইত্যাদি সব তথ্য কম্পিউটারের দু'একটি বোতামে চাপ দিলেই পাওয়া যায়। প্রতিটি দেশের বিভিন্ন প্রকার তথ্য জানার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেশের জাতীয় সঙ্গীত ইচ্ছে করলেই বাজিয়ে শোনা যায়। এসব সুযোগ একটি সাধারণ কম্পিউটারেই পাওয়া যেতে পারে। কাজেই কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষাদান যে প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণ : বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/হিসাবরক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি সাধারণ কম্পিউটারেই শিক্ষক ও কর্মচারীদের নাম, ঠিকানা, বেতন ও চাকরির বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করতে পারেন এবং একই সঙ্গে প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর নাম, ঠিকানা, ক্রমিক নম্বর, শ্রেণী পরীক্ষার উন্নতি-অবনতির বিবরণ এবং বেতন সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য সংরক্ষণ করতে পারেন। যে কোনো সময় যে কোনো শ্রেণীর যে কোনো ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক এসে তাঁর ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানার প্রয়োজন মনে করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি কম্পিউটারের দু'একটি বোতামে চাপ দিয়েই তাঁর ছেলে বা মেয়ের সম্পর্কে জানতে চাওয়া সকল তথ্য কম্পিউটারের পর্দায় দেখিয়ে দিতে পারেন। এ জন্য আলমারি বা তাকে তুলে রাখা খাতাপত্র টেনে নামিয়ে তথ্য খুঁজে বের করার প্রয়োজন হয় না। ফলে সময় ও শ্রম দুই-ই বেঁচে যায়। অভিভাবককেও অপেক্ষা করতে হয় না। যিনি কাগজপত্র দেখাশুনা করেন তিনিও অনেক অভিভাবককে সন্তুষ্ট করতে পারেন। বারবার খাতাপত্র নামানো ওঠানো এবং খোঁজাখুঁজির বিরক্তি পেহাতে হয় না। শুধু এই বিরক্তির কারণেই এমন অনেক সময় অভিভাবকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। একটি কম্পিউটারের সঙ্গে আন্তঃসংযোগ বিশিষ্ট অন্য একটি কম্পিউটার প্রধান শিক্ষকের কক্ষে রাখা হলে তিনি প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনার অগ্রগতি-অবনতি সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারেন। এছাড়া তাঁর কম্পিউটারে তিনি অন্য শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে পারেন।

যোগাযোগ : বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নানা প্রকার পত্র যোগাযোগ প্রয়োজন হয়। থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস এবং শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যন্ত প্রতিটি অফিসের সঙ্গেই কোনো না কোনো রকম পত্রযোগাযোগ করতে হয়। এসব পত্রের বিষয় এবং ভাষা প্রায় পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কখনও কখনও সামান্য পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। আর প্রতিবারই একই পত্র সম্পূর্ণটাই নতুন করে টাইপ করতে হয়। টাইপ করার সময় বানান ভূল হলে আবার নতুন করে টাইপ করতে হয়। ভুল বানান সাদা কালি দিয়ে ঢেকে বা রাবার দিয়ে ঘষে তুলে ঐ জায়গায় আবার টাইপ করলে চিঠির পরিচ্ছন্নতা ক্ষুণ্ন হয়। পক্ষান্তরে, কম্পিউটারের স্মৃতিতে প্রতিটি চিঠি রেখে দেওয়া যায়। যখন যে চিঠিটি প্রয়োজন সেই চিঠিটি পর্দায় এনে একটি কপি করার পর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। নতুন করে টাইপ করতে যেয়ে ভুল হলেও শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। তাতে মুদ্রিত চিঠির মান ক্ষুণ্ন হয় না। আর কম্পিউটারের টাইপ করা চিঠির মান অনেক উন্নত হয়। দেখতে অনেক সুন্দরও হয়। এ ছাড়া বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট অফিসের

মধ্যে সরাসরি কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব।

পরীক্ষার ফলাফল তৈরি ও সংরক্ষণ : কোনো বিদ্যালয় থেকে, ধরা যাক, প্রতি বছর ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। এদের প্রতি বছরের পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটারের স্টোরেজে রেখে দেওয়া যায়। কম্পিউটারের স্টোরেজে এ রকম ১০০ বছরের ফলাফল সংরক্ষণ করা যায়। ফলে, ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে বা পোকা-মাকড়ের উপদ্রবে ফলাফলের কাগজপত্র নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। আর, প্রয়োজনে যে কোনো সময় যে কোনো বছরের পরীক্ষার ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেওয়া যায়। অন্যদিকে কম্পিউটারের সাহায্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল তৈরি ও সংরক্ষণ করা যায়।

প্রশংসাপত্র : প্রতি বছর পরীক্ষার পর বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসাপত্র দিতে হয়। নাম, পিতার নাম, সাল, তারিখ ইত্যাদির জায়গাগুলো শূন্য রেখে প্রশংসাপত্রগুলো ছাপানো থাকে। প্রশংসাপত্র দেওয়ার সময় ঐ শূন্য ঘরগুলো হাতে লিখে পূরণ করে দেওয়া হয়। কিন্তু, কম্পিউটারে এরকম একটি প্রশংসাপত্র তৈরি করে রাখলেই চলে। প্রশংসাপত্র দেওয়ার সময় ছাত্র-ছাত্রীর নাম, পিতার নাম, সাল, তারিখ ইত্যাদি ঘরগুলো টাইপ করে সবাইকে একেবারে নতুন মুদ্রিত প্রশংসাপত্র দেওয়া যেতে পারে। এতে প্রশংসাপত্রের সম্পূর্ণ লেখাই হয় মুদ্রিত অক্ষরে। মুদ্রিত প্রশংসাপত্রে কোনো সমস্যাও থাকে না।

শিল্প-কারখানায় কম্পিউটারের ব্যবহার

কম্পিউটারের সাহায্যে উৎপাদনের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রগুলো কম্পিউটারে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী নিখুঁতভাবে পণ্য তৈরি করে থাকে। একটুও হেরফের হয় না। আবার কোনো কোনো যন্ত্রের দেখাশুনার কাজও করে থাকে কম্পিউটার। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটির কোথাও গোলযোগ দেখা দিলে বা যন্ত্রটি কোনোভাবে নষ্ট হলে কম্পিউটার তা জানতে পারে। ফলে সরাসরি ঐ জায়গাটির নাটবল্টু নেড়েচেড়ে দেখার প্রয়োজন হয় না। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার একটি সুবিধা হচ্ছে, কোনো পরিস্থিতিতে কম্পিউটার অবিরাম চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে যেতে পারে।

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে পণ্য উৎপাদনের সুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : তুলনামূলকভাবে শ্রমিক কম লাগে, তৈরি পণ্যের মান নিখুঁত হয়, কাঁচামালের অপচয় হয় না এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। ফলে সামগ্রিক উৎপাদনের খরচ কম হয়, পণ্যের মান উন্নত হওয়ায় চাহিদাও বাড়ে, সব মিলিয়ে মুনাফা বেশি হয়।

শিল্প-কারখানাকে কম্পিউটার নির্ভর করার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন এবং দক্ষ জনশক্তির উচ্চ বেতনের জন্য প্রাথমিক খরচ বেশি পড়ে। কিন্তু, দীর্ঘদিন চালনার হিসেব করলে প্রকৃত খরচের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসতে থাকে। এক পর্যায়ে প্রচলিত নিয়মে পরিচালিত একই ধরনের শিল্প-কারখানার চেয়ে গড়পড়তা খরচ কম পড়ে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে আমরা যে সময়ের মধ্যে বাস করছি তা কম্পিউটারের যুগ। যে সব খাতে কম্পিউটার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হল তার বাইরেও কৃষি, খেলাধুলা, বিনোদন সব কিছুতেই ব্যবহৃত হয় কম্পিউটার।

মাল্টিমিডিয়া

পৃথিবীতে কম্পিউটার প্রযুক্তির যে অংশটি এখন সর্বাধিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে তার নাম মাল্টিমিডিয়া। এটি অতি সাম্প্রতিক বিষয় বলেই হয়তো এ ব্যাপারে তেমন সুস্পষ্ট ধারণা সকলের নেই। অনেকেই ভাবেন কম্পিউটারে সিডি ড্রাইভ, সাউন্ড কার্ড ইত্যাদি থাকলে তাকেই মাল্টিমিডিয়া বলে। আসলে মাল্টিমিডিয়া কেবল কম্পিউটারের কিছু যন্ত্রপাতি নয়, এটি হচ্ছে এমন একটি ধারণা যার সাহায্যে মানুষের প্রকাশ মাধ্যমসমূহ সমন্বিত ও ইন্টারএ্যাক্টিভ করা হয়।

আশির দশকে প্রচলিত আইবিএম পিসি প্রধানত টেক্সট ভিত্তিক কম্পিউটার সিস্টেম ছিল। যেহেতু কম্পিউটার গণনা যন্ত্র

হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেহেতু প্রথম মাত্র ১০টি সংখ্যা ও পরে রোমান ২৬টি বর্ণ এবং অন্যান্য চিহ্নসমূহ প্রদর্শন করাই ছিল কম্পিউটারের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু কালক্রমে পিসি ব্যবহারকারীদের চাহিদা বাড়তে থাকে। তারা যে পিসিতে টেক্সট পায় তাতে ফন্টের বৈচিত্র্য দাবি করতে থাকে। আবার কেবল ফন্ট নয়– এর সাথে গ্রাফিক্স ব্যবহার করার ইচ্ছে পোষণ করতে থাকে। কালক্রমে এখন অডিও-ভিডিও ব্যবহার করার জন্য পিসি ব্যবহৃত হচ্ছে।

পিসিতে অপারেটিং সিস্টেম লেভেলে 'গ্রাফিক্স' বা ননটেক্সট-এ ইমেজ প্রদর্শনের অন্যান্য সুযোগ আসে 'লিজা' অপারেটিং সিস্টেম থেকে। 'মেকিনটোশ' বা 'ম্যাক ওএস'-এ এসে সেই সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হয়। বস্তুত লিজা এবং মেকিনটোশ-এ প্রদর্শিত ফন্টসমূহও 'গ্রাফিক্স'। আধুনিক পিসি'র উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ম্যাক ওএস-এর সেসব ধারণাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সত্তর দশকে যখন পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি'র সূচনা হয় তখনও কম্পিউটারে গ্রাফিক্স উপেক্ষিত ছিল না। বিশেষত সে সময় 'বাড়ি' ও 'স্কুলে' ব্যবহৃত কম্পিউটারে গ্রাফিক্স এমনকি 'অডিও-ভিডিও' ব্যাপারটিও মাথায় রাখা হয়েছে। তবে সে সময়ে গ্রাফিক্স ব্যবহার করার জন্য প্রোগ্রামারকে কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হত। মেকিনটোশের জন্মের আগে যে সব পিসি স্কুলে বা বাড়িতে ব্যবহৃত হয়েছে তাতেও গ্রাফিক্স ও মাল্টিমিডিয়ার বিষয়টি ছিল। সে সময়েই কিছু কিছু শিক্ষা বিষয়ক সফটওয়্যার মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে, মাল্টিমিডিয়াকে কম্পিউটার চিহ্নিত করেছে টেক্সট ও গ্রাফিক্সের সাথে অডিও-ভিডিও ইত্যাদিকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে। তবে নতুন শতকে আমরা যে মাল্টিমিডিয়ার কথা বলছি তার পরিধি অনেক বিস্তৃত। আভিধানিকভাবে মাল্টিমিডিয়ার অর্থ হল বহুমাধ্যম। মানুষ প্রকাশ করার জন্য যে সব মিডিয়া বা মাধ্যম ব্যবহার করে মাল্টিমিডিয়া তার সমন্বিত রূপ।

এক কথায় মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে বর্ণ (Text), চিত্র (Graphics) ও শব্দ (Sound)-এর সমন্বয়। তবে, মনে রাখতে হবে যে, মাল্টিমিডিয়া প্রচলিত ছিল অনেক আগে থেকেই। সিনেমা, টেলিভিশন এবং ভিডিওতে একই প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে আসছে এসব শিল্পের সেই শুরু থেকেই।

কম্পিউটারে মাল্টিমিডিয়ার ব্যাপারটি ভিন্ন। এতে সব ক'টি মিডিয়ার ব্যবহার করার পরও বাড়তি যে সুবিধাটি দেওয়া হয় তার নাম ইন্টারএ্যাক্টিভিটি। প্রচলিত টিভি বা সিনেমায় প্রোগ্রামিং করা যায় না বলে এতে ইন্টারএ্যাক্টিভিটি সম্ভব নয়। কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য যে কোনো প্রযুক্তি বা যন্ত্রের যে পার্থক্যটাকে বড় করে দেখতে হবে তার নাম প্রোগ্রামিং। ফলে কম্পিউটারে মাল্টিমিডিয়া মানে হল, এর প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষমতাকে কাজে লাগানো। ইন্টারএ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এই প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষমতার ফসল।

মাল্টিমিডিয়ার বিভিন্ন মিডিয়াসমূহের পরিচিতি

আগেই বলা হয়েছে যে, মূলত তিনটি মিডিয়াকেই মাল্টিমিডিয়ার মিডিয়া বলে গণ্য করা হয়। এগুলো হল ক. বর্ণ, খ. চিত্র এবং গ. শব্দ (সাউন্ড)।

ক. বর্ণ : মানুষের লিখিত ভাষা মানেই হল বর্ণ। কম্পিউটারে এই বর্ণ কোনো না কোনো ধরনের আকৃতি নিয়ে প্রকাশিত হয়। তবে অন্যান্য মিডিয়ার চাইতে এর পার্থক্য হল যে, বর্ণ কম্পিউটারে সংকেত আকারে থাকে। গ্রাফিক্স বা সাউন্ড হিসেবে থাকে না। প্রচলিত ধারণায় বর্ণ হচ্ছে স্থির মাধ্যম। মাল্টিমিডিয়ার বর্ণ চলমান এবং ত্রিমাত্রিক দু রকমই হতে পারে। আবার এই মাধ্যমটি হাতে তৈরি বা যন্ত্র তৈরি হতে পারে। কম্পিউটারে হাতে তৈরি বর্ণ অবশ্য চিত্র হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

খ. চিত্র : বর্ণ ছাড়া প্রকাশের আর যেসব মাধ্যম রয়েছে তার সবই গ্রাফিক্স অথবা শব্দ। এর মধ্য থেকে শব্দ বাদ দিলে গ্রাফিক্সকে শনাক্ত করা যায়। মানুষের আঁকা ছবি, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফ সবই গ্রাফিক্স।
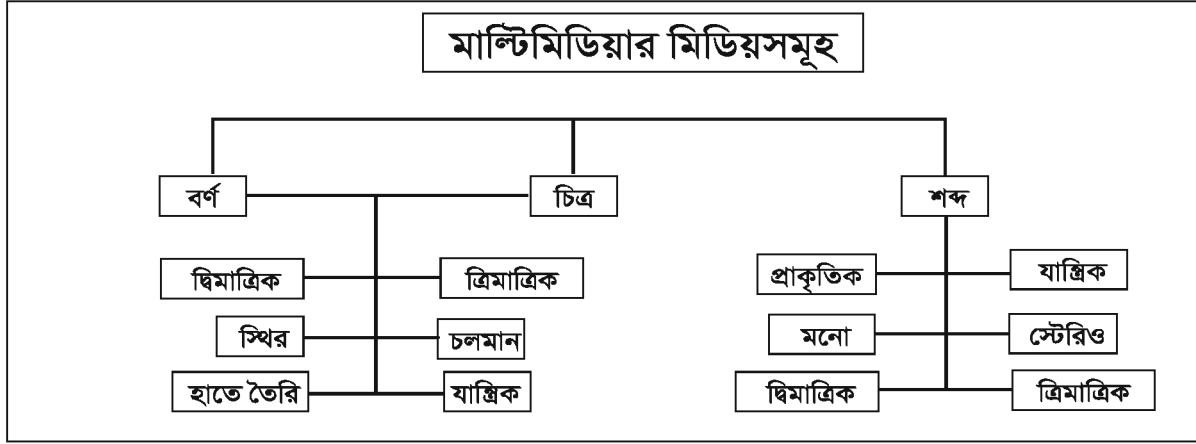
গ্রাফিক্স স্থির এবং চলমান হতে পারে। চলমান গ্রাফিক্সকে এনিমেশন বা ভিডিও বলা যায়। বর্ণের মতোই চিত্রও দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে। এ ছাড়া ফটোগ্রাফিক যন্ত্র ব্যবহার করে যে চিত্র ধারণ করা হয় তাকেও আমরা গ্রাফিক্স হিসেবে চিনে থাকি। ফটোগ্রাফি যখন চলমান তখন তা সিনেমা বা ভিডিও হিসেবে গণ্য হয়।

গ. শব্দ (সাউন্ড) : মাল্টিমিডিয়ার অন্যতম মিডিয়া শব্দ হচ্ছে মানুষের প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মানুষের লিখিত ভাষার আগেই শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। আমাদের চারপাশে যত প্রকারের শব্দ আছে তা মানুষের ভাষাই হোক, সঙ্গীতের সুরই হোক, পাখির কলকাকলি হোক আর প্রাকৃতিক শব্দই হোক– সবই মাল্টিমিডিয়ায় ব্যবহৃত হয়। শব্দকে প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক এবং দ্বিতীয়ত যান্ত্রিক হিসেবে চিনে থাকি। শব্দ আবার মনো হতে পারে। শব্দের একটি প্রবাহকে মনো এবং একাধিক প্রবাহকে স্টেরিও বলা হয়।

মাল্টিমিডিয়ার শ্রেণীবিভাগ

প্রাথমিকভাবে মাল্টিমিডিয়াকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এ দুটি ভাগ হল– লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার। লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া হল সিনেমা, ভিডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি। অন্যদিকে নন-লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া হল কম্পিউটারভিত্তিক। বস্তুত লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া একটি সময়কে অতিক্রম করে এবং ধারাবাহিক বা পর্যায়ক্রমিকভাবে চলতে থাকে। অন্যদিকে নন-লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া পর্যায়ক্রমিক না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তনশীল, হাইপার বা ইন্টারএ্যাক্টিভ হতে পারে।

একটি চিত্রের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়ার শ্রেণীবিভাগকে এভাবে দেখানো যেতে পারে।
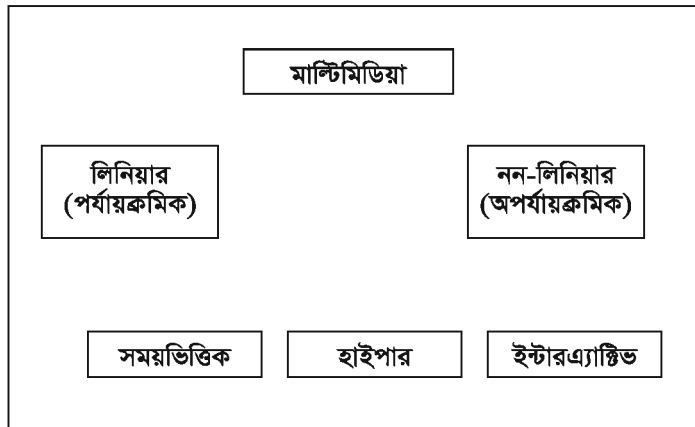
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অচিরেই লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া বিদায় নেবে। অন্যদিকে হাইপার মাল্টিমিডিয়া হল ইন্টারনেট বা ইন্টারনেটভিত্তিক, যার প্রধানতম বন্ধন হল হাইপার লিংক। সময়ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া ইন্টারএ্যাক্টিভ না হলেও হাইপার মাল্টিমিডিয়া ইন্টারএ্যাক্টিভ।

ইন্টারএ্যাক্টিভিটি : বহু মিডিয়ার ব্যবহার হলেই কেবল তাকে শাব্দিক অর্থে মাল্টিমিডিয়া বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটারের মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে ইন্টারএ্যাক্টিভিটি। একে মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিংও বলা হয়ে থাকে। এক সময় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বলতে শুধু বিভিন্ন ভাষা কিংবা ডাটাবেস প্রোগ্রামিং বোঝান হত। এখন অনেক এ্যাপ্লিকেশন দিয়েও প্রোগ্রামিং করা যায়।

একইভাবে অনেক মাল্টিমিডিয়া অথরিং টুলস (যেমন– অথরওয়্যার, এ্যাপল মিডিয়া টুল কিট), ইন্টারনেট ডেভেলপমেন্ট টুলস (যেমন– পেজ মিল, ফ্রন্টপেজ), সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টুলস (যেমন– মাইক্রোসফট এসডিকে, মেকিন্টাসসহ প্রোগ্রামারস ওয়ার্কশপ), গেমস ডেভেলপমেন্ট টুলস (এ্যাপল স্প্রাইট ডেভেলপমেন্ট টুলস), মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট টুলস (যেমন– ডিরেক্টর, হাইপার স্টুডিও, হাইপার কার্ড, সুপার কার্ড, অথরওয়্যার) ইত্যাদি রয়েছে। ইদানীং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের ধারণাটিও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রেই স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ম্যাক্রো দিয়েও প্রোগ্রামিংয়ের অনেক কাজ করা যাচ্ছে। এক্সেলের ম্যাক্রো এবং প্রোগ্রামিং, হাইপার কার্ডের স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টক, ডিরেক্টরের স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিঙ্গোসহ এমন অসংখ্য স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ম্যাক্রোর সাহায্যে এমনকি এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। ফলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কেবল ল্যাঙ্গুয়েজের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই, পেশা হিসেবে যদি কম্পিউটার প্রোগ্রামারের কথা বলা হয়, তাহলে যিনি সি++ জানেন তাকে যেমন বোঝান হবে, তেমনি যিনি ডিরেক্টরের লিঙ্গো জানেন তাকেও বোঝান হবে।

মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামার হিসেবে যিনি টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, এনিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তিনিই মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তুর প্রণেতা। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে তাদেরই মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামার (অথবা অথর) বলা যায় যাঁরা এসব মিডিয়া ব্যবহার করে ইন্টারএ্যাক্টিভ প্রোগ্রাম তৈরি করেন। বস্তুত বিষয়বস্তু তৈরি করা ও ইন্টারএ্যাক্টিভিটি যোগ করার মাঝে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে। ডিরেক্টরকে প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার বলা যাবে। এর সাহায্যে প্রিমিয়ার বা ফটোশপে তৈরি করা মিডিয়াগুলো মিলিয়ে একটি ইন্টারএ্যাক্টিভ সফটওয়্যার তৈরি করা যাবে।

ইন্টারএ্যাক্টিভিটি সম্পর্কেও একটি কথা বলা ভালো। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে একটি স্টাইল প্রয়োগ করলে যদি অক্ষরগুলো সুন্দর করে স্ক্রোল বা ফ্লাস করে বা ভিডিও ফাইলে একটি ইফেক্ট যোগ করায় কিংবা এনিমেশন যুক্ত করায় যদি কিছু একটা লাফ দেয় তাকে ইন্টারএ্যাক্টিভিটি বলা ঠিক হবে না। মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তু তৈরি করা ও প্রোগ্রামিং করতে পারা লোকের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়ছে এবং আগামী দিনে আরও বাড়বে।

মাল্টিমিডিয়া পিসির সংগঠন

আগে একটি সাধারণ পিসির সঙ্গে বাড়তি কয়েকটি যন্ত্র যোগ করে সেটিকে মাল্টিমিডিয়া পিসি তৈরি করা হত। একটি সাধারণ পিসির মাদার বোর্ড, পাওয়ার বোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, ভিডিও কার্ড, হার্ডডিক্স, ফ্লপি ড্রাইভ, কী-বোর্ড, মাউস ও মনিটর ইত্যাদির সঙ্গে সাউন্ড কার্ড ও সিডি ড্রাইভ যুক্ত করে মাল্টিমিডিয়া পিসি তৈরি করা হত। অনেক সময় একটি মাল্টিমিডিয়া পিসিতে থ্রিডি এক্সিলেটর কার্ডও যুক্ত করা হত। এতে সাধারণ পিসির চেয়ে অতিরিক্ত ভিডিও র‍্যাম বা মেমোরি থাকতে পারে। এছাড়া এতে টিভি কার্ড, মডেমও যুক্ত হতে পারে। আরও যুক্ত করতে হত স্পীকার, মাইক্রোফোন। আর সিডি ড্রাইভের বদলে ডিভিডি ড্রাইভ এবং ভিডিও ক্যাপচার কার্ডও মাল্টিমিডিয়া পিসিতে যুক্ত করা হত। কিন্তু, বর্তমান পিসিতে সাধারণভাবে এ সব উপকরণ থাকেই। কাজেই, এখনকার পিসি মানেই মাল্টিমিডিয়া পিসি।

তবুও, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করার জন্য উপরের বর্ণিত একটি পিসি যথেষ্ট হলেও মাল্টিমিডিয়া পণ্য প্রস্তুতের জন্য এর চেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করতে হতে পারে। বিশেষত ভিডিও সম্পাদনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানের ক্যাপচার কার্ড বা ইন্টারফেস হিসেবে ফায়ারওয়্যার বা ইউএসবি কার্ড, অধিকতর র‍্যাম, উন্নতমানের ভিজিএ

কার্ড, থ্রিডি এক্সিলেটর কার্ড ও উচ্চগতির হার্ডডিস্ক ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। এনিমেশনের জন্য সর্বোচ্চ গতির মাইক্রোপ্রসেসর এবং অধিকতর র‍্যাম ও ভি-র‍্যামের প্রয়োজন হবে।

মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক পেশা ও প্রয়োগক্ষেত্র

বাংলাদেশে বর্তমানে যে সব মাল্টিমিডিয়ার কর্মক্ষেত্র রয়েছে তার মধ্যে প্রায় প্রতিটি হচ্ছে আলাদা আলাদা মিডিয়া ভিত্তিক। অডিও জগতে বাংলাদেশে বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে। এ সব অডিও স্টুডিওতে ডিজিটাল সিস্টেম রয়েছে।

ভিডিও জগতটি শুরু হয়েছে বেশ আগেই। কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল চালু হবার ফলে জগতটা বেশ বাড়ছে। হোম ভিডিও জগতটি অন্য সকল দেশের মতোই আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে সেখানে প্রফেশনাল বা মধ্যম মানের কাজেরও তেমন সম্প্রসারণ হয়নি। এই ক্ষেত্রটি ভিডিও জগতের একটি বিশাল ক্ষেত্র হতে পারে। এর পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ট্রেনিং ভিডিও তৈরি করার ক্ষেত্রেও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ভিডিও সম্পর্কে প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্প্রচার, এডভার্টাইজিং, হোম ভিডিও, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সফটওয়্যার ফার্ম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ওয়েব পেজ ডিজাইন ফার্ম ইত্যাদিতে সহজেই কর্মসংস্থান হতে পারে।

একুশ শতকে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার একটি বিশাল ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এক সময়ে ছোটখাটো কর্মক্ষেত্র থাকলেও মাল্টিমিডিয়াকে এখন জীবনের চারপাশে সর্বত্রই ব্যবহার করা যায়। অনেকগুলো বৃহৎ ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে সব ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। যেমন–

ক. ব্যবসায় : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের উপস্থাপনা, সিমুলেশন, পরিসংখ্যানপত্র, মডেলিং, বাজার সিমুলেশন, বিনিয়োগ বিশ্লেষণ, ডিজিটাল ব্রশিউর, ই-কমার্স ইত্যাদি নানা কাজে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়। যে কোনো ধরনের পণ্য বাজারজাতকরণ ও প্রমোশনের জন্য টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন, ইন্টারনেটের জন্য মাল্টিমিডিয়া বিজ্ঞাপন, ভিডিওভিত্তিক বিপণন ও প্রমোশন এবং মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক বিক্রয় উপস্থাপনায় মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।

খ. বিনোদন : মাল্টিমিডিয়া বিনোদনের পদ্ধতিই পাল্টে দিয়েছে। টিভি, ভিডিও, চলচ্চিত্র এ সব আলাদা-আলাদা বিনোদন মাধ্যমের সর্বত্রই মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ হচ্ছে। এখন চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্রের স্পেশাল ইফেক্ট প্রদান, ভিডিও নির্মাণ, ভিডিওতে এনিমেশন ও স্পেশাল ইফেক্ট প্রদান, টেলিভিশনের জন্য অনুষ্ঠান তৈরি, ইন্টারএ্যাক্টিভ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান তৈরি, কম্পিউটার গেমস তৈরি এবং বিনোদন পণ্য তৈরি করার জন্য মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।

গ. বিজ্ঞান ও গবেষণা : বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহার করা যায়। চিকিৎসা ও জেনেটিক গবেষণা, রাসায়নিক মডেলিং, গাণিতিক গবেষণা, মহাকাশ গবেষণা, পদার্থবিদ্যা গবেষণা ইত্যাদি কাজে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।

ঘ. ডিজিটাল প্রকাশনা : প্রকাশনা বলতে এখনও কাগজ ভিত্তিক প্রকাশনাকেই বোঝান হয়। তবে, অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশনা হবে ডিজিটাল।

ঙ. রিয়েল এস্টেট : রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। এই ব্যবসায় মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। যে সব ফ্লাট, ঘর-বাড়ি তৈরি হবে তার মডেল প্রস্তুত, উপস্থাপনা ইত্যাদি মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে করা যায়।

চ. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়। অপরাধীদের চেহারা অংকন, অপরাধের এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ, ডাটাবেজ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।

জ. শিক্ষা : মাল্টিমিডিয়ার একটি বৃহৎ প্রয়োগক্ষেত্র হল শিক্ষা। ইন্টারএ্যাক্টিভ শিক্ষা। ইন্টারএ্যাক্টিভ শিক্ষামূলক সফটওয়্যারের সাহায্যে শিক্ষার অভিজ্ঞতাই ভিন্নরূপ করা যায়। এক সময় হয়ত সমস্ত বই ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়ায়

তৈরি ও ব্যবহার করা হবে। শিক্ষামূলক গবেষণা এবং ইন্টারনেট, এন্ট্রানেট গড়ে তুলতেও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।

সারমর্ম

আজকের দিনে কম্পিউটার ছাড়া আমাদের জীবন প্রায় অচল। এক সময়ে কেবলমাত্র অঙ্ক বা হিসেবের কাজে ব্যবহৃত হলেও কম্পিউটার এখন বহু ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়। তথ্য সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার একটি অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যম। শিল্প-কারখানার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার অপরিহার্য। প্রকৌশল, চিকিৎসা, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যোগাযোগ, গবেষণা এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনায় কম্পিউটারের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ কাজেও কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রহিম জেলা সদরের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য সে তার পড়ালেখায় কম্পিউটারের সহায়তা নিতে চায়। এক্ষেত্রে সে লাভবান হতে পারে-

i. সিডি ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া কোর্সওয়্যার-এর মাধ্যমে
ii. ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ডাউনলোড-এর মাধ্যমে
iii. বন্ধুদের সাথে পঠিত কোনো বিষয় নিয়ে ই-মেইলে যোগাযোগের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. i. ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

কবির VGA কার্ড এবং ফ্লপি ড্রাইভ সংযুক্ত কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। সম্প্রতি সে তার PC-টিকে মাল্টিমিডিয়াযুক্ত কম্পিউটারে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২. কবিরের কম্পিউটারে কী কী হার্ডওয়্যার সংযোজন অপরিহার্য ?

ক. সুপার কার্ড, স্পীকার ও মডেম　　খ. সাউন্ড কার্ড, স্পীকার ও ডিভিডি ড্রাইভ
গ. সাউন্ড কার্ড, হাইপার কার্ড ও ডিভিডি ড্রাইভ　　ঘ. সুপার কার্ড, হাইপার কার্ড ও মডেম।

৩. সংযোজন শেষে কবির কম্পিউটারটি ব্যবহার করতে পারবে–

i. শিক্ষা, গান শোনা ও চলচ্চিত্র দেখায়
ii. গবেষণা, যোগাযোগ ও টিভি দেখায়
iii. ই-মেইল, ওয়েব ব্রাউজিং ও পত্রিকা পড়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত কম্পিউটারের আধুনিক ধারণাটি কী?

ক. ইন্টারএ্যাক্টিভিটি
খ. ইলেক্ট্রনিক কমার্স
গ. ইলেক্ট্রনিক ব্যাংক
ঘ. ইলেক্ট্রনিক শেয়ারিং

সৃজনশীল প্রশ্ন

আমিনা নবম শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। সে তার বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়ে দেখল তার বান্ধবী কম্পিউটারে ইংরেজি ভাষা শিখছে। শব্দ ও ছবির সমন্বিত ব্যবহারে কম্পিউটারে ইংরেজি শেখার বিষয়টি তাকে চমৎকৃত করল। বাড়িতে এসে আমিনা তার পিতাকে মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ একটি কম্পিউটার ক্রয় করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

ক. মাল্টিমিডিয়া কী?
খ. মাল্টিমিডিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
গ. কম্পিউটারের ব্যবহার কীভাবে আমিনার লেখাপড়াকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে? বর্ণনা কর।
ঘ. কম্পিউটারের ব্যবহার আমিনার লেখাপড়াকে আরও ফলপ্রসূ করবে– বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

ব্যবহারিক

ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব

কম্পিউটার শিক্ষার ঐতিহাসিক অংশ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তত্ত্বীয় জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাড়া কম্পিউটারের তাত্ত্বিক জ্ঞান কোনো কাজে লাগে না বললেই চলে। কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেই কম্পিউটার প্রযুক্তির জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানই তার শিক্ষার্থীদের জন্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে পারে।

বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করা জন্য বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি থাকে। কম্পিউটারের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্যও তেমনি কম্পিউটার ল্যাব বা কম্পিউটার ল্যাবরেটরি থাকা প্রয়োজন। কম্পিউটার ল্যাব ছাড়া সত্যিকার অর্থে কম্পিউটারে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

বেশ কিছু কম্পিউটার এবং অনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুললে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রথম শর্ত পূরণ করা হবে। এরপর প্রয়োজন হবে উপযুক্ত শিক্ষকের। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে পাস করা শিক্ষক হলে ভালো। না হলে আপাতত যে কোনো একজন বিজ্ঞানের শিক্ষককে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে কম্পিউটার শেখানোর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তিনি তাঁর মূল বিষয়ের অতিরিক্ত হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে পাস করা শিক্ষক না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

কম্পিউটার শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি হলে একসঙ্গে ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে ব্যবহারিক ক্লাস নিতে হবে। একজন শিক্ষকের পক্ষে কম্পিউটার ল্যাবে এতটা সময় দেওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি হলে কম্পিউটার ল্যাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বক্ষণিক শিক্ষা সহায়তার জন্য একজন ল্যাব গাইডের প্রয়োজন হবে।

কম্পিউটার বিষয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কম্পিউটার ল্যাব, উপযুক্ত কম্পিউটার শিক্ষক, ল্যাব গাইড ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

কম্পিউটার ল্যাব ও ব্যবহারিক শিক্ষার উপকরণ

কম্পিউটার ল্যাবের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কম্পিউটার। কিন্তু, একটি কম্পিউটার ল্যাবে কয়টি কম্পিউটার থাকা প্রয়োজন, প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি করে কম্পিউটার বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন কি-না ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ ধারণা থাকা দরকার। সরকারিভাবে প্রতি পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি করে কম্পিউটারের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছিল এক সময়ে। এ অনুপাতটি কতটা কার্যকর এবং বাস্তব সম্মত তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুঝতে পারবেন। তাঁরা প্রয়োজন হলে কম্পিউটারের প্রাপ্যতা অনুযায়ী কম্পিউটার-শিক্ষার্থী অনুপাত ঠিক করে নেবেন।

কম্পিউটার ল্যাবের যন্ত্রপাতি

একটি কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটার ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে মাইক্রোপ্রসেসর, হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, সিডি ড্রাইভ, মাদারবোর্ড, সংযোগ প্রণালি, বিভিন্ন তারের ব্যবস্থাপনা, নেটওয়ার্ক পদ্ধতি এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কম্পিউটারের ইতিহাস, সংগঠন, প্রোগ্রামিং এসব বিষয়ে বিভিন্ন চিত্র এবং নক্সা ব্যবহার করে শিক্ষা দিতে হবে। এটি কম্পিউটার ল্যাব ছাড়াও ক্লাসরুমে স্থাপন করা যেতে পারে। ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিট, ডাটাবেজ, অপারেটিং সিস্টেম ও ভিজ্যুয়াল বেসিক বিষয়ে সরাসরি কম্পিউটার ল্যাবের সহায়তা নিতে হবে। এসব বিষয়ে তত্ত্বীয় ক্লাস নেবার সময় তত্ত্বীয় ক্লাসে কম্পিউটার নিয়ে প্রজেক্টর বা মাল্টিপল মনিটর কিংবা টেলিভিশনের পর্দা ব্যবহার করে ছাত্রদেরকে বিষয়টির

ডেমোন্সট্রেশন দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা কম্পিউটার ল্যাবে সেই কাজগুলো সহজেই করতে পারবে।

কম্পিউটার ল্যাবের একটি কম্পিউটারে কমপক্ষে ৫০০ মে:হা: বা তার চেয়ে উচ্চগতির মাইক্রোপ্রসেসর, ১৬ মেগাবাইট ভিডিও র‍্যাম, ৬৪ মেগাবাইট এসডির‍্যাম, সিডি রম, নেটওয়ার্ক কার্ড, মডেম থাকতে হবে। কম্পিউটারের সাথে কমপক্ষে ১৫ ইঞ্চি মনিটর ব্যবহার করা যেতে পারে।

কম্পিউটারে কাজ করে প্রিন্ট নেওয়ার জন্য বাবল জেট প্রিন্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, লেজার প্রিন্টার হলে ভালো হয়। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, বিদ্যুতের ভোল্টেজ ওঠানামা করা ইত্যাদি কারণে কম্পিউটারের ক্ষতি হয়। এ ধরনের বৈদ্যুতিক অস্বাভাবিকতার কারণে কম্পিউটারকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সার্জ প্রটেক্টর/ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার/ইউপিএস ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। কম্পিউটার ল্যাবের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত হতে হবে এবং এর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিদ্যুতের আর্থিং ব্যবস্থাটি যথাযথ থাকা দরকার।

কম্পিউটার ল্যাবে প্লাস্টিকের ম্যাট ব্যবহার করে কক্ষটিকে ধুলাবালিমুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করে কক্ষটিকে শীতল রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর্থিক সংকুলান করতে পারলে কম্পিউটার ল্যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা উত্তম।

কম্পিউটার ল্যাবের যন্ত্রপাতির যত্ন

কম্পিউটার ল্যাবের যন্ত্রপাতির যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে। কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ অধ্যায়ের যে সব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। বিশেষ করে এটি মনে রাখা দরকার যে কম্পিউটার ল্যাবে খাওয়া দাওয়া করা ঠিক নয়। তাতে জুতো পায়ে প্রবেশ করা উচিৎ নয়। ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কম্পিউটার চালু করার প্রস্তুতি

কম্পিউটার চালু করার আগে দেখে নিতে হবে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন যথাযথ রয়েছে কি-না। এ জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুযায়ী পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে–

- পাওয়ার সাপ্লাই-এর সুইচ অন করতে হবে।
- ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার বা ইউপিএস/আইপিএস-এর সুইচ অন করতে হবে।
- কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে।
- মনিটরের পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে।

  অনেক সময় মনিটর কম্পিউটারের সিপিইউ থেকে পাওয়ার নিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করলেই মনিটরটির পাওয়ারও এসে যায়। দেখা যায় পাওয়ার সুইচ অন করার পর কম্পিউটারের সাথে যুক্ত কী-বোর্ডে, কম্পিউটারের সিপিইউর লেড বা মনিটরের লেড বোতামে সবুজ জাতীয় আলো প্রদর্শিত হচ্ছে।
- কম্পিউটারের সাথে এক্সটারনাল মডেম থাকলে এবং তা ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে তার পাওয়ার সুইচও অন করতে হবে।
- কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টার যুক্ত থাকলে এবং তা ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে তার পাওয়ার সুইচও অন করতে হবে।

অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মতোই কম্পিউটারের অফ/অন সুইচ দিয়ে পাওয়ার অফ/অন করতে হয়। তবে অনেক কম্পিউটার বা প্রিন্টার আছে যা ইউটিলিটি পাওয়ার সুইচ অন করলেই অন হয়। আবার ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট সময় সেটি ব্যবহার না করলে তা আপনাআপনি অফ হয়ে যায়।

কম্পিউটার অন হবার পর ব্যবহারকারীর সামনে বেশ কতকগুলো পর্দা আসবে এবং কিছুক্ষণ থাকার পর তা মিলিয়ে যাবে। এরপর স্থায়ীভাবে একটি পর্দা আসবে। এই অবস্থায় যে পর্দাটি আসবে তাকে ডেস্কটপ বলে। এটিই হল কম্পিউটারের সাথে মানুষের কাজ করার প্রথম ক্ষেত্র। এটি অপারেটিং সিস্টেম থেকে তৈরি করা হয়। এই পর্যায় থেকেই কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু করতে হয়।

অপারেটিং সিস্টেম

(উইন্ডোজ এক্সপি/ভিস্তা)

অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে কম্পিউটার পরিচালনার সফটওয়্যার। অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার দিয়ে কোনো কাজই করা যায় না। আইবিএম কম্পাটিবল কম্পিউটারের এ যাবৎ সর্বশেষ অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ ভিস্তা। তবে, এখনও পর্যন্ত উইন্ডোজ এক্সপি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। অভ্যাস পরিবর্তন হতে সময় লাগে।

ব্যবহারকারীদের অভ্যাস পরিবর্তনের ধারায় উইন্ডোজ ভিস্তার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে এক সময় উইন্ডোজ এক্সপির ব্যবহার উঠে যাবে। উইন্ডোজ ভিস্তা একমাত্র অপারেটিং সিস্টেমে পরিণত হবে।

কম্পিউটার ক্রয়ের সময় অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কারণে অপারেটিং সিস্টেমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তখন অপারেটিং সিস্টেম ফেলে দিয়ে বা আনইনস্টল করে নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হয়।

কম্পিউটার এবং মনিটরের সুইচ অন করার পর কিছুক্ষণের মধ্যে যদি মনিটরের পর্দায় কোনো কিছু দেখা না যায় তাহলে বুঝতে হবে কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা হয়নি অথবা অপারেটিং সিস্টেম কাজ করছে না। মনিটর খরাপ হওয়ার কারণেও এ রকম হতে পারে। এ জন্য মনিটরটিও পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। অপারেটিং সিস্টেম এবং মনিটর সচল এবং কাজের উপযোগী থাকলে কম্পিউটার এবং মনিটরের সুইচ অন করার কিছুক্ষণের মধ্যেই মনিটরের পর্দায় উইন্ডোজ এক্সপি/উইন্ডোজ ভিস্তার ডেস্কটপ পরিবেশ চলে আসবে।

ডেস্কটপ পরিবেশে বাম পাশে উপর থেকে নিচের দিকে কয়েকটি আইকন থাকে এবং আইকনের নিচে ঐ আইকনের পরিচয় লেখা। যেমন উইন্ডোজ এক্সপিতে মাই কম্পিউটার (My Computer), মাই ডকুমেন্ট (My Document), রিসাইকেল বিন (Recycle Bin) এবং উইন্ডোজ ভিস্তাতে কম্পিউটার (Computer), রিসাইকেল বিন (Recycle Bin) এবং মাই ডকুমেন্টের পরিবর্তে ঐ ফোল্ডারের পরিচিতি হিসেবে উইন্ডোজ ইনস্টল করার সময় যাঁর নাম ব্যবহার করা হয় তাঁর নাম থাকে। এ
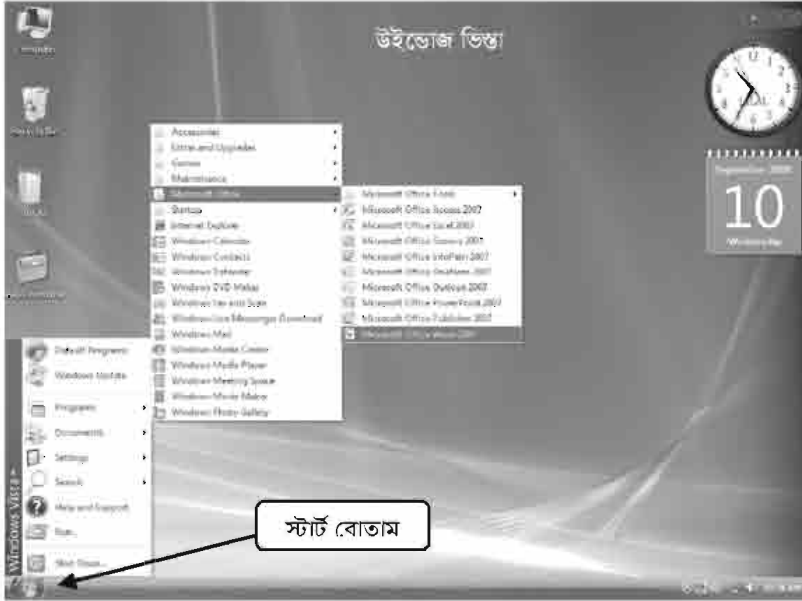
ডেস্কটপ থেকে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম খোলা

উইন্ডোজ এক্সপি এবং উইন্ডোজ ভিস্তা উভয় অপারেটিং সিস্টেমে একই নিয়মে ডেক্সটপ পরিবেশ থেকে এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম খুলতে হয়। ধরা যাক, লেখালেখির কাজের জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রাম খুলতে হবে। এ জন্য–

১. স্টার্ট (Start) মেনুতে ক্লিক করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

২. এ ফ্লাইআউট মেনুর প্রোগ্রামস (Programs) মেনুতে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে আর একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

৩. এ ফ্লাইআউট মেনু তালিকা থেকে মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office) মেনুতে ক্লিক করলে পাশেই আর একটি ফ্লাইআউট মেনুতে মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office)-এর প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে।

৪. এ তালিকা থেকে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৭ (Microsoft Office Word 2007)-এ ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৭ (Microsoft Office Word 2007) খুলে যাবে।

কম্পিউটার/মাই কম্পিউটার-এর ব্যবহার

কম্পিউটার/মাই কম্পিউটার হচ্ছে একটি ফোল্ডার। কম্পিউটার/মাই কম্পিউটার আইকনে ডবল-ক্লিক করলে কম্পিউটার/মাই কম্পিউটার ফোল্ডারটি খুলে যায়। এ ফোল্ডারের ভেতর কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক, সিডি ড্রাইভ, ডিভিডি ড্রাইভ, কম্বো ড্রাইভ, ফ্লপি ড্রাইভের আইকন থাকে। বর্তমানের কম্পিউটারে অবশ্য ফ্লপি ড্রাইভ থাকে না।
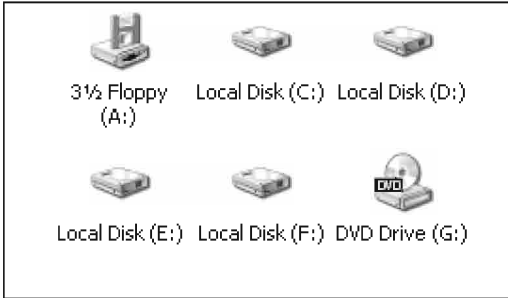
একটি কম্পিউটারে একাধিক হার্ডডিস্ক থাকতে পারে। আবার, একটি হার্ডডিস্ককেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। একটি হার্ডডিস্ককে কাজের সুবিধার্থে কয়েক ভাগে ভাগ করে নেওয়াকে কম্পিউটারের ভাষায় বলা হয় পার্টিশন। পার্টিশনগুলো C:\ D:\ E:\ F:\ ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। এতে ঐ পার্টিশনগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন হার্ডডিস্ক বলে মনে হয়। এর ভেতর থেকে যে কোনো পার্টিশন আইকনে ডবল-ক্লিক করলে হার্ডস্কির ঐ অংশের ফোল্ডার খুলে যাবে এবং ঐ ফোল্ডারের ভেতর কী কী ফোল্ডার ও ফাইল আছে তার তালিকা দেখা যাবে। এ তালিকা থেকে যে কোনো ফোল্ডারে ডবল-ক্লিক করলে ঐ ফোল্ডারের ভেতরে রাখা ফাইলের তালিকা খুলে যাবে। ফাইলের নামের উপর বা আইকনের উপর ডবল-ক্লিক করলে ঐ ফাইলটি খুলে যাবে।

ফাইল ও ফোল্ডার

ফাইল

ফাইল হচ্ছে যে কোনো বিষয়ের একটি খোলা কাগজের মতো। একটি খোলা কাগজের উপর লেখা থাকতে পারে, ছবি থাকতে পারে, এবং হিসেব-নিকেশের কাজ থাকতে পারে। এ ধরনের কোনো কাজের জন্য একাধিক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হতে পারে। কাগজের উপর লেখা বা অন্য কোনো কাজ করার পর আবার সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য এগুলো একেকটি নাম দিয়ে রাখতে হয়। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে গুছিয়ে রাখা একেকটি কাজের কাগজকে বলা হয় নথি বা ফাইল। যেমন– একটি সংকলন প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে প্রবন্ধ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামযুক্ত প্রতিটি প্রবন্ধ হচ্ছে একেকটি নথি বা ফাইল। একই রকমভাবে ছবি আঁকা বা হিসেব-নিকেশের জন্য ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে চিহ্নিত কাজগুলোও একেকটি নথি বা ফাইল হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি কাজ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে রাখা হলে পরবর্তী প্রয়োজনে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

ফোল্ডার

অফিস-আদালতে ব্যবহৃত ফাইল কেবিনেটের ড্রয়ারকে ফোল্ডারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ফাইল কেবিনেটটি যদি হর্ডডিস্ক ধরা হয় তাহলে এর প্রতিটি ড্রয়ার হচ্ছে একেকটি ফোল্ডার। আর, উপরে বর্ণিত ফাইলগুলো এ সব ড্রয়ারে রাখা হয়। একেক ধরনের কাজের ফাইল বা নথি একসঙ্গে একটি ড্রয়ারে রেখে ঐ ড্রয়ারের গায়ে পরিচিতিমূলক লেখা লাগিয়ে রাখতে হয়। যেমন– একটি ড্রয়ারে 'একুশে সংকলন', একটি ড্রয়ারে 'বিজয় দিবস সংকলন' ইত্যাদি। এতে ড্রয়ারের লেখা দেখেই বোঝা যায় কোন ড্রয়ারে কোন বিষয়ের নথিপত্র আছে। হার্ডস্কের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী যত প্রয়োজন ফাইল বা ফোল্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ করা যায়।

সুষ্ঠুভাবে ফাইল ও ফোল্ডার তৈরি ও ব্যবহারের ফলে কাজের সময় প্রয়োজনীয় ফাইলটি খুঁজে পেতে সহজ হয়।

ডেস্কটপে ফোল্ডার তৈরি করা

কাজ শুরুর আগেই নির্দিষ্ট নামে ফোল্ডার তৈরি করে নেওয়া যায়। ডেস্কটপে ফোল্ডার তৈরি করার জন্য–

১. ডেস্কটপের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে ক্লিক করলে একটি কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু পাওয়া যাবে।

২. কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু থেকে নিউ (New) সিলেক্ট করলে আর একটি ফ্লাইআউট মেনু আসবে।

৩. ফ্লাইআউট মেনু থেকে ফোল্ডার (Folder) সিলেক্ট করতে হবে।

– এ পর্যায়ে ডেস্কটপের উপর একটি ফোল্ডার আইকন আসবে এবং আইকনের নিচে নিউ ফোল্ডার (New Folder) লেখাটি সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে।
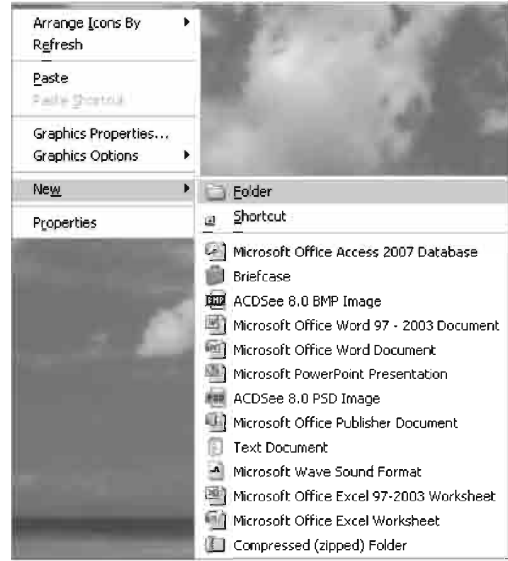
৪. কী-বোর্ডের ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে নিউ ফোল্ডার (New Folder) লেখাটি মুছে যাবে। ফোল্ডারের জন্য যথাযথ একটি নাম টাইপ করে মাউস পয়েন্টার ডেস্কটপের অন্য কোনো জায়গায় ক্লিক করতে হবে।

New Folder

ডেস্কটপে ফাইল তৈরি করা

সাধারণত ডেস্কটপে ফাইল তৈরি করা হয় না। কিন্তু, ইচ্ছে করলে ডেস্কটপ থেকেও ফাইল তৈরি করে নেওয়া যায়। ডেস্কটপে ফাইল তৈরি করার জন্য–

১. ডেস্কটপের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে ক্লিক করলে একটি কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু পাওয়া যাবে।

২. কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু থেকে নিউ (New) সিলেক্ট করলে আর একটি ফ্লাইআউট মেনু আসবে।

৩. লেখালেখির কাজের জন্য ফাইল তৈরি করার জন ফ্লাইআউট মেনু থেকে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ৯৭-২০০৩ (Microsoft Office Word 97-2003) বা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৭ (Microsoft Office Word 2007) সিলেক্ট করতে হবে।

– এ পর্যায়ে ডেস্কটপের উপর একটি ফোল্ডার আইকন আসবে এবং আইকনের নিচে Microsoft Office Word 97-2003 বা Microsoft Office Word 2007 লেখাটি সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে।

৪. কী-বোর্ডের ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে Microsoft Office Word 97-2003 বা Microsoft Office Word 2007 লেখাটি মুছে যাবে। ফাইলের জন্য যথাযথ একটি নাম টাইপ করে মাউস পয়েন্টার ডেস্কটপের অন্য কোনো জায়গায় ক্লিক করতে হবে।
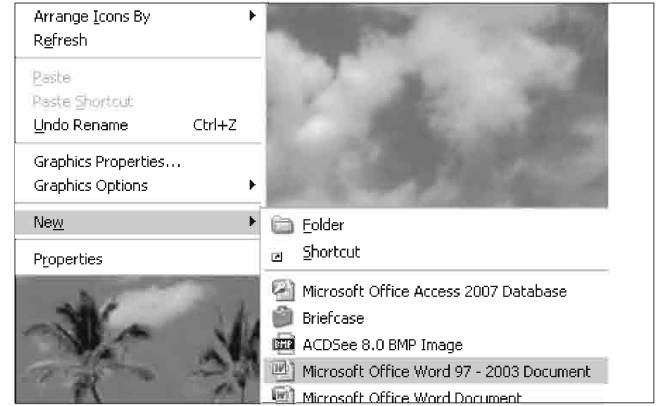
পেন ড্রাইভ/হার্ডড্রাইভ ফরমেট করা

বর্তমানে ফ্লপি ডিস্কের ব্যবহার আর তেমন নেই বললেই চলে। ফ্লপি ডিস্কের স্থান দখল করে নিয়েছে পেন ড্রাইভ। ফ্লপি ডিস্কের চেয়ে পেন ড্রাইভের ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এ ছাড়া বাইরে থেকেও হার্ডডিস্ক যুক্ত করে তথ্য আদান-প্রদান ও তথ্য সংরক্ষণের কাজ করা হয়। এ সব ড্রাইভ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনেক সময় নানা প্রকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এরূপ সমস্যা দূর করে ডিস্কটিকে আবার কাজের উপযোগী করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিস্কটি ফরমেট করে নিতে হয়।
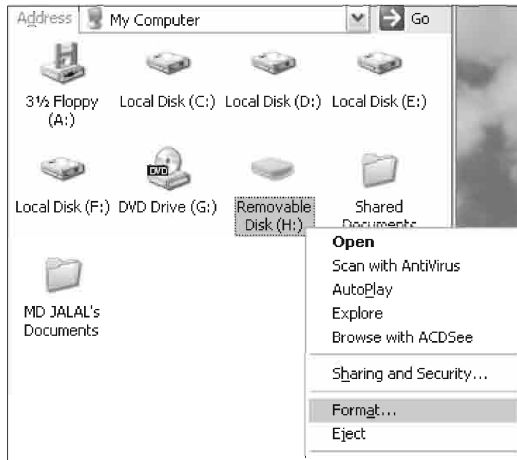
ভাইরাস আক্রান্ত অনেক সময় হার্ডডিস্কও কাজের অনুপযোগী হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে হার্ডডিস্কও ফরমেট করার প্রয়োজন হয়। তবে, হার্ডডিস্ক ফরমেট করার কাজ অভিজ্ঞ হাতে এবং দক্ষ ব্যক্তির দ্বারাই করানো উচিত।

মনে রাখতে হবে, ডিস্ক ফরমেট করলে ঐ ডিস্কে সংরক্ষিত সকল তথ্য মুছে যাবে। কাজেই, ডিস্ক ফরমেট করার আগে প্রয়োজনীয় ফাইল অন্য ডিস্কে কপি করে রাখতে হবে। পেন ড্রাইভ এবং বাইরে থেকে যুক্ত হার্ডডিস্ক (External Hard Disk) ফরমেট করার জন্য–

১. ঐ ড্রাইভ আইকনের উপর মাউসের ডান বোতাম চেপে ক্লিক করলে একটি কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু পাওয়া যাবে।

২. কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু থেকে ফরমেট (Format ...) সিলেক্ট করলে যে ডিস্কটি ফরমেট করা হবে সেই ডিস্কের নামে ডায়লগ বক্স আসবে।

৩. ডায়লগ বক্সে স্টার্ট (Start) বোতামে ক্লিক করলে ফরমেটিংয়ের কাজ শুরু হবে।

৪. ফরমেটিং সমাপ্ত হলে ডায়লগ বক্সের ক্লোজ (Close) বোতামে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স চলে যাবে।

এক ফোল্ডার থেকে অন্য ফোল্ডারে ফাইল/ফোল্ডার কপি করা

এক ফোল্ডার থেকে অন্য ফোল্ডারে ফাইল/ফোল্ডার কপি করার জন্য–

১. যে ফোল্ডার থেকে ফাইল কপি করতে হবে এবং যে ফোল্ডারে স্থানান্তরিত করতে হবে সেই দুটি ফোল্ডার খুলতে হবে।

২. যে ফাইলটি কপি করতে হবে সেই ফাইলটি সিলেক্ট করার পর ড্র্যাগ করে গন্তব্য ফেল্ডারে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

অথবা

ফাইলটি সিলেক্ট করার পর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিলে একটি বিষয় সংবেদনশীল মেনু (Context Sensitive Menu) আসবে। এ মেনু থেকে কপি কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে।

৩. যে ফোল্ডারে স্থানান্তরিত করতে হবে সেই ফোল্ডারের ভেতরে মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে ক্লিক করলে বিষয় সংবেদনশীল (Context Sensitive Menu) মেনু আসবে। এ মেনু থেকে পেস্ট কমান্ড সিলেক্ট করলে কপি করা ফাইলটি গন্তব্য ফোল্ডারে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।
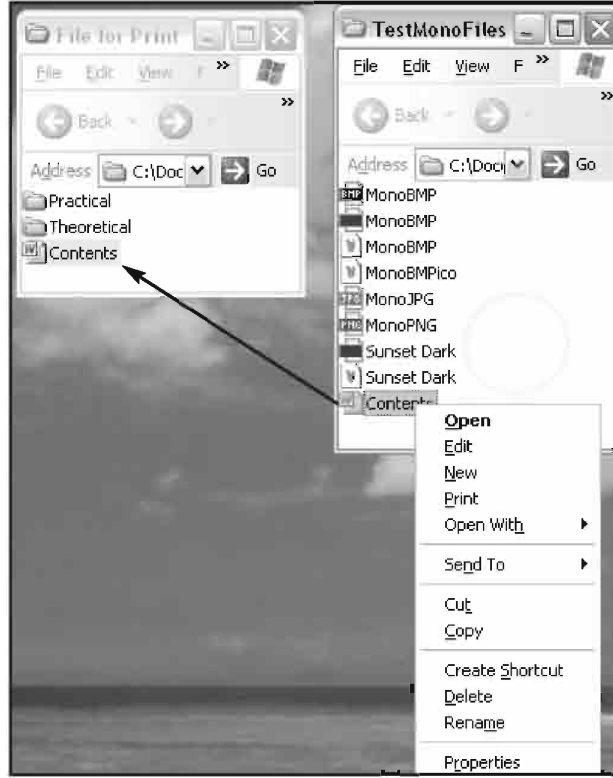
ডেস্কটপ থেকে ফোল্ডার/ফাইল ফেলে দেওয়া

ডেস্কটপ থেকে ফোল্ডার/ফাইল ফেলে দেওয়ার জন্য–

১. মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে নির্দিষ্ট ফাইল বা ফোল্ডারটি সিলেক্ট করলে একটি বিষয় সংবেদনশীল (Context Sensitive Menu) মেনু আসবে।

২. বিষয় সংবেদনশীল (Context Sensitive Menu) মেনু থেকে ডিলিট কমান্ড সিলেক্ট করলে ফাইল/ফোল্ডারটি বাতিল হয়ে যাবে।

রিসাইকেল বিন

ডেস্কটপ থেকে কোনো ফাইল বা ফোল্ডার ফেলে দেওয়ার জন্য রিসাইকেল বিন (Recycle Bin) ব্যবহার করা হয়। রিসাইকেল বিনের মাধ্যমে ফাইল বা ফোল্ডার ফেলে দেওয়ার জন্য ঐ ফাইল বা ফোল্ডারে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে রিসাইকেল বিন আইকনের উপর নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এতে ঐ ফাইল বা ফোল্ডারটি রিসাইকেল বিনের ভেতরে অবস্থান করবে।

রিসাইকেল বিন থেকে ফাইল বা ফোল্ডার স্থায়ীভাবে ফেলে দেওয়ার জন্য–

১. রিসাইকেল বিনের আইকনের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে বিষয় সংবেদনশীল মেনু (Context Sensitive Menu) পাওয়া যাবে।

২. কনটেক্সট সিনসিটিভ মেনু থেকে এমটি রিসাইকেল বিন (Empty Recycle Bin) কমান্ড সিলেক্ট করলে একটি সতর্কতাসূচক বার্তা বক্স আসবে।
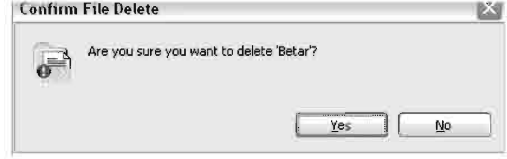
৩. সতর্কতাসূচক বার্তা বক্সের 'হ্যাঁ'সূচক (Yes) বোতামে ক্লিক করলে রিসাইকেল বিনের ভেতরে জমে থাকা সকল ফাইল ফোল্ডার স্থায়ীভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

রিসাইকেল বিন থেকে ফাইল/ফোল্ডার পুনরুদ্ধার করা

কোনো ফাইল বা ফোল্ডার ড্র্যাগ করে রিসাইকেল বিনের উপর ছেড়ে দিলে ঐ ফাইল বা ফোল্ডার রিসাইকেল বিনে অবস্থান করে। স্থায়ীভাবে বাতিল করে দেওয়ার আগে রিসাইকেল বিনে অবস্থিত ফাইল বা ফোল্ডার পুনরুদ্ধার করা যায়। এ জন্য–

১. মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে রিসাইকেল বিন আইকনে ক্লিক করলে কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু পাওয়া যাবে।

২. কনটেক্সট সেনসিটিভ মেনু থেকে এক্সপ্লোর (Explore) সিলেক্ট করলে রিসাইকেল বিন ডায়লগ বক্স আসবে।

৩. এ ডায়লগ বক্সে অবস্থিত যে ফাইল বা ফোল্ডার স্থায়ীভাবে ফেলে দিতে হবে সেই ফাইল বা ফোল্ডার সিলেক্ট করতে হবে।

৪. এডিট মেনু থেকে রেস্টোর (Restore) সিলেক্ট করলে রিসাইকেল বিন ডায়লগ বক্সে সিলেক্ট করা ফাইল/ফোল্ডারগুলো পূর্বের জায়গায় চলে যাবে। অর্থাৎ, যেখান থেকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসা হয়েছিল সেখানে চলে যাবে।

কম্পিউটার বন্ধ করা

কম্পিউটার বন্ধ করার জন্য–

১. স্টার্ট বোতামে ক্লিক করলে ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

২. ফ্লাইআউট মেনু থেকে টার্ন অফ কম্পিউটার (Turn Off Computer) সিলেক্ট করলে টার্ন অফ কম্পিউটার (Turn Off Computer) ডায়লগ বক্স আসবে।

৩. ডায়লগ বক্সে–

ক. টার্ন অফ (Turn Off) বোতামে ক্লিক করলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যাবে।

খ. রিস্টার্ট (Restart) বোতামে ক্লিক করলে কম্পিউটার পুনরায় চালু হবে।

গ. ক্যান্সেল (Cancel) বোতামে ক্লিক করলে কম্পিউটার বন্ধ না হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ২০০৭ খোলা

ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামের সাহায্যে লেখালেখির কাজ শুরু করার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম খুলে নিতে হবে। ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম খুলতে হয় ডেস্কটপ পরিবেশ থেকে। ডেস্কটপ পরিবেশ থেকে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম খোলার জন্য–

স্টার্ট (Start) মেনুতে ক্লিক করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে। এ ফ্লাইআউট মেনুর প্রোগ্রামস (Programs) মেনুতে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে আর একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে। এ ফ্লাইআউট মেনু তালিকা থেকে মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office) মেনুতে ক্লিক করলে পাশেই আর একটি ফ্লাইআউট মেনুতে মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office)-এর প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৭ (Microsoft Office Word 2007)-এ ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৭ (Microsoft Office Word 2007) খুলে যাবে।
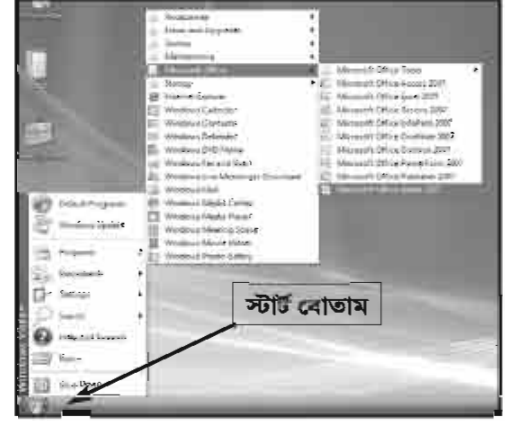
ডকুমেন্ট উইন্ডো পরিচিতি

মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৭ (Microsoft Office Word 2007) প্রোগ্রাম খোলার পর বা ওয়ার্ড প্রোগ্রাম চালু হওয়ার পর লেখালেখির কাজ শুরু করার জন্য একটি শূন্য ডকুমেন্ট বা শূন্য পর্দা উপস্থাপিত হবে। এ শূন্য ডকুমেন্ট বা শূন্য পর্দাকে বলা হয় ডকুমেন্ট উইন্ডো। এ ডকুমেন্ট উইন্ডো বা পর্দাটি আসলে একটি লেখালেখির খাতার শূন্য পৃষ্ঠার মতো। এ শূন্য পৃষ্ঠাতেই লেখালেখির কাজ করতে হবে। লেখালেখির কাজ শুরু করার আগে ডকুমেন্ট উইন্ডোর বিভিন্ন অংশের পরিচিতি এবং ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

টাইটেল বার (Title Bar)

শূন্য ডকুমেন্ট উইন্ডো বা শূন্য পর্দার একেবারে উপরে (Document1-Microsoft Word) লেখা থাকে। এটিকে বলা হয় টাইটেল বার।

কম্পিউটারে টাইপ করা বিষয়বস্তু বিভিন্ন নামে ফাইলে সংরক্ষণ করা হয়। ফাইলগুলোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করার পর যখন যে নামের ফাইল নিয়ে কাজ করা হয় তখন সেই ফাইলটির নাম টাইটেল বার-এ Document1- Microsoft Word -এর জায়গায় দেখা যায়।

ট্যাব ও রিবন (Tab & Ribbon)

টাইটেল বার-এর নিচের সারিতে হোম (Home), ইনসার্ট (Insert), পেজ লেআউট (Page Layout), রেফারেন্সেস (References), মেইলিংস (Mailings), রিভিউ (Review), ভিউ (View), এ্যাড-ইনস (Add-Ins) লেখা রয়েছে। এ সারিটিকে বলা হয় ট্যাব বার বা ট্যাব লাইন। হোম (Home), ইনসার্ট (Insert), পেজ লেআউট (Page Layout), ইত্যাদি শব্দগুলো হচ্ছে একেকটি ট্যাবের নাম। প্রত্যেকটি ট্যাবের অধীন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাজের রিবন রয়েছে। ট্যাবে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট ঐ ট্যাবের অধীন রিবন সক্রিয় হয় বা সামনে চলে আসে। রিবনের অন্তর্ভুক্ত কমান্ডের সাহায্যে অধ্যায়-অনুচ্ছেদ বিন্যাস করা, পৃষ্ঠা সাজানো, লাইন বা শব্দের নিচে বা উপরে বা চারদিকে রেখা টানা, অক্ষর ডান দিকে হেলান, মোটা বা অন্যান্য আকার ও আকৃতি বিশিষ্ট করা, অক্ষরের আকার-আকৃতি নির্ধারণ,

সমগ্র লেখাকে বাম, মধ্য ডান বা সমবিন্যাসে বিন্যস্ত করা, বার ও বর্ডার ব্যবহার করা, নম্বর ও বুলেট ব্যবহার করা ইত্যাদি আরও বহু রকমের কাজ করা যায়।

রুলার (Ruler)

রিবনের নিচে রয়েছে রুলার। লেখার পাশাপাশি মাপ নির্ধারণ করা, লেখাকে ডানে বা বাঁয়ে সরিয়ে নেওয়া, অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনকে ভেতরের দিকে বাইরের দিকে রাখা, সারণি তৈরির জন্য ট্যাব ব্যবহার করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজে রুলার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

রুলারের নিচে শূন্য পর্দার সবটুকুই লেখালেখির জায়গা।

ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বার ও হরাইজন্টাল স্ক্রোলবার

শূন্য পর্দার ডান দিকে ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বার, নিচে হরাইজন্টাল স্ক্রোল বার। ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বার-এর উপরে ও নিচে একটি করে স্ক্রোল তীর রয়েছে। তীর দুটির মাঝখানে রয়েছে স্ক্রোল বক্স। স্ক্রোল বক্সটি কাজের সময় পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে উপরে নিচে ওঠানামা করে।
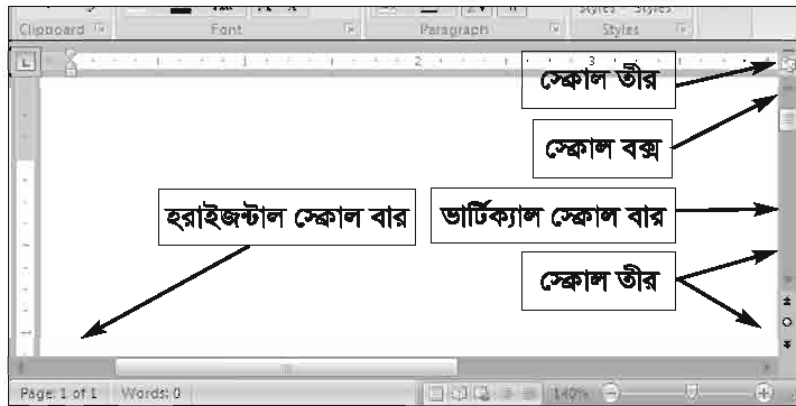
উপরের তীরে পয়েন্টার স্থাপন করে ক্লিক করলে (মাউসে আঙুল দিয়ে চাপ দেওয়া) পর্দায় অবস্থিত লেখা এক লাইন পরিমাণ নিচের দিকে নেমে আসে। ক্লিক করে মাউসে আঙুল চেপে রাখলে লেখা নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে। মাউসে আঙুল চেপে রাখলে লেখা নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে। যতক্ষণ মাউসে আঙুল চেপে রাখা যায় ততক্ষণ লেখা নামতেই থাকে। কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছার পর আঙুল তুলে নিলে লেখার নিচে নামা থেমে যায়।

নিচের তীরে পয়েন্টার ক্লিক করলে এই পদ্ধতিতে লেখা উপরের দিকে ওঠে বা উঠতে থাকে এবং মাউস থেকে আঙুলের চাপ তুলে নিলে থেমে যায়। পয়েন্টারের সাহায্যে স্ক্রোল বক্স উপরের দিকে বা নিচের দিকে এনে মাউস থেকে আঙুল তুলে নিলে লেখা একবারে অনেকটা উপরে উঠে যায় বা নিচে নেমে আসে। স্ক্রোল বক্স একেবারে উপরে নিয়ে ছেড়ে দিলে পর্দায় ফাইলের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনের শুরু থেকে দেখা যায়।

আবার স্ক্রোল বক্সের উপরে বা নিচে স্ক্রোল বার-এর যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলে বা ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী ডবল-তীরে ক্লিক করলে একবারে এক পর্দা পরিমাণ লেখা উপরের দিকে বা নিচের দিকে ওঠানামা করে। হরাইজন্টাল স্ক্রোল বক্স এবং তীর ব্যবহার করে একই পদ্ধতিতে লেখা ডানে-বাঁয়ে সরিয়ে দেখা যায়।
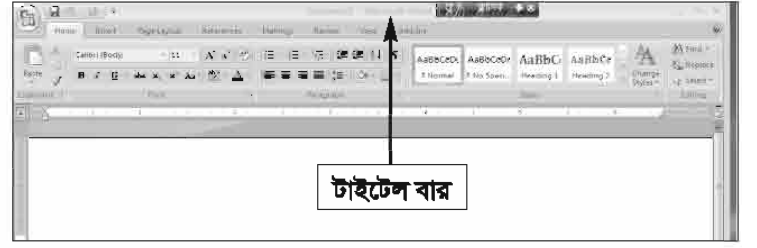
ইনসার্সন পয়েন্টার (Insersion Pointer)

শূন্য অংশের উপরের একেবারের বাম কোণে একটি লম্বালম্বি রেখা রয়েছে। লম্বালম্বি রেখাটিকে ইনসার্সন পয়েন্টার বলা হয়। ইনসার্সন পয়েন্টারের সঙ্গে টাইপের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। টাইপ করার জন্য কী-বোর্ডের যে বোতামে চাপ দেওয়া হবে ইনসার্সন পয়েন্টারের জায়গাটিতেই সেই অক্ষর টইপ হবে এবং ইনসার্সন পয়েন্টারটিও সেই সঙ্গে টাইপ হওয়া অক্ষরের ডান পাশে সরে যাবে। একটি শব্দ টাইপ করার পর কী-বোর্ডের স্পেস বার-এ চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার ডান দিকে সরে পরবর্তী শব্দ টাইপ করার জায়গায় গিয়ে বসবে। স্পেসবার-এ দুবার চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার আরও দূরে সরে যাবে। এভাবে স্পেসবার-এ যতবার চাপ দেওয়া যাবে ইনসার্সন পয়েন্টার ততই দূরে সরে যাবে। দূরে সরে যাওয়া ইনসার্সন পয়েন্টারটিকে আবার বামে সরিয়ে আনার জন্য কী-বোর্ডের ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিতে হবে।

লেখালেখির সময় মাউস পয়েন্টার নাড়াচাড়া করলে ইনসার্সন পয়েন্টারের উপরের ও নিচের মাথা বিভক্ত দেখা যায়। এটাকে বলা হয় আই বিম (I-Beam)। লেখার মধ্যে যেখানে আই বিম (I-Beam) ক্লিক করা হয় সেখানেই ইনসার্সন পয়েন্টার বসে যায়।

লেখালেখির কাজ শুরু

লেখালেখির কাজ শুরু করার আগে পৃষ্ঠার পাশাপাশি মাপ ঠিক করে নিতে হয়। পৃষ্ঠার পাশাপাশি মাপ প্রাথমিকভাবে মনিটরের পর্দার সমান রাখাই ভালো। এতে পাশাপাশি সবটুকু লেখা দেখার জন্য পাশাপাশি স্ক্রোল করার প্রয়োজন হয় না।

পৃষ্ঠার পাশাপাশি মাপ যদি, ধরা যাক, সাড়ে ৬ ইঞ্চি হয়, তাহলে একটি লাইন টাইপ করে সাড়ে ৬ ইঞ্চিতে পৌঁছার পর ইনসার্সন পয়েন্টার আপনাআপনিই পরবর্তী লাইনের শুরুতে চলে যায়। এ জন্য কী-বোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এন্টার বোতামে চাপ দিতে হয় নতুন অনুচ্ছেদ শুরু করার জন্য। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের শেষ লাইন সাড়ে ৬ ইঞ্চির আগে যে কোনো জায়গায় শেষ হয়ে গেলে এন্টার বোতামে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনসার্সন পয়েন্টার নতুন অনুচ্ছেদ শুরুর জায়গায় অর্থাৎ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের শেষ লাইনের নিচে একবারে বামে অবস্থান গ্রহণ করবে। এ অবস্থায় টাইপ করলে এখান থেকে নতুন অনুচ্ছেদ শুরু হবে। কিন্তু সাধারণ লাইন থেকে লাইনের মধ্যেকার দূরত্ব বাড়ানোর জন্য নতুন অনুচ্ছেদের টাইপ শুরু করার আগে এন্টার বোতামে একবার চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টারটি এক ঘর নিচে নেমে যাবে। এরপর টাইপ শুরু করলে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ থেকে নতুন অনুচ্ছেদের মধ্যেকার দূরত্ব দুটি সাধারণ লাইনের মধ্যেকার দূরত্বের চেয়ে বেশি হবে।

বাংলা এবং ইংরেজি

কম্পিউটারে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বাংলা সফটওয়্যার সন্নিবেশিত থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায়ই টাইপ করা যাবে। টাইপ শুরু করেই যদি দেখা যায় ইংরেজি অক্ষর আসছে এবং ইংরেজিতেই টাইপের কাজ করা প্রয়োজন, তাহলে টাইপ করে যেতে হবে। যদি বাংলায় টাইপের প্রয়োজন হয় তাহলে বাংলা অক্ষর পাওয়ার জন্য–

১. কী-বোর্ডের Ctrl ও Alt বোতাম একসঙ্গে চেপে রেখে বি (B) বোতামে চাপ দিতে হবে।

২. হোম ট্যাবে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট রিবন সক্রিয় হবে। এ রিবনের বাম দিকে ফন্ট ঘরে সুতন্বীএমজে (SutonnyMJ) বিদ্যমান

কী-বোর্ড

দেখা যাবে। এটি বিজয় বাংলা সিস্টেমে একটি ফন্টের নাম। ফন্ট ঘরে অন্য কোনো ফন্টের নাম থাকলে ফন্ট ঘরের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে ইংরেজি ও বাংলা অসংখ্য ফন্টের নাম সংবলিত তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে সুতন্বীএমজে (SutonnyMJ) বা অন্য যে কোনো বাংলা ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে।

৩. এবার ফন্টের ডান পাশে অক্ষরের আকার (Size) নির্ধারণের ঘরের ডান পাশের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে নিচের দিকে বিভিন্ন মাপসূচক সংখ্যা দেখা যাবে। এখান থেকে যে সংখ্যা সিলেক্ট করা যাবে অক্ষরের আকার সেই মাপের হবে।

৪. কী-বোর্ডে h বোতামে চাপ দিলে যদি কম্পিউটারের পর্দায় বাংলা অক্ষর 'ব' দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে কম্পিউটার এখন বাংলা অক্ষরে টাইপের কাজ করার জন্য প্রস্তুত।

যদি বাংলা অক্ষর 'ব' না আসে তাহলে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। বার বার পুনরাবৃত্তির পরেও যদি বাংলা অক্ষর না আসে, তাহলে বুঝতে হবে এ কম্পিউটারে বাংলা সিস্টেম ইনস্টল করা হয়নি অথবা ইনস্টল করা থাকলেও সিস্টেমে কোনো প্রকার ত্রুটি রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলা সফটওয়্যারটি নতুন করে ইনস্টল করতে হবে। তাতেও সমাধান না হলে যে প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা সফটওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

বাংলা অক্ষরে কাজ করার সময় মাঝে মধ্যে ইংরেজি অক্ষর ব্যবহারের প্রয়োজন হলে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি করলে ইংরেজি অক্ষর পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ২ নং ধাপে যে কোনো ইংরেজি ফন্টের নাম সিলেক্ট করতে হবে এবং ৪ নং ধাপে যে কোনো বোতামে চাপ দিলে ঐ বোতামের ইংরেজি অক্ষর পাওয়া যাবে।

আবার বাংলায় ফিরে যাওয়ার জন্য ১ থেকে ৪ নং পর্যন্ত কাজগুলোর হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

বাংলা যুক্তাক্ষর তৈরির নিয়ম

যুক্তাক্ষর তৈরির জন্য কী বোর্ডের ইংরেজি জি (G) বোতামটি সংযুক্তি বোতাম হিসেবে কাজ করে। যেমন– 'ক্ত' টাইপ করার জন্য প্রথমে ক (j) টাইপ করে জি (G) বোতামে চাপ দিয়ে পরে ত (k) টাইপ করতে হবে।

সাংকেতিক বর্ণ (Symbolic Character)

বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার জন্য প্রায়শ কিছু সাংকেতিক বর্ণের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার অলংকরণ বা আলাদা বৈশিষ্ট্য আনার জন্যও অন্যান্য ধরনের সাংকেতিক বর্ণ ব্যবহার করা হয়। লেখায় সাংকেতিক বর্ণ ব্যবহারের জন্য-

ক. ইনসার্ট (Insert) ট্যাবের রিবনের ডান দিকে সিম্বল (Symbol) ড্রপ-ডাউন মেনুতে ক্লিক করলে কয়েকটি সাংকেতিক বর্ণ সংবলিত একটি ছক দেখা যাবে। এ ছকের নিচের দিকে মোর সিম্বলস (More Symbols) কমান্ড সিলেক্ট করলে সিম্বল (Symbol) ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সের স্ক্রোল তীরের সাহায্যে স্ক্রোল করে প্রয়োজনীয় সাংকেতিক বর্ণের উপর ডবল-ক্লিক করলে বা ডায়লগ বক্সের নিচে ইনসার্ট (Insert) বোতামে ক্লিক করলে পর্দায় ইনসার্সন পয়েন্টারের জায়গায় ঐ সাংকেতিক বর্ণ বসে যাবে।

খ. ডায়লগ বক্সের উপরে রয়েছে Symbol এবং Special নামে দুটি ট্যাব। এর নিচে রয়েছে ফন্টের ড্রপ-ডাউন তালিকা।
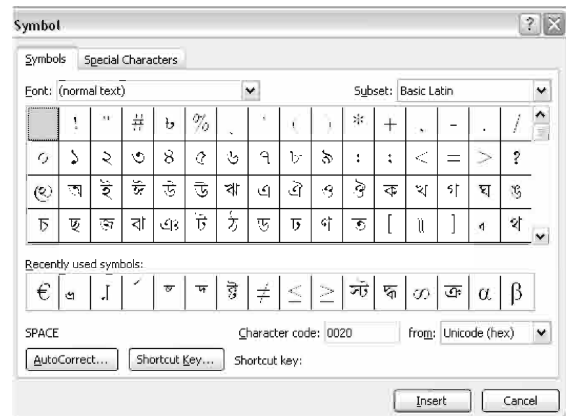
- ফন্টের ড্রপ-ডাউন তালিকার ঘরে ক্লিক করলে ফন্ট বা লিপিমালার তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে যে ফন্ট সিলেক্ট করা যাবে নিচের ছকে সেই লিপিমালার বর্ণ ও সাংকেতিক বর্ণ পাওয়া যাবে। এর ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় বর্ণ বা সাংকেতিক বর্ণ সিলেক্ট করতে হবে।

গ. ডায়লগ বক্সের Close বোতামে ক্লিক করে মূল লেখায় ফিরে আসতে হবে।

Symbol-এর পরিবর্তে Special ট্যাব সিলেক্ট করলে নিচের বক্সে কিছু বিশেষ বর্ণের তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় বর্ণ সিলেক্ট করে একই নিয়মে মূল লেখায় বসাতে হবে।

অনুচ্ছেদ ও নতুন লাইন

অনুচ্ছেদ বলতে আমরা বেশ কয়েকটি লাইন বা অনেকগুলো লাইনের সমন্বয়ে গঠিত একটি অংশকে বুঝি। কিন্তু কম্পিউটারের কাছে অনুচ্ছেদের অর্থ হচ্ছে কী-বোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দিয়ে লাইন শুরু করা। একটি লাইন টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে পরের লাইন টাইপ করলে কম্পিউটার দ্বিতীয় লাইনটিকে নতুন অনুচ্ছেদ হিসেবে গণ্য করবে। এভাবে এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে পরপর দশটি লাইন টাইপ করলে কম্পিউটার একে দশটি অনুচ্ছেদ হিসেবে গণ্য করবে।

কিন্তু একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে অনেক সময় দু'চারটি সংক্ষিপ্ত লাইন থাকতে পারে। উদ্ধৃতি জাতীয় লেখার সময় এ ধরনের সংক্ষিপ্ত লাইনের প্রয়োজন হতে পারে।

কম্পিউটারের কাছে অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত সংক্ষিপ্ত লাইনগুলোকে লাইন হিসেবে গণ্য করানোর জন্য সংক্ষিপ্ত লাইন শেষে কী-বোর্ডের শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে এন্টার বোতামে চাপ দিলে কম্পিউটার পরবর্তী লাইনকে অনুচ্ছেদ হিসেবে বিবেচনা না করে নতুন লাইন হিসেবে গণ্য করবে। লেখা সম্পাদনার সময় অনুচ্ছেদ এবং নতুন লাইন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

দুই শব্দ এক সঙ্গে রাখা (Non-Breaking space)

টাইপ করার সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'টি শব্দ একসঙ্গে রাখার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে নামের ক্ষেত্রে। একটি লাইনের শেষে মোঃ, ড. বা অনুরূপ সংক্ষিপ্ত শব্দ রেখে আসল নামটি পরবর্তী লাইনের প্রথমে চলে যেতে পরে। যেমন- এখানে ১ নং উদাহরণে প্রথম লাইনের শেষে শুধু ড. রয়ে গেছে। এ রকম দেখতে ভালো লাগে না, নামটিও মনে হয় খণ্ডিত। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই ২ নং উদাহরণের মতো দ্বিতীয় লাইনে নামের সঙ্গে ড. শব্দটি রাখতে হবে। এ জন্য–

- ড. শব্দের আগে ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে কী-বোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দিলেও ড. শব্দটি দ্বিতীয় লাইনের আগে এসে বসবে। কিন্তু সম্পাদনার সময় বিভিন্ন ফরমেটিং এবং পরিবর্তন পরিমার্জনের ফলে শব্দ দু'টি আবার আলাদা হয়ে যেতে পারে।

উদাহরণ-১
আমাদের দেশের বরেণ্য বিজ্ঞানী ড.
আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন
উদাহরণ-২
আমাদের দেশের বরেণ্য বিজ্ঞানী
ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন

- দু'টি শব্দ সব সময় পাশাপাশি রাখার জন্য প্রথম শব্দটি টাইপ করে কী-বোর্ডের Ctrl ও Shift বোতাম একসঙ্গে চেপে স্পেসবার-এ চাপ দিতে হবে।

উপরের উদাহরণে ড. শব্দটি টাইপ করার পর কী-বোর্ডের Ctrl ও Shift বোতাম একসঙ্গে চেপে স্পেস বার-এ চাপ দিতে হবে।

টাইপ করার বিষয়বস্তু সংরক্ষণ

একটি অনুচ্ছেদ বা দশ পনের লাইন টাইপ করার পর টাইপ করা বিষয়বস্তু সংরক্ষণ বা সেভ (Save) করা প্রয়োজন। না হলে বিভিন্ন কারণে টাইপ করা বিষয়বস্তু মুছে যাওয়ার ভয় থাকে। সংরক্ষণ বা সেভ করার জন্য– পর্দার উপরে বাম

কোণে অফিস বোতামে (Office Button) ক্লিক করলে একটি মেনু বা কমান্ডের তালিকা পাওয়া যাবে। এ মেনুকে সংক্ষেপে অফিস মেনু বলেও অভিহিত করা হয়। এ মেনু থেকে সেভ কমান্ড সিলেক্ট করলে সেভ এ্যাজ (Save As) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

২. সেভ এ্যাজ ডায়লগ বক্সের উপরের বাম দিকে (Save in) লেখার ডান পাশের ঘরে রয়েছে ফোল্ডারের নাম, ডায়লগ বক্সের নিচের বাম দিকে (File Name)-এর ডান পাশে রয়েছে ফাইলের নাম লেখার ঘর। এ ঘরে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে ফাইলের নাম টাইপ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ফাইলের নাম টাইপ করার সময় অবশ্যই ইংরেজি কী-বোর্ড ও ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

৩. ফাইলের নাম টাইপ করার পর ডায়লগ বক্সের সেভ (Save) বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৪. সেভ (Save) বোতামে ক্লিক করার পর ফাইলটি সেভ বা সংরক্ষিত হয়ে যাবে।
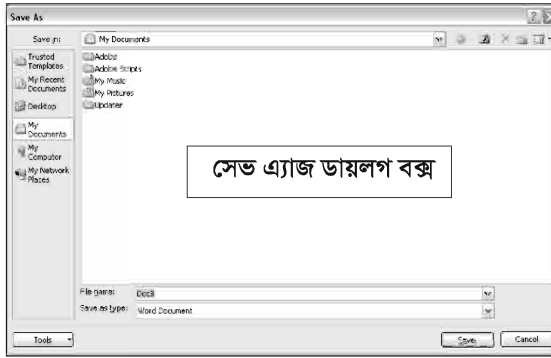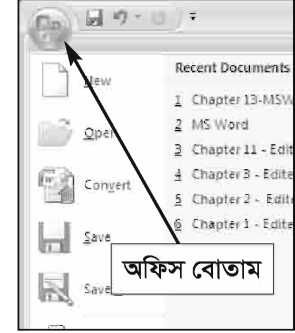
এরপর কাজ করার সময় কিছুক্ষণ পরপর সেভ করতে হবে। না হলে, যে অংশের কাজ সেভ করা হবে না, বিদ্যুৎ চলে গেলে বা অন্য কোনো কারণে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে গেলে ঐ অংশের কাজ বাতিল হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরপর সেভ করার জন্য অফিস বোতাম (Office Button)-এর ডান পাশে ফ্লপি ডিস্ক আইকনে ক্লিক করতে হবে অথবা কী-বোর্ডের (Ctrl) কন্ট্রোল বোতাম চেপে রেখে S বোতামে চাপ দিতে হবে। এভাবে সেভ করার সময় ডায়লগ বক্স আসবে না। কারণ, ফাইলের নাম ইতোমধ্যেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এখন সেভ করলে ঐ ফাইলেই তা সংরক্ষিত হবে।

কাজ সমাপ্ত/ফাইল বন্ধ করা

ধরা যাক, ফাইলের সবটুকু অংশ টাইপ করা হয়ে গেছে। এখন এ ফাইলে রাখার মতো কাজ হাতে নেই। অতএব, এ ফাইলটি বন্ধ করে তুলে রাখতে হবে। এমনও হতে পারে যে, ফাইলে রাখার মতো কাজ এখনও বাকি আছে। কিন্তু সময় নেই। অন্য কাজে বাইরে যেতে হবে। তাহলেও ফাইলটি বন্ধ করে তুলে রাখতে হবে। কোনো একটি ফাইলের কাজ বন্ধ করার জন্য ফাইলটি শেষবারের মতো সেভ বা সংরক্ষণ করে নিতে হবে। এ জন্য–

১. অফিস বোতামে ক্লিক করলে মেনু বা কমান্ড তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে সেভ কমান্ড সিলেক্ট করলে ফাইলটি সেভ বা সংরক্ষিত হয়ে যাবে। এবার কোনো ডায়লগ বক্স আসবে না। এরপর–

২. একই মেনু থেকে ক্লোজ (Close) কমান্ড সিলেক্ট করলে ফাইলটি বন্ধ হয়ে যাবে।

কাজের শুরু থেকে যদি ফাইলটি একবারও সেভ না করা হয়, তাহলে ফাইল বন্ধ করতে গেলে পর্দায় একটি সতর্কতাসূচক লেখা আসবে 'তুমি বন্ধ করার আগে ফাইলটি সেভ করতে চাও কিনা?' এ ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' সূচক ঘরে ক্লিক করলে পর্দায় সেভ এজ ডয়লগ বক্স আসবে। ইতোপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে তা ফাইলে সেভ করতে হবে।

ওয়ার্ড প্রোগ্রাম সমাপ্ত করা

ফাইল বন্ধ করার পরেও ওয়ার্ড প্রোগ্রাম খোলা থাকবে। ওয়ার্ড প্রোগ্রাম বন্ধ করার জন্য একই মেনু থেকে এক্সিট ওয়ার্ড (Exit Word) কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে।

ওয়ার্ড প্রোগ্রাম খোলার পর ফাইল খোলা
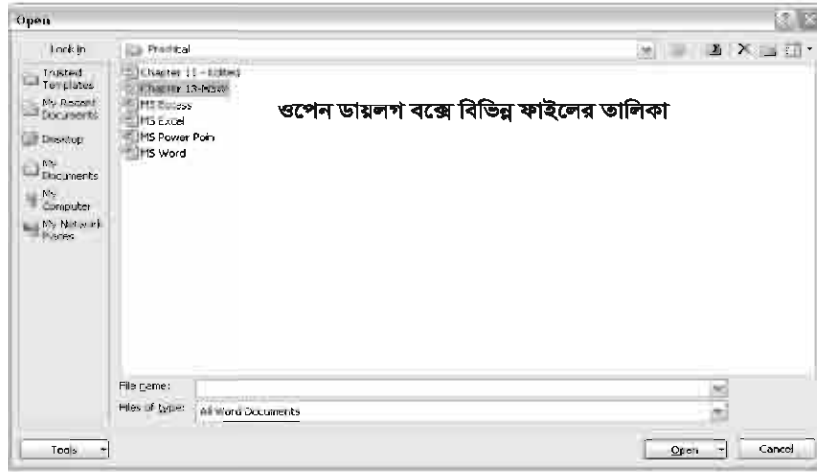
১. অফিস মেনুর ওপেন (Open) কমান্ড দিলে ওপেন (Open) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

২. ওপেন ডায়লগ বক্সের উপরের বামপাশে লুক ইন (Look in) লেখার ডান পাশের ঘর থেকে ফোল্ডার সিলেক্ট করলে মাঝখানের ঘরে ঐ ফোল্ডারভুক্ত সকল ফাইলের তালিকা পাওয়া যাবে।

৩. ফাইলের তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় ফাইলটির আইকনে ডবল-ক্লিক করলে ফাইলটি খুলে যাবে।

অথবা

ফাইলটি সিলেক্ট করে ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করলেও ফাইলটি খুলে যাবে। এবার পর্দায় ফাইলের বিষয়বস্তু এবং টাইটেল বার-এ ফাইলের নাম সংবলিত ডকুমেন্ট উইন্ডো পাওয়া যাবে।

হার্ডডিস্ক থেকে ফাইল খোলা

কম্পিউটারের ডেস্কটপে কম্পিউটার আইকনে ডবল-ক্লিক করলে কম্পিউটার উইন্ডো বা ফোল্ডার খুলে যাবে। কম্পিউটার উইন্ডো বা ফোল্ডারের ভেতর হার্ডডিস্ক আইকন Local Disk (C:), Local Disk (D:), Local Disk (E:) ইত্যাদি নামে চিহ্নিত থাকবে। একটি হার্ডডিস্ক কয়েকটি ভাগে ভাগ করা থাকে। হার্ডডিস্কের যতগুলি ভাগ থাকে ততগুলি ইংরেজি বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত থাকবে। এর যে কোনো আইকনে ডবল-ক্লিক করলে হার্ডডিস্কের ঐ ভাগে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রকার ফাইল, ফোল্ডার বিশিষ্ট উইন্ডো খুলে যাবে। এর ভেতর থেকে কোনো ফোল্ডারে ডবল-ক্লিক করলে ঐ ফোল্ডার উইন্ডো খুলে যাবে। ফোল্ডারে কোনো ফাইল থাকলে তার তালিকা এ উইন্ডোতে দেখা যাবে। ফাইল আইকনে ডবল-ক্লিক করলে ঐ ফাইলটি খুলে যাবে। ফোল্ডার ছাড়াও যে কোনো ফাইল স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে।

যে কোনো উইন্ডো বন্ধ করার জন্য উইন্ডোর উপরের ডান কোণে ক্যান্সেল ক্রস চিহ্নে ক্লিক করতে হবে।

পরবর্তী পর্যায়ের সম্পাদনামূলক কাজের জন্য অগ্রসর হওয়ার আগে ডায়লগ বক্স এবং সিলেক্ট করার নিয়ম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

ডায়লগ বক্স (Dialog Box)

ট্যাবের অধীন রিবনে অনেক কমান্ড থাকে। অনেক কমান্ড দিয়ে শুধু একটি মাত্র কাজ করা যায়। আবার কিছু কমান্ড দিয়ে অনেক রকমের কাজ করা যায়। এ ধরনের কমান্ডের সাহায্যে করার মতো সবগুলো আনুষঙ্গিক কমান্ড
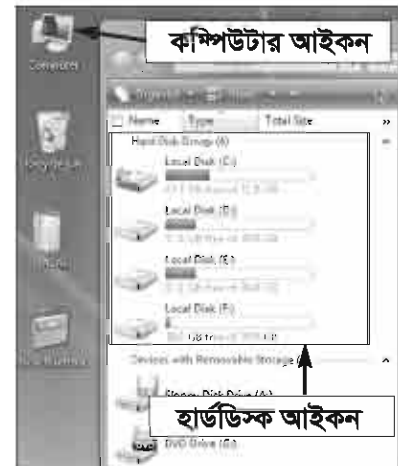
রিবন তালিকায় থাকে না। এছাড়া এ সব কমান্ডের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাপজোকের প্রয়োজন হয়, যা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে খুবই জটিল আকার ধারণ করত। যেমন– পেজ সেটআপ কমান্ডে এ রকম অনেক কিছু বিন্যাস করার থাকে। কাজেই, এ ধরনের কমান্ড সিলেক্ট করে ছেড়ে দিলেই পর্দায় সংশ্লিষ্ট কাজের ডায়লগ বক্স আসে। ডায়লগ বক্সে অসংখ্য কমান্ড ও অপশন থাকে। এ সব কমান্ড ও অপশনের বাম পাশে ছোট বক্স বা বৃত্ত থাকে। বক্স বা বৃত্তের মাঝখানে পয়েন্টার রেখে ক্লিক করলে ঐ কমান্ড বা অপশনটি সিলেক্টেড হয়ে যায় বা সক্রিয় হয়। সিলেক্টেড বা সক্রিয় হওয়ার পর বক্সটি ক্রসচিহ্ন যুক্ত হয়ে যায় এবং বৃত্তের মাঝখানে কালো টিপের মতো হয়ে যায়। বক্সটিকে বলা হয় চেক বক্স এবং বৃত্তকে বলা হয় রেডিও বাটন, রেডিও বোতাম বা গোলক। সব ডায়লগ বক্সেই OK এবং Cancel অথবা Close বোতাম থাকে। কিছু কিছু ডায়লগ বক্সে Apply বোতাম থাকে। বিভিন্ন কমান্ডের কাজ করে Apply বোতামে ক্লিক করলে পরিবর্তিত বা নতুন বিন্যাস দেখা যায়। এ অবস্থায় প্রয়োজন হলে ডায়লগ বক্সের কমান্ডগুলো পুনঃবিন্যাস করে OK বোতাম ক্লিক করলে পুনঃপরিবর্তিত বিন্যাস কার্যকর হয়। অর্থাৎ OK বোতাম ক্লিক করলে ডায়লগ বক্সের কমান্ডের সাহায্যে বিন্যাস করা নির্দেশ অনুযায়ী লেখালেখি বিন্যস্ত হয়ে যায়। প্রথম দফার বিন্যাস পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে আবার সংশ্লিষ্ট কমান্ড সিলেক্ট করে ডায়লগ বক্সে এসে নতুনভাবে বিন্যাস করে নিতে হয়।

ডায়লগ বক্সে কাজ করার সময় যদি মনে হয়, আপাতত ডায়লগ বক্সে কাজ করার প্রয়োজন নেই বা ভুল কমান্ডে ক্লিক করার ফলে ভিন্ন ডায়লগ বক্স এসেছে, তাহলে Cancel অথবা Close বোতাম ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স চলে যাবে।

সিলেক্ট করা

কোনো কমান্ড বা লেখালেখির কোনো অংশকে কাজের জন্য সক্রিয় করা, নির্বাচিত করা বা নির্দিষ্ট করা বা প্রস্তুত করাই হচ্ছে ঐ কমান্ড বা অংশকে সিলেক্ট করা। সাদা-কালো পর্দায় সিলেক্ট করা কমান্ড বা লেখালেখির অংশ কালো আবরণের ভেতর সাদা অক্ষরে দেখা যায়। রঙিন পর্দায় অবশ্য যে কোনো রঙিন আবরণের ভেতর সাদা বা অন্য রঙের অক্ষরে থাকতে পারে।

সিলেক্ট করার নিয়ম

যে কোনো এক বা একাধিক অক্ষর সিলেক্ট করতে হলে অক্ষরের ডান বা বাম দিকে আই-বিম ক্লিক করে মাউসে চাপ রেখে অক্ষর বা অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে বাম বা ডান দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এতে টেনে নিয়ে যাওয়া অংশটুকুর উপর দিয়ে অন্য রঙের আচ্ছাদন পড়ে যাবে। এ রকমভাবে অক্ষরের উপর দিয়ে অন্য রঙের আচ্ছাদন পড়ে যাওয়া বা হাইলাইটেড (Highlighted) হয়ে যাওয়াকেই সিলেক্টেড হওয়া বলা হয়। একই নিয়মে শব্দ সিলেক্ট করতে হয়।

লাইন সিলেক্ট করার জন্য মাউস পয়েন্টারটি লাইনের বাম পাশে রেখে ক্লিক করলে একটি লাইন সিলেক্ট হয়ে যাবে। একাধিক লাইন সিলেক্ট করার জন্য প্রথম লাইনের বাম পাশে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করে ক্লিক করতে হবে এবং মাউসে চাপ রেখে ড্র্যাগ করে নিচের দিকে নামতে হবে। নিচের দিকে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি লাইন সিলেক্টেড হতে থাকবে। এভাবে প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করার পর মাউসে চেপে রাখা আঙুল তুলে নিতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অংশ সিলেক্ট হয়ে গেলে মাউস পয়েন্টারটি উপরের দিকে উঠাতে হবে। এতে অতিরিক্ত সিলেক্টেড হওয়া অংশ সিলেকশন মুক্ত হতে থাকবে। এভাবে সঠিক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে মাউস থেকে আঙুল তুলে নিতে হবে। কিন্তু শুরু থেকে সিলেক্ট করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাউস আঙুল দিয়ে চেপে রাখতে হবে। যে কোনো ধরনের সিলেক্ট করা অংশ সিলেকশন মুক্ত করার জন্য মাউস পয়েন্টার যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলেই সিলেকশন মুক্ত হয়ে যাবে।

সিলেক্ট করার অন্যান্য পদ্ধতি

১. শব্দের উপর ডবল-ক্লিক করলে একটি শব্দ সিলেক্ট হবে।

২. যে কোনো লাইনের বাম পাশে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে একটি লাইন সিলেক্ট হবে।

৩. কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম চেপে বাক্যের যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলে একটি বাক্য সিলেক্ট হবে।

৪. অনুচ্ছেদের বাম পাশে মাউস পয়েন্টার বসিয়ে ডবল-ক্লিক করলে পুরো একটি অনুচ্ছেদ সিলেক্টেড হবে।

৫. লেখার অংশবিশেষ সিলেক্ট করার জন্য ঐ অংশের শুরুতে আই-বিম স্থাপন করে ক্লিক করার পর শিফট বোতাম চেপে রেখে ঐ অংশের শেষে ক্লিক করতে হবে।

৬. কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম চেপে রেখে লেখার বাম মার্জিনের বাইরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে পুরো ফাইল সিলেক্ট হবে।

৭. কলাম আকারে কোনো অংশ সিলেক্ট করার জন্য Alt বোতাম চেপে প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করতে হবে। যে কোনো ধরনের সিলেক্ট করা অংশ সিলেকশন মুক্ত করার জন্য আই-বিম পর্দায় যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলেই সিলেকশন মুক্ত হয়ে যাবে।

কী-বোর্ডের সাহায্যে সিলেক্ট করা

১. কী-বোর্ডের শিফট বোতাম চেপে ডান বা বাম তীর চিহ্ন বোতামে চাপ দিতে থাকলে ডানে বা বাঁয়ে একটি করে অক্ষর সিলেক্টেড হতে থাকবে। ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী তীর বোতামে চাপ দিতে থাকলে উপরের দিকে বা নিচের দিকে একটি করে লাইন সিলেক্টেড হতে থাকবে।

সম্পূর্ণ ফাইল সিলেক্ট করার জন্য কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে A বোতামে চাপ দিতে হবে।

বানান সংশোধনের নিয়ম

যে নদি মরু পখে হারান ধারা
জানিহে জানি তা ও হয়নি হাবা

উপরের দুটি লাইনে বেশ কয়েকটি বানান ভুল রয়েছে। যে কোনো জায়গা থেকে বানান সংশোধনের কাজ শুরু করা যায়। লাইন দুটির টাইপ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় লাইনের শেষ শব্দ হাবা-এর পরে ইনসার্সন পয়েন্টার থাকবে। হাবা শব্দটিও ভুল। প্রকৃত শব্দটি হচ্ছে 'হারা'। এখান থেকে শুরু করা যেতে পারে। ভুল 'হাবা' কে শুদ্ধ করে 'হারা' লেখার জন্য :

১. দুবার ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে 'া' এবং পরে 'ব' মুছে যাবে।

২. এবার 'র' এবং 'া' টাইপ করতে হবে।

অথবা

১. আই-বিম 'ব' এবং 'া'-এর মাঝখানে স্থাপন করে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে।

২. ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে 'ব' অক্ষরটি মুছে যবে।

৩. 'র' টাইপ করতে হবে।

টাইপ করার সময় ভুল চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকস্পেস বোতাম ব্যবহার করে বানান শুদ্ধ করে যাওয়া সহজ। কিন্তু, লেখা শেষে বানান সংশোধনের সময় এ পদ্ধতি অনাবশ্যক মনে হতে পারে। বিশেষ করে শব্দটি যদি চার-পাচ অক্ষর বিশিষ্ট এবং ভুল অক্ষরটি শব্দের মাঝামাঝি স্থানে থাকে। চিত্রের 'হারান' এবং 'পখে' শব্দ দুটি সংশোধনের জন্যে ইনসার্সন পয়েন্টার যথাক্রমে 'ন' এবং 'খ'-এর ডান পাশে স্থাপন করে ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে ভুল অক্ষর মুছে যাবে। তখন শুদ্ধ অক্ষর 'ল' এবং 'থ' টাইপ করতে হবে। 'নদি' শব্দটি শুদ্ধ করার জন্যে প্রথমে আই-বিম 'ি'-এর ডান পাশে ক্লিক করে ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে 'ি' মুছে যাবে। এরপর আই-বিম 'দ'-এর ডান পাশে ক্লিক করে 'ী' টাইপ করতে হবে। নিচের লাইনে 'জানিহে' এবং 'তা ও' শব্দ দুটির বানান শুদ্ধ হলেও স্পেস

(Space) ঠিক নেই। 'জানি' এবং 'হে' দুটি শব্দ একসঙ্গো মিশে আছে। আবার 'তা' এবং 'ও' এক শব্দ। কিন্তু মাঝখানে স্পেস পড়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে 'জানি' থেকে 'হে' আলাদা করার জন্যে 'হে'-এর বাম পাশে আই-বিম ক্লিক করে স্পেস বার-এ চাপ দিলে হে আলাদা হয়ে ডান পাশে সরে যাবে। আবার তাও শব্দের 'ও'-এর বাম পাশে আই-বিম ক্লিক করে ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে 'ও' অক্ষরটি বাম দিকে সরে আসবে। একবারে না হলে একাধিকবার ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিয়ে 'তা' এবং 'ও' একত্রে মিলিয়ে দিতে হবে।

সিলেক্ট (Select) এবং ডিলিট (Delete) পদ্ধতিতেও বানান সংশোধন করা যা। কোনো বড় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি একাধিক অক্ষর ভুল থাকলে এ পদ্ধতির ব্যবহার সুবিধাজনক হতে পারে। যেমন– ধরা যাক, 'আকাশচারী' শব্দটি ভুল টাইপে 'আকাষছারী' হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে আই-বিম 'ছ'-এর ডান দিকে স্থাপন করে ক্লিক করতে হবে এবং মাউসে চাপ রেখে বাম দিকে ড্র্যাগ করে কা-এর ডান প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে। এতে 'ছ' এবং 'ষ' সিলেক্টেড হয়ে যাবে। এবার

১. ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে 'ক'-এর পর থেকে 'ছ' পর্যন্ত মুছে যাবে এবং কা-এর ডান পাশে ইনসার্সন পয়েন্টার বসে যাবে।

২. 'শচ' টাইপ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ১ নং ধাপ ইচ্ছে করলে বাদ দেওয়া যায়। অর্থাৎ সিলেক্ট করার পর সরাসরি ২ নং ধাপের কাজ করলেও একই ফল পাওয়া যাবে।

ইনসার্সন পয়েন্টার ডানে, বাঁয়ে, উপরে, নিচে স্থানান্তরের জন্য কী-বোর্ডের তীরচিহ্ন বোতামগুলোও ব্যবহার করা যায়। ডান ও বাম তীরচিহ্ন বোতামে একবার চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার একটি করে অক্ষর অতিক্রম করে। ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী তীরচিহ্ন বোতামে একবার চাপ দিলে একটি করে লইন অতিক্রম করে। তীরচিহ্ন বোতাম চেপে ধরে রাখলে ইনসার্সন পয়েন্টার চলতেই থাকবে, চাপ ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত।

ডেল (Del) বা (Delete) বোতামের ব্যবহার

অক্ষরের ডান পাশে ইনসার্সন পয়েন্টার রেখে ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিলে যেমন ইনসার্সন পয়েন্টারের বাম পাশে একটি অক্ষর মুছে যায়, দুই শব্দের মাঝখানের শূন্য জায়গায় রেখে চাপ দিলে শূন্য জায়গা কমে যায়, তেমনি ডিলিট (Delete) বোতামে চাপ দিলে এবং Name Lock বোতাম নিষ্ক্রিয় থাকা অবস্থায় ডেল (Del) বোতামে চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টারের ডান দিকের অক্ষর মুছে যায় এবং ডান দিকের শূন্য জায়গা কমে যায়।

বানান সংশোধন/শব্দ পরিবর্তন

রিপ্লেস (Replace) কমান্ডের ব্যবহার

অসতর্কতা বা না জানার করণে পুরো ফাইলের বিষয়বস্তুতে এক বা একাধিক বানান ভুল হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো একটি শব্দের পরিবর্তে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সবগুলো নয়।

যেমন– কোনো একটি লেখায় এক ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা হয়েছে যিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আগের নাম ছিল 'গোপাল'। খৃস্টান হওয়ার পর নাম ধারণ করেছেন 'গোমেজ'। কিন্তু ফাইলের সর্বত্রই তার নাম 'গোপাল' হিসেবে টাইপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার 'গোপাল' নামটি কোথাও কোথাও আগের নাম হিসেবে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ

জায়গায়ই তার পরিবর্তিত নাম 'গোমেজ' ব্যবহার করতে হবে। এমতাবস্থায় এডিট (Edit) মেনুর রিপ্লেস (Replace) কমান্ডের সাহায্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ফাইলের সবগুলো ভুল বানান শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। এ জন্য–

১. হোম (Home) ট্যাবভুক্ত রিবনের একেবারে ডান দিকে রিপ্লেস (Replace) কমান্ডে ক্লিক করলে ফাইন্ড এ্যান্ড রিপ্লেস (Find and Replace) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

২. ডায়লগ বক্সের ফাইন্ড হোয়াট (Find What) টেক্সট বক্সে 'গোপাল' এবং রিপ্লেস উইথ (Replace With) টেক্সট বক্সে 'গোমেজ' টাইপ করতে হবে অথবা কপি করে পেসবট করতে হবে। এ দু'টি ঘরের শব্দ বাংলা অক্ষরে দেখা যাবে না। কিছু অর্থহীন ইংরেজি অক্ষর দেখা যাবে। তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।

৩. ডায়লগ বক্সের ফাইন্ড নেক্সট (Find Next) বোতামে ক্লিক করার পর ফাইলের শুরুতে প্রথম 'গোপাল' লেখাটি সিলেক্টেড হয়ে যাবে।

৪. 'গোপাল'কে এখানে 'গোমেজ' করার প্রয়োজন হলে রিপ্লেস (Replace) বোতামে ক্লিক করতে হবে। পরিবর্তন করার প্রয়োজন না হলে ফাইন্ড নেক্সট (Find Next) বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৫. পূর্ববর্তী ৪ নম্বর ধাপের কাজ শেষ হওয়ার পরপরই 'গোপাল' শব্দটি সিলেক্টেড হবে। সেখানেও প্রয়োজন অনুযায়ী ৪ নম্বর ধাপের পদ্ধতিতে ফাইন্ড নেক্সট (Find Next) বা রিপ্লেস (Replace) বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৬. সবগুলো নাম গোমেজ করতে হলে রিপ্লেস অল (Replace All) বোতামে ক্লিক করতে হত।

এভাবে পুরো ফাইলের বানান সংশোধন শেষ করার পর ডায়লগ বক্সের ক্লোজ (Close) বোতামে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স চলে যাবে।

অভিধান (Spelling and Grammar)-এর ব্যবহার (শুধু ইংরেজির জন্য)

রিভিউ ট্যাবভুক্ত রিবনের একেবারে বাম দিকে স্পেলিং এন্ড গ্রামার (Spelling and Grammar) কমান্ডের সাহায্যে একটি ফাইলের যে কোনো একটি সিলেক্ট করা শব্দ, সিলেক্ট করা অংশ বা গোটা ফাইলের লেখার বানান ঠিক আছে কিনা যাচাই করে দেখা যায় এবং সংশোধন করা যায়।

কম্পিউটার তার মূল অভিধানে সংরক্ষিত শব্দাবলির বানানের ভিত্তিতে ফাইলের লেখার বানান যাচাই করে। অপরিচিত শব্দ দেখলে কম্পিউটার ডায়লগ বক্সের উপরের অংশে অভিধানে নেই (Not in Dictionary) লেখা ঘরে ঐ অপরিচিত শব্দটি চিহ্নিত করে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, শহর, নগর, বন্দর ইত্যাদির নাম এবং অনেক দেশের নামও কম্পিউটারের অভিধানে পরিচিত শব্দ তালিকায় নেই।

চিহ্নিত ভুল বানান সংশোধন করার জন্য ডায়লগ বক্সের Change বোতামে ক্লিক করতে হবে। একই ধরনের সবগুলো ভুল বানান একই সঙ্গে শুদ্ধ করার জন্য Change All বোতামে ক্লিক করতে হবে। শুদ্ধ করার প্রয়োজন না হলে, অর্থাৎ নাম বাচক শব্দ শুদ্ধ বানানে লেখা থাকলে Ignore বোতামে ক্লিক করতে হবে।
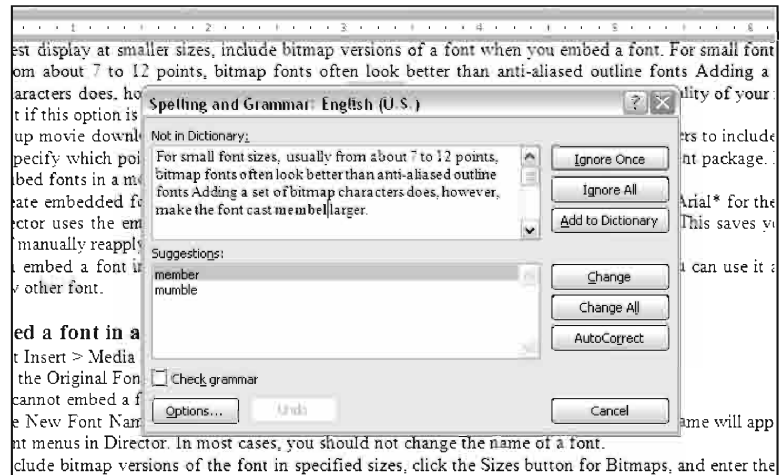
ভুল বানান চিহ্নিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে Suggestion ঘরে প্রস্তাবিত বানানের তালিকা প্রদর্শিত হবে, যদি থাকে। এ তালিকায় শুদ্ধ বানান পাওয়া গেলে সিলেক্ট করে Change বোতামে ক্লিক করতে হবে। প্রস্তাবিত তালিকায় শুদ্ধ বানান পাওয়া না গেলে চিহ্নিত ভুল বানানটি বক্সের ভেতর শুদ্ধভাবে টাইপ করে Change বোতামে ক্লিক করতে হবে।

কাট (Cut), কপি (Copy), পেস্ট (Paste)

কাট, কপি ও পেস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো শব্দ, লাইন, বাক্য, অনুচ্ছেদ বা যে কোনো প্রয়োজনীয় অংশ এক স্থান থেকে তুলে অন্য স্থানে বসানো যায়।

এ জন্য–

১. প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করতে হবে।

২. হোম ট্যাবভুক্ত রিবনের একেবারে বাম দিকে কাট (Cut) বা কপি (Copy) আইকনে ক্লিক করতে হবে।

৩. কাট বা কপি করা অংশ যেখানে বসাতে হবে সেখানে ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে এডিট মেনুর পেস্ট (Paste) কমান্ড দিলে কাট বা কপি করা বিষয়বস্তু ইনসার্সন পয়েন্টারের জায়গায় বা জায়গা থেকে বসে যাবে।

মনে রাখতে হবে, কাট কমান্ডের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা বিষয়বস্তু মূল স্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে তুলে নেয়া হয়। মূল স্থানে ঐ অংশের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু কপি কমান্ডের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা বিষয়বস্তু মূল স্থানেও পরিবর্তিত থেকে যায়।
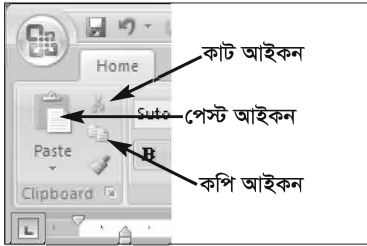
সিলেক্ট করার পর Ctrl বোতাম চেপে রেখে C বোতামে চাপ দিলে কপি, X বোতামে চাপ দিলে কাট এবং V বোতামে চাপ দিলে পেস্ট-এর কাজ হবে।

আনডু (Undo)

অফিস বোতামের ডান পাশে একটি বামমুখী এবং একটি ডানমুখী তীর রয়েছে। ভুলক্রমে ব্যাকস্পেস বা অন্য কোনো বোতামে চাপ লাগার ফলে সিলেক্ট করা কোনো অংশ মুছে গেলে, কোনো শব্দ অনুচ্ছেদ বা অংশ কাট বা কপি করা হলে বা অন্য কোনো কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি মনে হয় যে, কাজটি ঠিক হয়নি, তাহলে অন্য কোনো কাজ করার আগেই (Undo) আইকনে ক্লিক করলে মুছে যাওয়া, কাট বা কপি করা বিষয়বস্তু ফিরে আসবে।

অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন

অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় অংশের অক্ষর সিলেক্ট করে নিতে হবে। এর পরিমাণ একটি শব্দ হতে পারে, এক বা একাধিক লাইন বা অনুচ্ছেদ হতে পারে, এমনকি গোটা ফাইলের লেখাও হতে পারে।

অক্ষর ছোট-বড় করা

১. যে শব্দ, লাইন, অনুচ্ছেদ বা অংশের অক্ষর ছোট বা বড় করার প্রয়োজন সেই শব্দ লাইন, অনুচ্ছেদ বা অংশ সিলেক্ট করতে হবে।

২. হোম ট্যাবভুক্ত রিবনের ফন্ট সাইজ (Font Size) বক্সের নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করে ৮ পয়েন্ট থেকে বেশি যে কোনো একটি সংখ্যার উপর ক্লিক করতে হবে। এ বক্সে ৭২ পয়েন্ট পর্যন্ত পাওয়া যাবে। তার চেয়েও বড় করতে হলে সাইজ বক্সে সরাসরি সেই মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করে কী-বোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে। পয়েন্ট হচ্ছে অক্ষরের মাপ। পয়েন্ট হিসেবে বড় সংখ্যায় ক্লিক করলে সিলেক্ট করা অক্ষর বড় হবে, ছোট সংখ্যা সিলেক্ট করলে সিলেক্ট করা অক্ষর ছোট হবে।
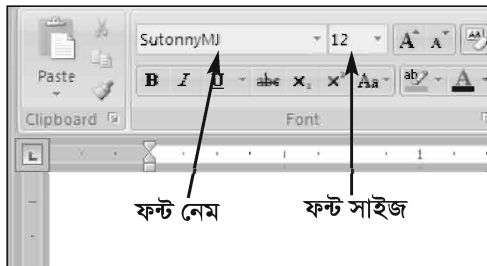
অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তন করা

হোম ট্যাবভুক্ত রিবনে ফন্ট নেম (Font Name) বক্সের সাহায্যে অক্ষরের আকৃতি নির্বাচনের কাজ করতে হবে। ফন্ট নেম বক্সে বিভিন্ন আকৃতির অক্ষরের নাম দেওয়া আছে। যেমন-সুতন্বী, টাইমস, হেলভিটিকা, নিউইয়র্ক, জেনেভা, কুরিয়ার ইত্যাদি।

১. যে শব্দ, লাইন, অনুচ্ছেদ বা অংশের অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তন করতে হবে সেই শব্দ, লাইন অনুচ্ছেদ বা অংশ সিলেক্ট করতে হবে।
২. ফন্ট নেম (Font Name) বক্সের নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করলে নিচের দিকে ফন্টের তালিকা থেকে, প্রয়োজন হলে স্ক্রোল করে, পছন্দমতো একটি আকৃতির (Font) নামে ক্লিক করতে হবে।

যে ফন্টের নাম ক্লিক করা হবে সিলেক্ট করা অক্ষর সেই ফন্টের আকৃতির হবে। মনে রাখতে হবে, সুতন্বীএমজে, চন্দ্রাবতীএমজে, মেঘনাএমজে, আনন্দএমজে ইত্যাদি ফন্টগুলো হচ্ছে বাংলা অক্ষর নির্দেশক।

অক্ষর মোটা (Bold) করা, ডান দিকে হেলান (*Italic*) ও (Underline) আন্ডারলাইন করা

১. অক্ষর মোটা করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ, লাইন, অনুচ্ছেদ বা অংশ সিলেক্ট করার পর রিবনের B বোতামে ক্লিক করতে হবে।
২. অক্ষর ইটালিক বা ডান দিকে হেলান করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ, লাইন, অনুচ্ছেদ বা অংশ সিলেক্ট করার পর রিবনের I বোতামে ক্লিক করতে হবে।
৩. অক্ষর আন্ডারলাইন করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ, লাইন, অনুচ্ছেদ বা অংশ সিলেক্ট করার পর রিবনের U বোতামে ক্লিক করতে হবে।

অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তনের আরও কিছু কাজ

হোম ট্যাবের রিবনের সাহায্যে অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তনের আরও কিছু কাজ করা যায়। এ জন্য–

১. যে শব্দ লাইন অনুচ্ছেদ বা অংশের আকৃতি পরিবর্তন করতে হবে সেই শব্দ, লাইন, অনুচ্ছেদ বা অংশ সিলেক্ট করে নিতে হবে।
২. হোম ট্যাবের রিবনে ফন্ট ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে ফন্ট (Font) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।
   ডায়লগ বক্সের ইফেক্ট (Effect) বক্সে অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তনের বেশ কিছু অপশন রয়েছে। প্রতিটি অপশনের বাম পাশে ছোট বর্গাকার ঘর বা চেক বক্স রয়েছে।
৩. পছন্দ বা প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো একটি চেক বক্সে ক্লিক করে ক্রস চিহ্ন যুক্ত করে দিতে হবে।
৪. OK বোতাম ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স চলে যাবে এবং সিলেক্ট করা শব্দ, লাইন অনুচ্ছেদ বা অংশের অক্ষর নতুন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হবে। আন্ডারলইন (Underline) পুল-ডাউন মেনু ব্যবহার করে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার আন্ডারলাইন করা যায়। আন্ডারলাইন বক্সের ডান দিকের নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের আন্ডারলাইনের তালিকা দেখা যাবে। যেমন–সিঙ্গাল, ডবল, ডটেড, থিক, ড্যাশ ইত্যাদি তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো একটি কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে।

নিচে ফন্ট ডায়লগ বক্সের ইফেক্ট ও আন্ডারলাইন কমান্ডের সাহায্যে করা কিছু নমুনা দেয়া হল।

নমুনা-

ক. ইটালিক (*Italic*)

ক'ফোঁটা চোখের জল

২. স্ট্রাইক থ্রু (Strikethrough)

~~ক'ফোঁটা চোখের জল~~

৩. সিঙ্গাল আন্ডারলাইন (Single Underline)

ক'ফোঁটা চোখের জল

৪. ওয়ার্ড/ওয়ার্ডস অনলি (Words/Words only)

ক'ফোঁটা চোখের জল

৫. আউট লাইন (Outline)

ক'ফোঁটা চোখের জল

৬. শ্যাডো (Shadow)

ক'ফোঁটা চোখের জল

মনে রাখতে হবে, অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তনের কাজ কমান্ডের সাহায্যে বা যে প্রক্রিয়ায় করতে হয়, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় বা কমান্ডের সাহায্যে অক্ষরকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয়। ধরা যাক, ফন্ট ডায়লগ বক্সের ডবল-আন্ডারলাইন কমান্ডের সাহায্যে অক্ষরের নিচে ডবল-আন্ডারলাইন যুক্ত করা হয়েছে। এখন আন্ডারলাইন মুক্ত করতে হলে ঐ অক্ষর সিলেক্ট করে আবার ফন্ট ডায়লগ বক্সে গিয়ে ডবল-আন্ডার লাইন অপশন/কমান্ড সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

অক্ষরের আকার বড় করা

রিবনের সাইজ পুল-ডাউন মেনুর মতোই ফন্ট ডায়লগ বক্সের সাইজ টেক্স করলে বিভিন্ন মাপসূচক সংখ্যা দেখা যাবে। এ সব সংখ্যার চেয়ে বেশি মাপের বা এ সব সংখ্যার সঙ্গে মিল নেই এমন মাপ নির্বাচন করার জন্য ঐ সংখ্যাটি সাইজ টেক্সট বক্সে টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা অংশের অক্ষরের আকার ঐ মাপ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

মার্জিন বিন্যাস (Alignment)

হোম ট্যাবভুক্ত রিবনে রয়েছে চারটি এ্যালাইনমেন্ট আইকন। এই আইকনগুলোর সাহায্যে লেখার মার্জিন বিন্যাস

করতে হয়। পুরো ফাইলের বিষয়বস্তুর মার্জিন বিন্যাস করার প্রয়োজন হলে পুরো ফাইলের বিষয়বস্তু সিলেক্ট করে নিতে হয়। অন্যথায় যে অংশের বিষয়বস্তুর মার্জিন বিন্যাস করার প্রয়োজন শুধু সেই অংশ সিলেক্ট করে নিয়ে মার্জিন বিন্যাসের কাজ করতে হয়।

বাম বিন্যাস (Align Left)

১. প্রয়োজন অনুযায়ী পুরো ফাইলের বিষয়বস্তু বা এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ সিলেক্ট করে নিতে হবে।

২. বাম বিন্যাস (Align Left) আইকন-এ মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে আইকনটি সিলেক্টেড হয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে সিলেক্ট করা এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ বা গোটা ফাইলের বিষয়বস্তু বাম মার্জিনে বিন্যস্ত হয়ে যাবে।

প্রয়োজন অনুযায়ী পুরো ফাইলের বিষয়বস্তু বা এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ সিলেক্ট করে নিতে হবে।

সমবিন্যাস (Justify)

১. প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ বা ফাইলের পুরো বিষয়বস্তু সিলেক্ট করতে হবে।

২. সমবিন্যাস (Justify) আইকন-এ ক্লিক করলে আইকনটি সিলেক্টেড হয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে সিলেক্ট করা এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ বা গোটা ফাইলের

প্রয়োজন অনুযায়ী পুরো ফাইলের বিষয়বস্তু বা এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ সিলেক্ট করে নিতে হবে।

বিষয়বস্তু সমবিন্যাস হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রতিটি লাইন সমান দৈর্ঘ্যের হবে এবং বাম মার্জিন থেকে ডান মার্জিন পর্যন্ত প্রসারিত হবে। হাইফেন ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া না থাকলে কম্পিউটার লাইনের শেষ শব্দ ভাঙে না। মার্জিনের রেখা অতিক্রম করে গেলে গোটা শব্দই পরের লাইনে নিয়ে আসে। মার্জিনের সমবিন্যাসের ক্ষেত্রে কম্পিউটার শব্দ ভাঙে না। শব্দের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা বা স্পেস (Space) কম-বেশি করে লাইনগুলোকে সমবিন্যাসে সাজিয়ে দেয়।

ডান বিন্যাস (Align Right) এবং মধ্য বিন্যাস (Align Center)

একই নিয়মে প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করার পর ডান অথবা মধ্য বিন্যাসের কাজ করতে হয়। ডান মার্জিন বিন্যাসে প্রতিটি লাইনের ডান দিকে অবস্থান একই বরাবর থাকবে। মধ্য মার্জিন বিন্যাসে লেখার উভয় প্রান্তই মার্জিন থেকে সমান দূরে থাকবে।

বিশেষ ধরনের হ্যান্ডবিল, পোস্টার, সূচিপত্র, নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদির জন্য মধ্যমার্জিন বিন্যাসের প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বৈচিত্র্য বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা ইত্যাদি প্রয়োজনেও এ ধরনের মার্জিন বিন্যাস করা হয়ে থাকে। কোনো বড় লেখার ক্ষেত্রে এ ধরনের মার্জিন বিন্যাসের এ প্রক্রিয়া সব লেখায় শিরোনাম, উপ-শিরোনাম ইত্যাদি যথাস্থানে বসানোর জন্য মার্জিন বিন্যাসের এ প্রক্রিয়া সব সময়ই কাজে লাগে। কারণ, একটি ফাইলের পুরো বিষয়বস্তুর সঙ্গে মার্জিন বিন্যাস করার পর শিরোনাম এবং উপ-শিরোনামগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে সিলেক্ট করে ডানে, বাঁয়ে অথবা মাঝখানে বসিয়ে নিতে হয়।

প্রয়োজন অনুযায়ী পুরো ফাইলের বিষয়বস্তু বা এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ সিলেক্ট করে নিতে হবে।

প্রয়োজন অনুযায়ী পুরো ফাইলের বিষয়বস্তু বা এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ সিলেক্ট করে নিতে হবে।

ট্যাব (TAB)-এর ব্যবহার

ট্যাব ব্যবহার করে কলাম আকারে সারণি (Table) তৈরি করা যায়। রুলারের বাম কোণে ট্যাব পয়েন্ট রয়েছে। এখানে একটি ট্যাবের প্রতীক থাকে। প্রতীকটির উপর ক্লিক করলে ট্যাবটি অন্য ট্যাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এভাবে ক্লিক করে করে ৪টি ট্যাব ব্যবহার করা যায়। ট্যাব ৪টি হচ্ছে বাম ট্যাব, মধ্য ট্যাব, ডান ট্যাব এবং দশমিক ট্যাব।

ট্যাব-এর সাহায্যে সারণি তৈরির জন্য ধরন ও প্রয়োজন অনুযায়ী রুলারের ট্যাব স্থাপন করতে হয়। যেমন– ধরা যাক, ক্রমিক, নাম, পাওনার পরিমাণ, মন্তব্য শিরোনাম ব্যবহার করে ট্যাবের সাহায্যে একটি সারণি তৈরি করতে হবে।

ক্রমিক	নাম	পাওনার পরিমাণ	মন্তব্য
১	হাকিম	১০০০.৫০	পরিশোধ
২	মালেক	৫০০.৭৫	পাওনা আছে
৩	করিম	৮০০.৫০	পরিশোধ
৪	মোক্তার	৯৫০.২৫	পাওনা আছে
৫	খলিল	৬০০.৫০	পরিশোধ
৬	মফিজ	৭৫০.৭৫	পরিশোধ

এ জন্য –

১. ক্রমিক সংখ্যার কলাম বাম ইনডেন্টের অবস্থানের জন্যই বাম বিন্যাসে বিন্যস্ত হবে। ট্যাব স্থাপনের প্রয়োজন হবে না।

২. নামের কলামটি রুলারের ১ ইঞ্চি কম মাপসূচক অবস্থানে রাখার জন্য বাম ট্যাব স্থাপন করতে হবে। যথাস্থানে ট্যাব স্থাপন করার জন্য প্রথমে ট্যাব আইকনে ক্লিক করে বাম ট্যাব সক্রিয় করতে হবে। এরপর পয়েন্টার রুলারের নির্দিষ্ট মাপসূচক রেখার উপর ক্লিক করলে ঠিক সেখানে বাম ট্যাব বসে যাবে। এভাবে প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট ব্যবধানে একাধিক বাম ট্যাব স্থাপন করা যেতে পারে।

৩. পরবর্তী ঘরটি টাকার অঙ্কের এবং দশমিক যুক্ত। কাজেই এ ক্ষেত্রে দশমিক ট্যাব স্থাপন করতে হবে।

৪. মন্তব্যের ঘরটি ডান দিকে মার্জিন একই বরাবর রাখার জন্য ডান ট্যাব স্থাপন করতে হবে।

ট্যাব স্থাপনের নিয়ম একই। প্রথমে প্রয়োজনীয় ট্যাব আইকন সক্রিয় করতে হবে। এরপর পয়েন্টার রুলারের নির্দিষ্ট জায়গায় ক্লিক করলে সেখানে ঐ ট্যাব বসে যাবে।

টাইপ করার সময় প্রথম ঘর অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যা সাধারণ নিয়মে টাইপ করতে হবে। এরপর কী-বোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার দ্বিতীয় ঘর শুরুর জায়গায় গিয়ে বসবে।

দ্বিতীয় ঘর টাইপ করার পর আবার ট্যাব বোতামে চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার তৃতীয় ঘর শুরুর জায়গায় গিয়ে বসবে। একই নিয়মে চতুর্থ ঘর টাইপ করতে হবে। শেষ ঘর টাইপ করার পর কী-বোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিলে সাধারণ নিয়মে ইনসার্সন পয়েন্টার দ্বিতীয় লাইনের শুরুতে এসে বসবে।

মনে রাখতে হবে, বাম ট্যাব কলামের বাম দিকের মার্জিন একই বরাবর রাখে এবং দশমিক ট্যাব সংখ্যার দশমিকগুলো বরাবর রাখে। দশমিক যুক্ত সংখ্যা টাইপ করার সময় দশমিকের আগের সংখ্যাগুলো টাইপ হতে হতে বাম দিকে সরে যায় এবং দশমিকের পরের সংখ্যা দশমিকের ডান দিকে বসে। কিন্তু, কলামের প্রতিটি দশমিক একই বরাবর থাকে। এ ছাড়া মধ্য ট্যাব ব্যবহার করলে ঐ কলামের লেখাগুলো মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত হয় এ রকম−

কলামের মধ্য ট্যাবের ব্যবহার তেমন একটা হয় না বললেই চলে। তবে, প্রয়োজন হলে অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়। স্থাপন করা কোনো ট্যাব বাদ দিতে হলে মাউস পয়েন্টার দিয়ে রুলারে অবস্থিত ঐ ট্যাবটি ক্লিক করে মাউসে চাপ রেখে ড্র্যাগ করে রুলারের নিচে এনে ছেড়ে দিতে হয়। ইচ্ছে করলে আবার ওখানে নতুন করে এবং নতুন ধরনের ট্যাবও স্থাপন করা যাবে।
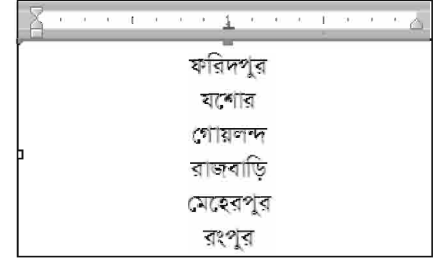
ট্যাব লিডার (Tab Leader)

ট্যাবের সাহায্যে করা কলামগুলোর মাঝখানে ডট (....), হাইফেন(----) ও আন্ডারলাইন (____) চিহ্ন ব্যবহার করে পাশাপাশি ঘরগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে। বিশেষভাবে ব্যবহৃত এ চিহ্নগুলোই হচ্ছে ট্যাব লিডার (Tab Leader)।

পাশাপাশি ঘরগুলোর মধ্যে ট্যাব লিডার বসানোর জন্য−

১. প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করতে হবে। ট্যাব-এর সাহায্যে করা যে কোনো একটি ঘর সিলেক্ট করতে গেলে পাশাপাশি সবগুলো ঘর সিলেক্টেড হয়ে যাবে। তাতে ট্যাব লিডার যুক্ত করার সুবিধা হবে না।

২. হোম ট্যাবভুক্ত প্যারাগ্রাফ ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে প্যারাগ্রাফ ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সের নিচে বাম দিকে ট্যাবস (Tabs) বোতামে ক্লিক করলে ট্যাবস (Tabs) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

৩. যে দুই ঘরের মাঝখানে ট্যাব লিডার বসাতে হবে ডায়লগ বক্সের ট্যাব স্টপ পজিশন (Tab Stop Position) লিস্ট বক্স থেকে তার ডান ঘরের ট্যাবের ইঞ্চি মাপক সংখ্যা সিলেক্ট করতে হবে।

৪. ডায়লগ বক্সের লিডার (Leader) ঘরের ১, ২, ৩ বা ৪ সংযুক্ত বাম পাশের বৃত্ত সিলেক্ট করতে হবে। প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে লিডারের নমুনা দেওয়া আছে।

৫. ডায়লগ বক্সের সেট (Set) বোতাম ক্লিক করতে হবে। একইভাবে অন্য ঘরগুলোর মধ্যে লিডার সংযোগের কাজ শেষ করে ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স চলে যাবে এবং সিলেক্ট করা অংশের ঘরগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা ট্যাব লিডার দ্বারা সংযুক্ত হবে।

ট্যাব লিডার তুলে ফেলা

ট্যাব লিডার তুলে ফেলার জন্য-

১. ট্যাব ডায়লগ বক্সের ট্যাব স্টপ পজিশন লিস্ট বক্সের নির্দিষ্ট মাপসূচক সংখ্যা সিলেক্ট করতে হবে।

২. ডায়লগ বক্সের ডান দিকে ক্লিয়ার (Clear) বোতাম ক্লিক করতে হবে।

৩. OK বাতামে ক্লিক করতে হবে। সবগুলো ট্যাব লিডার তুলে ফেলার জন্য ক্লিয়ার অল (Clear All) বোতাম ক্লিক করে OK বোতাম ক্লিক করতে হবে।

এ ছাড়া ট্যাব উঠিয়ে দেওয়ার জন্য রুলারের বসানো ট্যাব আইকনটি মাউস পয়েন্টারের সাহায্যে ড্র্যাগ করে রুলারের বাইরে এনে ছেড়ে দিলেই ট্যাব চলে যাবে।

কলাম (Column) বিন্যাস

সাপ্তাহিক, সংবাদ পরিক্রমা, নিউজ লেটার ইত্যাদির বিষয়বস্তু সাধারণত কলাম হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে। কলাম বিন্যাসের কাজ খুবই সহজ। প্রাথমিক টাইপ যে মাপেই করা হোক না কেন, অসুবিধা নেই। বানান সংশোধন এবং সম্পাদনার অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার পর গোটা বিষয়বস্তুকে কলামে বিন্যস্ত করে নেওয়া যায়। পত্রিকা, সংবাদ পরিক্রমা, মুখপত্র, নিউজ লেটার ইত্যাদির বিষয়বস্তু মুদ্রণের পাশাপাশি মাপ কতটুকু হবে তা আগে নির্ধারণ করে নিতে হবে। ধরা যাক, পাশাপাশি মুদ্রণ এলাকা সোয়া ৬ ইঞ্চি। এই মুদ্রণ এলাকার মধ্যে লিখিত বিষয়বস্তু দুই কলামে বিন্যস্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুই কলামের মাঝখানে .২৫ ইঞ্চি জায়গা খালি রাখা হবে। এত প্রতি কলামের প্রস্থ হবে ৩ ইঞ্চি।

বিষয়বস্তুকে ৩ কলামে বিন্যস্ত করতে হলে কলামের মাঝখানের জায়গা যদি আগের মতোই .২৫ ইঞ্চ রাখা হয়, তাহলে কলামের প্রস্থ হবে ১.৮৩ ইঞ্চি। ইচ্ছে করলে চার কলামেও বিন্যস্ত করা যেতে পারে। তাতে প্রতি কলামের প্রস্থ আরও কমে যাবে।

বিষয়বস্তুকে কলামে বিন্যস্ত করার জন্য-

১. পেজ লেআউট (Page Layout) ট্যাবভুক্ত কলামস (Columns) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন মাপের কলামের একটি তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে মোর কলামস (More Columns) সিলেক্ট করলে কলামস (Columns) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

২. কলামস (Columns) ডায়লগ বক্সের নাম্বার অব কলামস (Number of Columns)-এর ঘর রয়েছে। এ ঘরটি হচ্ছে কলামের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য। বিষয়বস্তুকে যত কলামে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন এ ঘরে সেই সংখ্যা টাইপ করতে হবে।

৩. দুই কলামের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা রাখার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে স্পেসিং (Spacing)-এর নিচের বক্সের মাপ সূচক সংখ্যা, যেমন−.২৫, .৭৫ ইত্যাদি টাইপ করে অথবা বক্সের ঊর্ধ্ব বা নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করে প্রাপ্ত সংখ্যা নির্বাচন করে।

কলামের সংখ্যা ও দুই কলামের মাঝখানের জায়গা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের সঙ্গে ডায়লগ বক্সের ডান পাশে নিচের দিকে নমুনা ঘরে বিন্যাসকৃত নমুনা দেখা যাবে।

৪. ডায়লগ বক্সে OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স চলে যাবে এবং ফাইলের বিষয়বস্তু কলামের বিন্যস্ত হবে। পেজ লেআউট এবং প্রিন্ট প্রিভিউয়ে কলামের পাশাপাশি অবস্থান দেখা যাবে। পেজ লেআউট কলামের বিষয়বস্তু সম্পাদনার সব ধরনের কাজই করা যাবে।
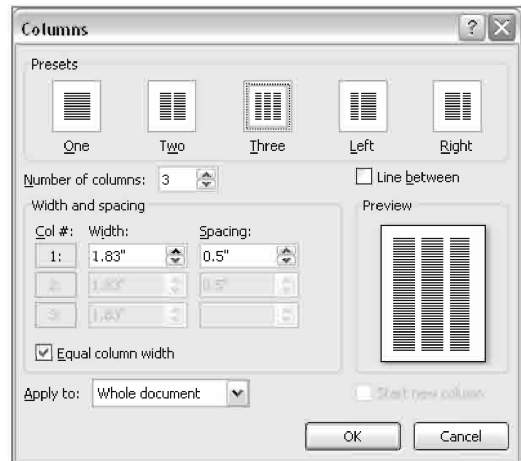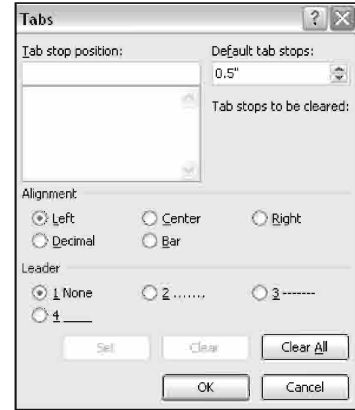
সারণি (Table)

কোনো বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ঘরে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করাকেই সারণি হিসেবে অভিহিত করা হয়। নাম, পরিচয়, সংখ্যা, মন্তব্য ইত্যাদি বিভিন্ন ঘরে সাজিয়ে পরিবেশন করার জন্যই প্রধানত সারণির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে।

সারণি তৈরির পদ্ধতি

১. সারণি তৈরির স্থানে ইনসার্সন বসাতে হবে।

২. ইনসার্ট ট্যাবভুক্ত রিবনে টেবল (Table) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে একটি ফ্লাইআউট তালিকা দেখা দেবে। এ তালিকার নিচের অংশে ইনসার্ট টেবিল (Insert Table) কমান্ড সিলেক্ট করলে ইনসার্ট টেবিল (Insert Table) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে। ডায়লগ বক্সের সাহায্যেই মূল সারণি তৈরি করতে হবে। এরপর বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের কাজ, যেমন– কলাম ছোট-বড় করা, সারির সংখ্যা বাড়ানো, সারণিকে মাঝখান থেকে বিভক্ত করা, বেষ্টনী রেখা যুক্ত করা ইত্যাদি কাজ সময় মতো প্রয়োজন অনুযায়ী করে নেওয়া যায়। কলাম হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে চলে আসা ঘর এবং সারি হচ্ছে পাশাপাশি ঘর।

৩. প্রয়োজনানুযায়ী সারণির কলাম ও সারির সংখ্যা নির্ধারণ করে নেওয়ার জন্য ডায়লগ বক্সের নাম্বার অব কলামস (Number of Columns)-এর ডান পাশের ঘরে কলামের সংখ্যা, ধরা যাক, ৪ এবং নাম্বার অব রোস (Number of Rows)-এর ডান পাশের ঘরে সারির সংখ্যা, ধরা যাক, ৩ টাইপ করা যেতে পারে।

৪. প্রতিটি কলামের পাশাপাশি মাপ কতটুকু হবে তা নির্ধারণ করে নেওয়ার জন্য কলাম উইডথ (Column Width)-এর ডান পাশের ঘরে প্রয়োজনীয় মাপের সংখ্যা টাইপ করতে হবে।

৫. ডায়লগ বক্সের OK বোতাম ক্লিক করতে হবে।
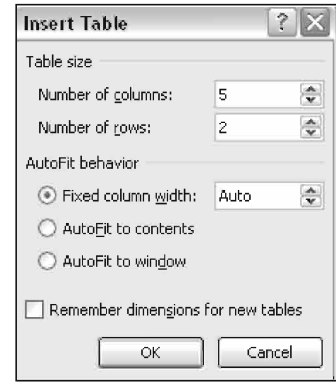
ইনসার্সন পয়েন্টারের স্থানে ৪টি কলাম ও ৩টি সারি বিশিষ্ট একটি শূন্য সারণি পাওয়া যাবে।

কলামের পাশাপাশি মাপ ছোট-বড় করা

টেবিল সিলেক্ট করলে বা টেবিলের ভেতরে ইনসার্সন পয়েন্টার রাখা হলে লেআউট (Layout) নামে নতুন একটি ট্যাব যুক্ত হবে। লেআউট (Layout) ট্যাবের রিবনে টেবিল নিয়ে কাজ করার বিভিন্ন প্রকার কমান্ড বা টুল রয়েছে। কলামের পাশাপাশি মাপ ছোট-বড় করার জন্য–

১. নির্দিষ্ট কলামের যে কোনো একটি ঘর সিলেক্ট করতে হবে বা ঐ ঘরের ইনসার্সন পয়েন্টার থাকতে হবে।

২. লেআউট (Layout) ট্যাবের রিবনে সেল সাইজ (Cell Size) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে টেবিল প্রোপার্টিজ (Table Properties) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

৩. ডায়লগ বক্সের কলাম ট্যাবে ক্লিক করার পর প্রিফার্ড উইডথ (Preferred Width) ঘরে প্রয়োজনীয় সংখ্যা টাইপ করে ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৪. ডায়লগ বক্সে প্রদত্ত মাপ অনুযায়ী কলামের মাপ নির্ধারিত হয়ে যাবে।

কলাম ছোট-বড় করার আরও একটি পদ্ধতি

১. যে কোনো কলামের খাড়াখাড়ি গ্রিডলাইনের উপর ইনসার্সন পয়েন্টার স্থাপন করলে ইনসার্সন পয়েন্টার দ্বিমুখী তীরে রূপান্তরিত হবে।

২. মাউসে চাপ রেখে দ্বিমুখী তীরযুক্ত কলাম গ্রিডলাইনকে ডান/বাঁয়ে সরিয়ে কলামের মাপ ছোট-বড় করতে হবে।

সারি বা ঘরের উচ্চতা কম-বেশি করা

ধরা যাক, ৪ কলামের একটি সারণির প্রতিটি সারিতে পাশাপাশি ৪টি করে ঘর আছে। ঘরের পাশাপাশি মাপ হচ্ছে কলামের মাপ। একটি ঘরকে নিচের দিকে প্রয়োজন মতো বড় করা যায়। তবে, কোনো একটি ঘরকে ভিন্নভাবে ছোট-বড় করা যায় না। যে কোনো একটি ঘর বড় করলে ঐ সারির প্রতিটি ঘরই সমান মাপে বড় হয়ে যায়। যেমন– একটি ঘরে হয়তো মাত্র একটি লাইন আছে এবং অন্য যে কোনো একটি ঘরে চার/পাঁচটি লাইন আছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি লাইন বিশিষ্ট ঘরের মাপে অন্যান্য ঘরগুলোও বড় হবে। লাইনের সংখ্যা কমিয়ে দিলে ঘরের মাপ এমনিতেই ছোট বড় হয়ে যাবে। একটি ঘরে যদি ১৮ পয়েন্ট অক্ষরের একটি লাইন থাকে এবং অন্যান্য ঘরে ১২ পয়েন্টের লাইন থাকে, তাহলে ঐ সারির প্রতিটি ঘরের উচ্চতাই ১৮ পয়েন্টের ঘরের সমান হবে। তবে, প্রয়োজন হলে সারির ঘরগুলোর উচ্চতা কতটুকু হবে তা অবশ্য আগেই নির্ধারণ করে নেওয়া যায়। এ জন্য–
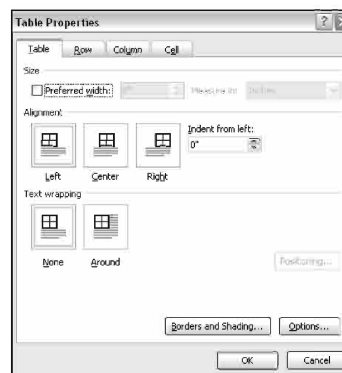
১. নির্দিষ্ট সারির যে কোনো একটি ঘর সিলেক্ট করতে হবে বা ঐ ঘরের ইনসার্সন পয়েন্টার থাকতে হবে।

২. লেআউট (Layout) ট্যাবের রিবনে সেল সাইজ (Cell Size) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে টেবিল প্রোপার্টিজ (Table Properties) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

৩. ডায়লগ বক্সের রো (Row) ট্যাবে ক্লিক করার পর স্পেসিফাই হাইট (Specify Height) ঘরে প্রয়োজনীয় সংখ্যা টাইপ করে ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৪. ডায়লগ বক্সে প্রদত্ত মাপ অনুযায়ী সারির উচ্চতা নির্ধারিত হয়ে যাবে।

স্বাভাবিক নিয়মে টাইপ করা বিষয়বস্তু বেশি হলে লাইনগুলো নিচের দিকে নেমে আসতে থাকবে এবং সারির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। কিন্তু নির্দিষ্ট মাপে সারির উচ্চতা নির্ধারণ করা হলে অক্ষর ক্ষুদ্রাকার হলেও সারির উচ্চতা কম হবে না।

সারণি/সারির মার্জিন বিন্যাস

সারণি প্রাথমিকভাবে বাম মার্জিনে বিন্যস্ত থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে টেবিলকে পৃষ্ঠার বাম দিকে, ডান দিকে বা মাঝখানে স্থাপন করার জন্য–

১. লেআউট (Layout) ট্যাবের রিবনে সেল সাইজ (Cell Size) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে টেবিল প্রোপার্টিজ (Table Properties) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে। বিরনের বাম দিকে টেবিল প্রোপার্টিজ (Table Properties) কমান্ডে ক্লিক করলেও একই ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

৩. ডায়লগ বক্সের টেবিল (Table) ট্যাবে ক্লিক করলে এ্যালাইনমেন্ট (Alignment) অংশে টেবিলের অবস্থান নির্ধারণী তিনটি আইকন পাওয়া যাবে।

৪. লেফট (Left) আইকন সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা পুরো সারণি বা নির্দিষ্ট সংখ্যক সারি বাম বিন্যাসে বিন্যস্ত হবে। সেন্টার (Center) আইকন সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা পুরো সারণি বা নির্দিষ্ট সংখ্যক সারি মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত হবে। রাইট (Right) আইকন সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা পুরো সারণি বা নির্দিষ্ট সংখ্যক সারি মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত হবে।
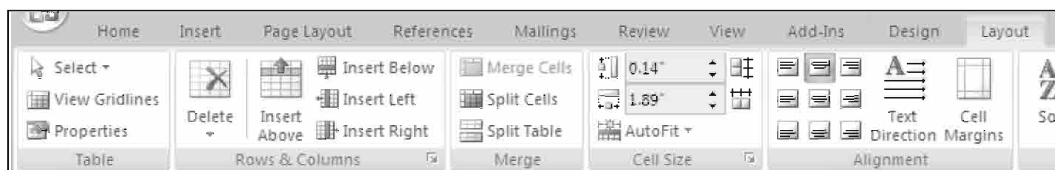
সারণির বিষয়বস্তু টাইপ করা

সারণির বিষয়বস্তু টাইপ করার জন্য প্রথম কলামের ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার ক্লিক করে প্রথম কলামের প্রথম ঘরের বিষয়বস্তু টাইপ করতে হবে। টাইপ করার সময় বা টাইপ শুরুর আগে সাধারণ নিয়মেই অক্ষরের আকার ও আকৃতি ঠিক করে নিতে হবে। প্রথম ঘরের বিষয়বস্তু টাইপ শেষে কী-বোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলেই ইনসার্সন পয়েন্টার দ্বিতীয় ঘরের শুরুতে গিয়ে বসবে। দ্বিতীয় ঘরের বিষয়বস্তু টাইপ করতে হবে।

যে কোনো ঘরে টাইপ করার সময় বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে তা ঐ ঘরের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই জায়গা করে নেবে। একটির পর একটি করে লাইন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটিও নিচের দিকে বাড়তে থাকবে। কিন্তু দু'পাশের সীমারেখা একটুও নড়চড় হবে না। কারণ, কলাম উইডথ ডায়লগ বক্সে যে মাপ নির্দিষ্ট করা আছে, কলামের মোট পাশাপাশি মাপ ঠিক ততটুকু জায়গার মধ্যেই বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ থাকবে।

সারণি পদ্ধতিতে কাজ করার এটিই একটি নিশ্চিত সুবিধা। কলামের পাশাপাশি মাপ যত ছোট করাই হোক না কেন, এক ঘরের লেখা অন্য ঘরে যায় না। লাইন বেড়ে ঘরটি নিচের দিকে বড় হতে থাকে।

বিভিন্ন ঘর, সারি ও কলামে যাওয়া

টাইপ করার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ঘরে, সারিতে বা কলামে যাওয়ার জন্য–

১. এক ঘর থেকে পরবর্তী ঘরে যাওয়ার জন্য কী-বোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার পরবর্তী ঘরের শুরুতেই গিয়ে বসবে।

২. ইনসার্সন পয়েন্টার যদি একটি সারির সর্বশেষ ঘরে থাকে, তাহলে শিফট বোতাম চেপে ট্যাব বোতামে চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার ঠিক তার বাম পাশের ঘরে সরে যাবে। ইনসার্সন পয়েন্টার যদি একটি সারির প্রথম ঘরে থাকে, তাহলে শিফট বোতাম চেপে ট্যাব বোতামে চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার ঠিক উপরে সারির সর্বশেষ ঘরে গিয়ে বসবে।

ইনসার্সন পয়েন্টারের স্থান পরিবর্তনের স্থান সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, মাউসের সাহায্যে আই-বিম যে কোনো জায়গায় স্থাপন করে ক্লিক করলেই সেখানে ইনসার্সন পয়েন্টার বসে যাবে।

সারণির বিষয়বস্তু, ঘর, সারি, কলাম ইত্যাদি সিলেক্ট করা

সারণির মধ্যেকার বিষয়বস্তু সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ওয়ার্ডপ্রসেসিংয়ের সাধারণ নিয়মই অনুসরণ করতে হয়।

কিন্তু সারণির উপর-নিচ বা পাশাপাশি দুই ঘরের বিষয়বস্তুর অংশবিশেষ সিলেক্ট করা যায় না। যেমন– উপরের ঘরের অংশবিশেষ সিলেক্ট করে ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই উপরের এবং নিচের দুটি ঘরের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সিলেক্টেড হয়ে যাবে।

প্রতি ঘরের বাম প্রান্তরেখা এবং কলামের উপরের ঘরের শীর্ষরেখা হচ্ছে সিলেকশন বার। যে কোনো ঘরে বাম প্রান্তরেখার নিকট আই-বিম ডানমুখী তীরচিহ্নের আকার ধারণ করবে। এ অবস্থায় ক্লিক করলে তীরের ডান দিকের ঘর সিলেক্টেড হবে।

একটি সারির যে কোনো ঘরের সিলেকশন বার-এ তীর স্থাপন করে ডবল-ক্লিক করলে বা সারির প্রথম ঘরের বাম দিকে সিলেকশন বার-এ ক্লিক করলে সারি সিলেক্ট হবে। কলামের উপরের ঘরের শীর্ষরেখায় আই-বিম নিম্নমুখী তীরচিহ্নের আকার ধারণ করবে। এ অবস্থায় ক্লিক করলে পুরো কলাম সিলেক্টেড হয়ে যাবে। মাউসে চাপ রেখে ডান বা বাম দিকে ড্র্যাগ করে গেলে ডানের বা বামের কলামগুলোও সিলেক্টেড হবে।

যে কোনো সারি সিলেক্ট করার পর নিচের দিকে বা উপরের দিকে ড্র্যাগ করে নিচের ও উপরের সারি সিলেক্ট করা যায়।

বাড়তি সারি যোগ করা

কাজ শুরুর জন্য, ধরা যাক, ৪ সারি বিশিষ্ট একটি সারণি তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল ৪টি সারির পরে আরও কয়েকটি সারি যোগ করা প্রয়োজন। নিচের দিকে বাড়তি সারি যোগ করা অত্যন্ত সহজ। সর্বশেষ সারির সর্বশেষ ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে ট্যাব বোতামে চাপ দিলে শেষ সারির ঠিক নিচেই একটি নতুন শূন্য সারি তৈরি হয়ে যাবে। নতুন সারিটির ঘরের সংখ্যা, মাপ ইত্যাদি পূর্ববর্তী সারিটির মত হুবহু একইরকম হবে। নতুন সারিটি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনসার্সন পয়েন্টারও ঐ সারির প্রথম ঘরে অবস্থান করবে। এভাবে প্রতিবার একটি করে নতুন সারি তৈরি করে নেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

সারণির মাঝখানে বা উপরে সারি যোগ করা

সারণির উপরে বা যে কোনো অবস্থানে নতুন সারি যোগ করার জন্য–

১. সারণির প্রথম সারি সিলেক্ট করতে হবে বা প্রথম সারির যে কোনো ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার রাখতে হবে।
২. লেআউট (Layout) ট্যাবের রিবনে ইনসার্সন এ্যাবাভ (Insert Above) আইকনে ক্লিক করতে হবে।
– সারণির উপরে একটি শূন্য নতুন সারি যুক্ত হবে। সারিটির ঘরের সংখ্যা, মাপ ইত্যাদি করা সারির মতো হুবহু একই রকম হবে।

সারণির যে কোনো অবস্থানে উল্লিখিত নিয়মে নতুন সারি যোগ করা যায়। ধরা যাক, সারণির মধ্যবর্তী স্থানে একটি নতুন সারি যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী অবস্থানের একটি সারি সিলেক্ট করে বা ঐ সারির যে কোনো ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার রেখে পূর্ববর্তী নিয়মে নতুন একটি শূন্য সারি যোগ করে নেওয়া যায়।

কোনো সারির নিচে নতুন সারি যোগ করার জন্য ইনসার্সন বিলো (Insert Below) আইকনে ক্লিক করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, যে সারিটি সিলেক্ট করা হবে নতুন শূন্য সারিটি ঠিক তার উপরে বসবে।

প্রয়োজনানুযায়ী একাধিক শূন্য সারি যোগ করার জন্য–

যে কয়টি শূন্য সারি যোগ করা প্রয়োজন, ততটি সারি সিলেক্ট করে নিতে হবে।

ইনসার্সন এ্যাবাভ (Insert Above) অথবা ইনসার্সন বিলো (Insert Below) আইকনে ক্লিক করতে হবে।

– সিলেক্ট করা সারিগুলোর উপরে বা নিচে সমসংখ্যক শূন্য সারি যুক্ত হয়ে যাবে।

নতুন কলাম যোগ করা

নতুন কলাম যোগ করার জন্য–

১. যে অবস্থানে কলাম যোগ করা প্রয়োজন ঠিক তার ডান/বাম পাশের কলামটি সিলেক্ট করতে হবে অথবা ঐ কলামের যে কোনো ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার রাখতে হবে।
২. রিবনে ইনসার্সন লেফট (Insert Left) অথবা ইনসার্সন রাইট (Insert Right) আইকনে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা কলামের বাম পাশে অথবা ডান পাশে অনুরূপ একটি শূন্য কলাম যোগ হবে।

নতুন শূন্য কলামটির সারির সংখ্যা মাপ ইত্যাদি সব কিছুই বাম/ডান পাশের কলামের মতো হুবহু একই রকম হবে।

একাধিক কলাম যোগ করার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কলাম বা পাশাপাশি একাধিক ঘর সিলেক্ট করে নিতে হবে।

সারি বাদ দেওয়া

১. একটি সারি বাদ দেওয়ার জন্য ঐ সারিটি সিলেক্ট করতে হবে অথবা ঐ সারির যে কোনো ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার রাখতে হবে। একাধিক সারি বাদ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সারি সিলেক্ট করতে হবে অথবা একাধিক সারির ঘর সিলেক্ট করতে হবে।
২. লেআউট (Layout) ট্যাবের রিবনে টেবিল ডিলিট (Delete) আইকনে ক্লিক করে মাউসে চাপ রাখলে কয়েকটি অপশন/কমান্ড দেখা যাবে। এ অপশন/কমান্ড তালিকা থেকে ডিলিট রোস (Delete Rows) সিলেক্ট করলে সিলেক্ট করা সারি/সারিগুলি বাতিল হয়ে যাবে।

এতে উঠে যাওয়া সারিগুলোর জায়গায় কোনো শূন্যতা সৃষ্টি হবে না। কারণ, উঠে যাওয়া সারির নিচের সারি উপরের সারির সঙ্গে মিলে যাবে।

কলাম বাদ দেওয়া

১. এক বা একাধিক কলাম সিলেক্ট করতে হবে বা কলামগুলোর একটি করে ঘর সিলেক্ট করতে হবে।

২. লেআউট (Layout) ট্যাবের রিবনে টেবিল ডিলিট (Delete) আইকনে ক্লিক করে মাউসে চাপ রাখলে কয়েকটি অপশন/কমান্ড দেখা যাবে। এ অপশন/কমান্ড তালিকা থেকে ডিলিট কলামস (Delete Columns) কমান্ড দিলে সিলেক্ট করা কলাম/কলামগুলো উঠে যাবে এবং উঠে যাওয়া কলামের ডান পাশের কলামগুলো বাম পাশের কলামের সঙ্গে মিলে যাবে।

সারণি বিভক্ত ও সংযুক্ত করা

সারণির উপর-নিচের দুই অংশের মাঝখানে নতুন শিরোনাম বসানোর জন্য সারণি বিভক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। ধরা যাক, একটি সারণিকে ৬ নম্বর সারি থেকে বিভক্ত করতে হবে। এ জন্য সারণির ৬ নম্বর সারি সিলেক্ট করে বা ঐ সারির যে কোনো ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার রেখে কী-বোর্ডের Ctrl ও Shift বোতাম চেপে এন্টার বোতামে চাপ দিলে সারণিটি ৬ নম্বর সারি থেকে বিভক্ত হয়ে যাবে। উপরের অংশ থাকবে ৫ নম্বর সারি পর্যন্ত এবং নিচের অংশ শুরু হবে ৬ নম্বর সারি থেকে। দুই অংশের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থাকবে। ফাঁকা জায়গায় ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে টাইপ করা যায়। বা এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে নিচের অংশকে আরও নিচে নামানো যায়।

বিভক্ত সারণিকে সংযুক্ত করার জন্য বিভক্ত দুই অংশের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা সিলেক্ট করে কী-বোর্ডের ডিলিট বোতামে চাপ দিলে বিভক্ত সারণি সংযুক্ত হয়ে যাবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, সারণিকে পাশাপাশি বিভক্ত করা যায় না।

শিরোনাম বসানোর জন্য সারণি নিচে নামানো

পৃষ্ঠার শুরু থেকে সারণি তৈরি করার পর যদি মনে হয় সারণির উপর শিরোনাম বসানো দরকার, তাহলে সারণিকে উপর থেকে কিছুটা নিচে নামিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ, সারণির উপরে কিছুটা ফাঁকা জায়গা বের করতে হবে। এ জন্য সারণির প্রথম সারি সিলেক্ট করে সারণি বিভক্ত করার পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সারণি উপর থেকে কিছুটা নিচে নেমে আসবে। তখন সারণির উপরে ফাঁকা জায়গায় ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে শিরোনাম টাইপ করা যাবে বা এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে সারণিটিকে আরো নিচে নামিয়ে আনা যাবে।

সারণির বিষয়বস্তু সম্পাদনা

সারণির বিষয়বস্তু টাইপ ও সম্পাদনার বেশির ভাগ কাজই সাধারণ টাইপ ও সম্পাদনার নিয়মেই করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সামান্য ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন– কোনো ঘরে কিছু টাইপ করার পর এন্টার বোতামে চাপ দিলে ইনসার্সন পয়েন্টার একই ঘরে পরবর্তী অনুচ্ছেদ শুরুর জায়গায় গিয়ে বসে, নিচের সারিতে যায় না। একটি ঘরের বিষয়বস্তু কাট বা কপি করে অন্য ঘরে পেস্ট করার ক্ষেত্রেও কিছুটা ভিন্নভাবে কাজ হয়। যেমন– একটি ঘরের বিষয়বস্তু কাট বা কপি করে অন্য ঘরে পেস্ট করার ক্ষেত্রে যদি পুরো ঘরটি সিলেক্ট করে কাট বা কপি করা হয়, তাহলে যে ঘরে পেস্ট করা হবে সে ঘরের নিজস্ব বিষয়বস্তু হারিয়ে যাবে। কাট বা কপি করা বিষয়বস্তু সেই ঘরের নতুন বিষয়বস্তুতে সংযোজন করতে হলে কাট বা কপি করার সময় পুরো ঘর সিলেক্ট না করে শুধু লেখা অংশটুকু সিলেক্ট করে কাট বা কপি করতে হবে। এতে পেস্ট করা ঘরের নিজস্ব বিষয়বস্তু ঠিক থাকবে এবং পেস্ট করা বিষয়বস্তু নতুন বিষয় হিসেবে যুক্ত হবে। যেহেতু পুরো ঘর সিলেক্ট করে কাট বা কপি করার পর অন্য ঘরে পেস্ট করলে পেস্ট করা ঘরের নিজস্ব বিষয়বস্তু হারিয়ে যায়, সেহেতু এক সঙ্গে দু'তিন ঘরের বিষয়বস্তু কাট বা কপি করে অন্য ঘরের বিষয়বস্তু ঠিক রেখে বসানো যায় না। এ ধরনের প্রয়োজন দেখা দিলে দুই/তিন ঘরের বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে ৩ বার কাট বা কপি করে ৩ বারে পেস্ট করতে হবে।

সারণির লেখা সজ্জিতকরণ (Formatting)

সারণির মধ্যে টাইপ করা বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে সজ্জিত করার সব রকমের সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি ঘর, সারি ও কলামের লেখা ভিন্ন ভিন্নভাবে সজ্জিত করা যায়। একই ঘরের প্রতিটি লাইন ভিন্ন ভিন্নভাবে সজ্জিত করা যায়। যেমন– কোনো লাইন মোটা অক্ষরে, কোনো লাইন ইটালিকে, কোনো লাইন আন্ডারলাইনে, কোনো লাইন বাম বিন্যাসে, কোনো লাইন ডান বিন্যাসে সজ্জিত করা যায়।

লেখার উপরে এবং নিচে ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ

সারণির প্রতিটি সারির উপরে এবং নিচে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রাখতে হয়। ফাঁকা জায়গা থাকে বলেই প্রিন্ট নেয়ার পর প্রতিটি সারি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। সারির উপরে জায়গা রাখলে নিচে জায়গা রাখার প্রয়োজন হয় না। হয়তো কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা প্রয়োজনে একই সঙ্গে সারির উপরে এবং নিচে জায়গা রাখার প্রয়োজন হতে পারে।
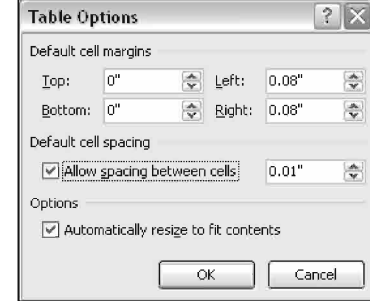
পুরো সারণি সিলেক্ট করে লেআউট (Layout) ট্যাবের রিবনে সেল মার্জিনস (Cell Margins) আইকনে ক্লিক করলে টেবিল অপশনস (Table Options) ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সের বিভিন্ন অপশন পূরণ করে প্রতিটি ঘরের লেখার উপরের-নিচের ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ করা করতে হবে।

সারণিতে রেখা বেষ্টনী (Box) ও অন্যান্য রেখা যুক্ত করা ও বাদ দেওয়া

সারণিতে রেখা বেষ্টনী যুক্ত করার জন্য–

১. কোনো সারি বা পুরো সারণি সিলেক্ট করতে হবে।

২. ডিজাইন (Design) ট্যাবে ক্লিক করলে ডিজাইন ট্যাবভুক্ত রিবন পাওয়া যাবে।

৩. এ রিবনের শেডিং (Shading) এবং বর্ডারস (Borders) অপশন/কমান্ডে ক্লিক করে মাউসে চাপ রাখলে শেডিং এবং বর্ডারের বিভিন্ন অপশন তালিকা দেখা যাবে। এ তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ডার ও শেড সিলেক্ট করলে টেবিলে ঐ বর্ডার ও শেডিং কার্যকর হবে।

৪. শেডিং তালিকা থেকে নো কালার (No Color) এবং বর্ডার তালিকা থেকে নো বর্ডার (No Border) সিলেক্ট করলে টেবিলে প্রয়োগকৃত বর্ডার ও শেড উঠে যাবে।
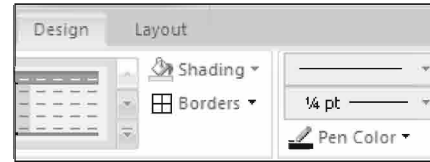
শীর্ষচরণ (Header), পাদচরণ (Footer)

বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে অনেক সময় বইয়ের নাম লেখা থাকে। পৃষ্ঠার উপরের এই পরিচিতিমূলক লেখাকে শীর্ষচরণ বা হিডার (Header) বলা হয়। শীর্ষচরণ এক বা একাধিক লাইনের হতে পারে। সাধারণত এক লাইনের লেখাকেই শীর্ষচরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পৃষ্ঠার নিচে পৃষ্ঠা সংখ্যা, ফর্মা সংখ্যা বা ইচ্ছে করলে আরও কিছু সংযোজন করা যেতে পারে। পৃষ্ঠার নিচের লেখাকে বলা হয় পাদচরণ বা ফুটার (Footer)। পাদচরণে সাধারণত পৃষ্ঠা সংখ্যাই ব্যবহার করা হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা অবশ্য শীর্ষচরণের সঙ্গেও ডান দিকে অথবা বাম দিকে ব্যবহার করা যায়।

বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা শুরু হয় ডান দিক থেকে। পরের পৃষ্ঠা, অর্থাৎ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থাকে বাম দিকে। এভাবে গোটা বইয়ের ডান দিকের পৃষ্ঠা বিজোড় পৃষ্ঠা (Odd Page) এবং বাম দিকের পৃষ্ঠা জোড় পৃষ্ঠা (Even Page) হয়ে থাকে। কাজেই ডান দিকের শীর্ষচরণকে বিজোড় শীর্ষচরণ (Odd Header) এবং বাম দিকের শীর্ষচরণকে জোড় শীর্ষচরণ (Even Header) বলা হয়। পাদচরণের ক্ষেত্রেও জোড় পাদচরণ এবং বিজোড় পাদচরণ ব্যবহার করা যায়।

শীর্ষচরণ/পাদচরণ ব্যবহার করার জন্য–

ইনসার্ট (Insert) ট্যাবের রিবনে হিডার এন্ড ফুটার (Header & Footer) অংশে হিডার (Footer), ফুটার (Footer)
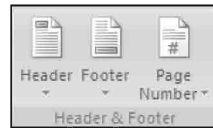
এবং পেজ নাম্বার (Page Number) আইকন রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আইকনে বা আইনের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশন তালিকা প্রদর্শিত হবে। এ তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় অপশন সিলেক্ট করলে শীর্ষচরণ বা পাদচরণের জায়গায় কিছু লেখা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে। ঐ লেখা মুছে শীর্ষচরণ বা পাদচরণের লেখা টাইপ করতে হবে। কোনো লেখা কপি করেও এ ক্ষেত্রে পেস্ট করা যাবে।

শীর্ষচরণ/পাদচরণের সঙ্গে পৃষ্ঠা সংখ্যা যুক্ত করার জন্য পেজ নাম্বার (Page Number) আইকনে ক্লিক করলে পৃষ্ঠার উপরে বা নিচে বা অন্য অবস্থানে পৃষ্ঠা নম্বর বসানোর ছক সংবলিত তালিকা প্রদর্শিত হবে। প্রয়োজনীয় ছকে ক্লিক করলে ঐ অবস্থানে পৃষ্ঠা নম্বর বসে যাবে। কারেন্ট পজিশন (Current Position)-এর ছক সিলেক্ট করলে ইনসার্সন পয়েন্টারের জায়গায় পৃষ্ঠা নম্বর বসে যাবে।

- শীর্ষচরণ, পাদচরণ এবং পৃষ্ঠা নম্বর সাধারণ নিয়মে সম্পাদনা করা যাবে। শীর্ষচরণ অপশন ছকের নিচে এডিট হিডার, রিমুভ হিডার, পাদচরণ অপশন ছকের নিচে এডিট ফুটার, রিমুভ ফুটার এবং পেজ নাম্বার অপশন ছকের নিচে ফরমেট পেজ নাম্বার ও রিমুভ পেজ নাম্বার অপশন রয়েছে।
- এডিট হিডার ও এডিট ফুটার অপশন সিলেক্ট করলে ইনসার্সন পয়েন্টার হিডার বা ফুটারের জায়গায় বসে যাবে। এ অবস্থায় সম্পাদনার কাজ করা যাবে। রিমুভ অপশন সিলেক্ট করলে হিডার/ফুটার বাতিল হয়ে যাবে।
- পৃষ্ঠা নম্বরের ধরন বিন্যস্ত করার জন্য ফরমেট পেজ নাম্বার (Format Page Number) অপশনে ক্লিক করলে ফরমেট পেজ নাম্বার (Format Page Number) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে। এ ডায়লগ বক্সে নাম্বার ফরমেট (Number Format) এডিট বারের তীরে ক্লিক করলে পৃষ্ঠা নম্বরের কয়েকটি নমুনা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে নমুনা অনুযায়ী পৃষ্ঠা নম্বরের সংখ্যার ধরন বিন্যস্ত হবে।

পেজ লেআউট (Page Layout)

পেজ লেআউট (Page Layout) ট্যাবের রিবনের পেজ সেটআপ (Page Setup) অংশে পৃষ্ঠা সজ্জার বিভিন্ন অপশন রয়েছে। এ সব অপশন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা সজ্জার কাজ করতে হয়। এ অংশের নিচে পেজ সেটআপ (Page Setup) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে পেজ সেটআপ (Page Setup) ডায়লগ বক্স আসবে। পেজ সেটআপ (Page Setup) ডায়লগ বক্স ব্যবহার করে একবারে অনেকগুলো অপশন পূরণ করে পৃষ্ঠা সজ্জার কাজ করা যায়।

পৃষ্ঠার মাপ নির্ধারণ (Page Setup)

সম্পাদনার কাজ শেষ করার পর মুদ্রণ নেওয়ার আগে চূড়ান্তভাবে পৃষ্ঠার মাপ নির্ধারণ করে নেওয়া প্রয়োজন। লেখার

পাশাপাশি মাপ কতটুকু হবে, কোনো দিকে কতটুকু মার্জিন রাখতে হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হয় পেজ সেটআপ (Page Setup) ডায়লগ বক্সে বিভিন্ন ঘর পূরণ করে। লেখালেখির কাজ শুরু করার আগেও পৃষ্ঠার মাপ ঠিক করে নেওয়া যায়।
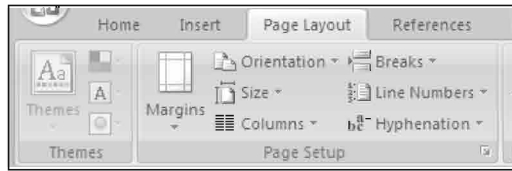
পেজ সেটআপ ডায়লগ বক্সের উপরের দিকে ৩টি ট্যাব রয়েছে; মার্জিনস (Margins), পেপার (Paper) এবং লেআউট (Layout)।

মার্জিন নির্ধারণের জন্য মার্জিনস (Margins) ট্যাবে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্সটি মার্জিনস (Margins) ডায়লগ বক্সে পরিণত হবে।

- মার্জিনস (Margins) ডায়লগ বক্সে উপরের মার্জিন (Top), নিচের মার্জিন (Bottom), বাম দিকের মার্জিন (Left) এবং ডান দিকের মার্জিন (Right) নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট এডিট বারের উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করে করে মাপসূচক সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে। সরাসরি টাইপ করেও মাপসূচক সংখ্যা বসানো যাবে।
- মার্জিন হচ্ছে পৃষ্ঠার প্রান্ত থেকে লেখার প্রান্ত পর্যন্ত মাঝখানের ফাঁকা জায়গা। যেমন– ইউএস লেটার আকারের কাগজের মাপ হচ্ছে ১১ ইঞ্চি লম্বা এবং সাড়ে ৮ ইঞ্চি চওড়া। এ ক্ষেত্রে ডায়লগ বক্সের উপরের মার্জিন (Top) ঘরে ১ ইঞ্চি, নিচের মার্জিন (Bottom) ঘরে ১ ইঞ্চি, বাম দিকের মার্জিন (Left) ঘরে ১.২৫ ইঞ্চি এবং ডান দিকের মার্জিন

(Right) ঘরে ১.২৫ ইঞ্চি টাইপ করা হলে বা নির্ধারণ করা হলে কাগজের উপর মুদ্রণের এলাকা দাঁড়াবে উপর থেকে নিচের দিকে ৯ ইঞ্চি এবং পাশাপাশি ৬ ইঞ্চি। কারণ, কাগজের দু'পাশ থেকে ১.২৫+১.২৫=২.৫০ ইঞ্চি জায়গা বাদ যাবে এবং উপর-নিচ থেকে ১+১=২ ইঞ্চি জায়গা বাদ যাবে।

২. উপস্থাপন (Orientation) ঘরে দুটি অপশন রয়েছে, খাড়াখাড়ি (Potriat) ও আড়াআড়ি (Landscape)। খাড়াখাড়ি মুদ্রণ হচ্ছে সাধারণ নিয়মে মুদ্রণ। কাগজ লম্বাভাবে রেখে উপর থেকে নিচের দিকে মুদ্রিত হয়ে আসা, পক্ষান্তরে আড়াআড়ি মুদ্রণ হচ্ছে কাগজ আড়াআড়ি রেখে মুদ্রণ নেয়া। পাশাপাশি অনেক ঘর বিশিষ্ট-সারণি মুদ্রণের জন্য এ ধরনের মুদ্রণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

কাগজের আকার (Paper Size)

পেজ সেটআপ (Page Setup) ডায়লগ বক্সের কাগজের আকার, অর্থাৎ পেপার (Paper) ট্যাবে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্সটি পেপার সাইজ (Paper) ডায়লগ বক্সে পরিণত হবে।

ডায়লগ বক্সের পেপার সাইজ (Paper Size) পুল-ডাউন মেনুর তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন মাপের কাগজের নামের তালিকা পাওয়া যাবে। তালিকা থেকে যে নামটি সিলেক্ট করা হবে চওড়া (Width) ও উচ্চতা (Height) ঘরে সিলেক্ট করা কাগজের মাপসূচক সংখ্যা উঠবে। এর বাইরে অন্য কোনো মাপের কাগজ ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে চওড়া (Width) ও উচ্চতা (Height) ঘরে মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করলে পেপার সাইজ (Paper Size) ঘরে কাস্টম সাইজ (Custom Size) প্রদর্শিত হবে।

মুদ্রণ (Print)

সব রকম সম্পাদনা, পৃষ্ঠা অবলোকন এবং পৃষ্ঠার মাপ নির্ধারণের কাজ শেষ করে মুদ্রণের পর্ব শুরু করতে হয়। মুদ্রণ নেওয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে, কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টারের সংযোগ দেওয়া আছে। মুদ্রণের জন্য ফাইল মেনুর প্রিন্ট (Print) কমান্ড সিলেক্ট করলে পর্দায় প্রিন্ট (Print) ডায়লগ বক্স আসবে। প্রিন্ট ডায়লগ বক্সের পেজ রেঞ্জ (Page range) ঘরে–

- অল (All) সংযুক্ত গোলক বা রেডিও বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিলে ফাইলের সকল পৃষ্ঠা মুদ্রিত হবে।
- কারেন্ট পেজ (Current Page) সংযুক্ত গোলক বা রেডিও বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিলে ফাইলের যে পৃষ্ঠায় ইনসার্সন পয়েন্টার থাকবে শুধু সেই পৃষ্ঠা মুদ্রিত হবে।
- পেজেস (Pages) সংযুক্ত গোলক বা রেডিও বোতামে ক্লিক সক্রিয় করে দিলে ডান দিকের টেক্সট বক্সে ইনসার্সন পয়েন্টার দেখা যাবে। কত পৃষ্ঠা থেকে কত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ নিতে হবে তা এই বক্সে টাইপ করে দিতে হবে। যেমন– ৬ পৃষ্ঠা থেকে ৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ নিতে হলে টাইপ করতে হবে ৬-৯। আবার ৬ পৃষ্ঠা থেকে ৯ পৃষ্ঠা এবং এরপর ১২ পৃষ্ঠা থেকে ১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ নেওয়ার জন্য টাইপ করতে হবে ৬-৯, ১২-১৮।
- নাম্বার অব কপিস (Number of Copies)-এর ডান পাশের টেক্সট বক্সে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো একটি সংখ্যা সিলেক্ট করতে হবে অথবা টাইপ করতে হবে। এ বক্সে টাইপ করা সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি পৃষ্ঠার মুদ্রণ-সংখ্যা নির্ধারিত হবে। যেমন– এ বক্সে ২ টাইপ করলে প্রতিটি পৃষ্ঠার দুটি করে কপি মুদ্রিত হবে।
- কোলেট (Collate) সংযুক্ত বাম পাশের চেক বক্স ক্লিক করে ক্রস চিহ্ন যুক্ত করা হলে প্রথমে সবগুলো পৃষ্ঠার এক কপি করে মুদ্রণ শেষ করে আবার প্রথম থেকে সবগুলো পৃষ্ঠার আর এক কপি করে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হবে। চেক বক্স ক্রসচিহ্ন মুক্ত হলে প্রথম থেকেই প্রতিটি পৃষ্ঠার দুই কপি করে মুদ্রণের মাধ্যমে সবগুলো পৃষ্ঠার মুদ্রণ সম্পন্ন হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্প্রেডশিট এ্যানালাইসিস

(মাইক্রোসফট এক্সেল ২০০৭)

স্প্রেডশিট পরিচিতি

স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে হিসেব-নিকেশের কাজ করা হয়। এক্সেল একটি জনপ্রিয় স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম। স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে খুব সহজে এবং নির্ভুলভাবে সূক্ষ্ম ও জটিল হিসেব-নিকেশের কাজ করা যায়।

ধরা যাক, অনেকগুলো খাতে আয়-ব্যয়, মুনাফা ইত্যাদির বড় একটি হিসেবের কাজ করতে হবে। এজন্য হয়তো অনেকগুলো সংখ্যার যোগফল থেকে অন্য কয়েকটি সংখ্যার যোগফল বিয়োগ করতে হবে এবং এই বিয়োগ ফলের একটি শতকরা হার বের করে অন্য আরও কিছু সংখ্যার যোগফলের সঙ্গে যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। এ রকম একটি হিসেবের কাজ খাতা-কলমে করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এ ছাড়া ভুলত্রুটির সম্ভাবনা তো থাকেই। আবার একটি সংখ্যার পরিবর্তন করতে হলে ঐ সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল হিসেবই পরিবর্তন করতে হবে।

কিন্তু এক্সেলের সাহায্যে নির্ভুলভাবে এবং স্বল্পতম সময়ে এ ধরনের হিসেব-নিকেশের কাজ করা যায়। নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে ফর্মুলা বসিয়ে দিলে কম্পিউটার আপনাআপনি প্রদত্ত সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ভুলভাবে সম্পূর্ণ হিসেবের কাজটি সম্পাদন করে দেয়।

মাইক্রোসফট এক্সেল ২০০৭ খোলা

স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে হিসেব-নিকেশের কাজ শুরু করার জন্য স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম খুলে নিতে হবে। স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম খুলতে হয় ডেস্কটপ পরিবেশ থেকে। ডেস্কটপ পরিবেশ থেকে স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম খোলার জন্য–

স্টার্ট (Start) মেনুতে ক্লিক করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে। এ ফ্লাইআউট মেনুর প্রোগ্রামস (Programs) মেনুতে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে আর একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে। এ ফ্লাইআউট মেনু তালিকা থেকে মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office) মেনুতে ক্লিক করলে পাশেই আর একটি ফ্লাইআউট মেনুতে মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office)-এর প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ২০০৭ (Microsoft Office Word 2007)-এ ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ২০০৭ (Microsoft Office Excel 2007) খুলে যাবে।

ডকুমেন্ট উইন্ডো পরিচিতি

মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ২০০৭ (Microsoft Office Excel 2007) প্রোগ্রাম খোলার পর বা স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম চালু হওয়ার পর হিসেব-নিকেশের কাজ শুরু করার জন্য একটি শূন্য ডকুমেন্ট বা শূন্য পর্দা উপস্থাপিত হবে।

এ শূন্য ডকুমেন্ট বা শূন্য পর্দাকে বলা হয় ডকুমেন্ট উইন্ডো। এ ডকুমেন্ট উইন্ডো বা পর্দাটি আসলে একটি হিসেবের খাতার শূন্য পৃষ্ঠার মতো। এ শূন্য পৃষ্ঠাতেই হিসেবের কাজ করতে হবে। কাজ শুরু করার আগে ডকুমেন্ট উইন্ডোর বিভিন্ন অংশের পরিচিতি এবং ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ওয়ার্কশিট পরিচিতি

ডকুমেন্ট উইন্ডোজ (Document Windows) : পর্দায় অসংখ্য আয়তাকার ঘর বিশিষ্ট অংশটিই হচ্ছে ওয়ার্কশিটের ডকুমেন্ট উইন্ডো (Document Windows)।

ঘর (Cell) : ওয়ার্কশিটের প্রতিটি আয়তকার অংশই একটি করে ঘর (Cell) হিসেবে পরিচিত। একটি ঘরে ৩২,৭৬৭টি পর্যন্ত অক্ষর টাইপ করা যেতে পারে।

কলাম (Column) : কলাম হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে চলে আসা ঘরের সমষ্টি। প্রত্যেকটি কলামকে একটি করে ইংরেজি বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন– কলাম A, কলাম B, কলাম C ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। একটি ওয়ার্কশিটে ১৬,৩৮৪টি কলাম থাকে। একটি কলামের পাশাপাশি মাপ ২৫৫ অক্ষর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

সারি (Row) : সারি (Row) হচ্ছে বাম দিক থেকে ডান দিকে পাশাপাশি চলে যাওয়া ঘরের সমষ্টি। প্রত্যেকটি সারিকে ইংরেজি ১ ২ ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন– সারি ১ (Row 1), সারি ২ (Row 2), সারি ৩ (Row 3) ইত্যাদি। একটি ওয়ার্কশিটে ১০,৪৮,৫৭৬ টি সারি থাকে।

ঘরের অবস্থান (Position of Cell) : কলাম এবং সারির সংযোগ স্থানে অবস্থিত ঘরটিকে ঐ ঘরের অবস্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন- C কলামের ১২ নম্বর সারির সংযোগ স্থানে অবস্থিত ঘরটি হচ্ছে C12, E কলামের ৯ নম্বর সারির সংযোগ স্থানে অবস্থিত ঘরটি হচ্ছে E9 ইত্যাদি।

সক্রিয় ঘর (Active Cell) : কোনো ঘরে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে ঐ ঘরটি সক্রিয় হয়। সক্রিয় ঘরের আয়তাকার অংশ মোটা রেখাসম্পন্ন হয়।

সক্রিয় ঘর নির্দেশক (Active Cell Designator) : ওয়ার্কশিটের যখন যে ঘরটি সক্রিয় থাকে তখন সেই ঘরটির পরিচয় বা অবস্থান সক্রিয় ঘর নির্দেশক অংশে প্রতিফলিত হয়। চিত্রে A1 হচ্ছে সক্রিয় ঘর।

ফর্মুলা বার (Formula Bar) : ফর্মুলা বার-এ সক্রিয় ঘরের বিষয়বস্তু প্রদর্শিত হয়।

কলাম নির্দেশক (Column Designator) : ওয়ার্কশিটে A B C D E ইত্যাদি ইংরেজি বর্ণের সাহায্যে কলামের পরিচয় বা নাম নির্দেশ করা হয়। এ বর্ণগুলোকে কলাম নির্দেশক (Column Designator) বলা হয়।

সারি নির্দেশক (Row Designator) : প্রতিটি সারির বাম পাশে ইংরেজি ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা সারির পরিচয় বা সংখ্যা নির্দেশ করা হয়। এ ক্রমিক সংখ্যাগুলোকেই সারি নির্দেশক (Row Designator) বলা হয়।

কাজ শুরুর পালা

ধরা যাক, মুদ্রণ ঘর নামের একটি ছাপাখানার ত্রৈমাসিক আয়-ব্যয় ও মুনাফার একটি হিসাব বা ওয়ার্কশিট তৈরি করতে হবে। ওয়ার্কশিটটি তৈরির আগের ঘর, সারি, কলাম, অংশবিশেষ এবং গোটা ওয়ার্কশিট সিলেক্ট করার নিয়ম সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, কোনো একটি ঘরে সংখ্যা বা লেখা বসানোর জন্য ঐ ঘরটি সিলেক্ট করে সক্রিয় করে নিতে হয়। সিলেক্ট করার অর্থ হচ্ছে ঐ ঘর, সারি, কলাম বা বিশেষ অংশকে কোনো কাজের জন্য তৈরি করা বা কাজের আওতায় আনা।
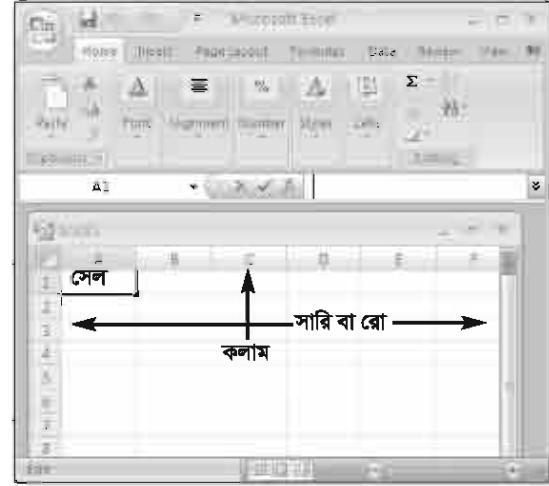
সিলেক্ট করার নিয়ম

একটি ঘর (Single Cell): নির্দিষ্ট ঘরের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করে মাউসে ক্লিক করলে ঘরটি সিলেক্টেড হয়। একটি ঘর সিলেক্ট করার পর কী-বোর্ডের শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে তীরচিহ্ন বোতামগুলো ব্যবহার করে উপরে-নিচে, ডানে বাঁয়ে পর্যায়ক্রমে একটি করে ঘর সিলেক্ট করা যায়।

একাধিক ঘর বা নির্দিষ্ট কিছু ঘর (Cell Range): ধরা যাক, ওয়ার্কশিটের A5 ঘর থেকে B13 ঘর পর্যন্ত সিলেক্ট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে A5 ঘরের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করে মাউসে ক্লিক করে আঙুলের চাপ রাখতে হবে। আঙুল চেপে রাখা অবস্থাতেই মাউস পয়েন্টারকে ডান দিকে B5 ঘর পর্যন্ত টেনে নিতে হবে এবং B5 পর্যন্ত পৌঁছার পর মাউস পয়েন্টারটিকে নিচের দিকে B13 ঘর পর্যন্ত টেনে এনে মাউসের উপর থেকে আঙুলের চাপ ছেড়ে দিতে হবে। এবার দেখা যাবে A5 থেকে B13 পর্যন্ত অংশের ঘরগুলো সিলেক্টেড বা হাইলাইটেড (Selected/Highlighted) অবস্থায় আছে। সিলেক্টেড বা হাইলাইটেড অংশ কালো আচ্ছাদন যুক্ত (সাদা-কালো পর্দায়) দেখা যায়। সিলেক্টেড অংশের মধ্যে লেখা থাকলে তা সাদা দেখা যায়। রঙিন পর্দায় সিলেক্টেড বা হাইলাইটেড অংশ হালকা রঙিন পর্দায় আচ্ছাদনযুক্ত হয় এবং কোনো ঘরে লেখা থাকলে তা ভিন্ন রঙে দেখা যায়।
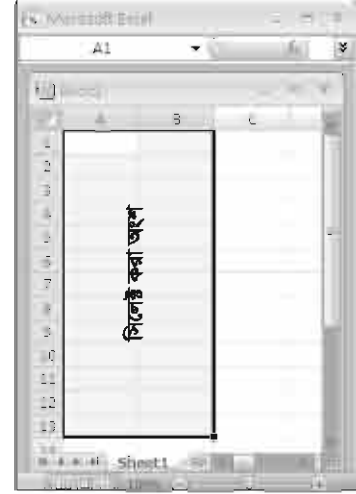
কী-বোর্ডের শিফট (Shift) এবং তীরচিহ্ন বোতাম (Arrow Key)-এর সাহায্যেও উপরে বর্ণিত সিলেকশনের কাজ করা যায়। এ ক্ষেত্রে A5 ঘর সিলেক্ট করার পর শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে ডানমুখী তীরচিহ্ন বোতামে দুবার চাপ দিলে ডান পাশের ঘর, অর্থাৎ B5 সিলেক্টেড হবে। এবার নিম্নমুখী তীরচিহ্ন বোতামে চাপ দিতে থাকলে সিলেকশন নিচের দিকে বাড়তে থাকবে এবং B13 ঘর পর্যন্ত পৌঁছার পর শিফট (Shift) বোতামের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, A5 ঘর সিলেক্ট বা সক্রিয় করার পর শিফট বোতামে চাপ রেখে সরাসরি B13 ঘরে ক্লিক করলে A5 ঘর থেকে B13 ঘর পর্যন্ত সবগুলো ঘর সিলেক্টেড হয়ে যাবে। সিলেকশন তুলে দেওয়ার প্রয়োজন হলে ওয়ার্কশিটের যে কোনো জায়গায় মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে সিলেকশন চলে যাবে।

একটি সারি (Single Row) ও একাধিক সারি (Range of Row): একটিমাত্র সারি সিলেক্ট করার জন্য সারির বাম পাশে সারি নির্দেশক (Row Designator) সংখ্যার উপর ক্লিক করতে হবে। নির্দিষ্ট সারির উপর/নিচে আরও সারি সিলেক্ট করতে হলে সারি নির্দেশক সংখ্যায় ক্লিক করে নির্দিষ্ট সারি সিলেক্ট করার পর মাউসে চাপ রেখে উপরে/নিচে ড্র্যাগ করে একই সঙ্গে আরও সারি সিলেক্ট করতে হবে।

এ ছাড়া যে কোনো সারির একটি ঘর সিলেক্ট করে কী-বোর্ডের শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে স্পেস বার-এ চাপ দিলে ঐ ঘরের সম্পূর্ণ সারিটি সিলেক্টেড হয়ে যাবে। কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম চেপে রেখে স্পেস বার-এ চাপ দিলে ঐ ঘরের সম্পূর্ণ কলাম সিলেক্টেড হয়ে যাবে।

একটি কলাম (Single Column) ও একাধিক কলাম (Range of Columns): একটি কলাম সিলেক্ট করার জন্য নির্দিষ্ট কলাম নির্দেশক (Column Designator) বর্ণের উপর ক্লিক করতে হয়। এরপর প্রয়োজন হলে মাউসে চাপ রেখে ডানে/বাঁয়ে ড্র্যাগ করে ডানের/বাঁয়ের একাধিক কলাম সিলেক্ট করা যায়।

এ ছাড়া উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলামের যে কোনো একটি ঘর সিলেক্ট করে কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম চেপে রেখে স্পেস বার-এ চাপ দিলে ঐ ঘরের সম্পূর্ণ কলামটি সিলেক্টেড হয়ে যাবে।

সম্পূর্ণ ওয়ার্কশিট (Entire Worksheet): কলাম নির্দেশক অ বর্ণের বাম পাশে এবং সারি নির্দেশ সংখ্যা ১-এর উপরে অবস্থিত ঘরে ক্লিক করলে সম্পূর্ণ ওয়ার্কশিট সিলেক্টেড হয়ে যাবে। এ ছাড়া কী-বোর্ডের কন্ট্রোল (Ctrl) ও শিফট (Shift) বোতাম চেপে স্পেস বার-এ চাপ দিলেও সম্পূর্ণ ওয়ার্কশিট সিলেক্টেড হয়ে যাবে।

বিচ্ছিন্ন অংশ (Discontinuous Range): একটি অংশ সিলেক্ট করার পর Ctrl বোতাম চেপে রেখে বিচ্ছিন্নভাবে অন্য একটি অংশ সিলেক্ট করা যায়। এভাবে একাধিক অংশবিশেষ বিচ্ছিন্নভাবে সিলেক্ট করা যায়।

বাংলা ও ইংরেজি

মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৭-এ বাংলা টাইপ করার নিয়মেই স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে বাংলায় টাইপের কাজ করার জন্য কী-বোর্ডকে বাংলা কী-বোর্ডে রূপান্তরিত করে নিতে হবে। এরপর বাংলা অক্ষর বা ফন্ট বাছাই করার জন্য–

১. হোম (Home) ট্যাবের ফন্ট (Font) অংশে ফন্ট (Font) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে ফরমেট সেলস (Format Cells) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।
২. ডায়লগ বক্সের ফন্ট (Font) ট্যাবে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্সটি ফন্ট (Font) ডায়লগ বক্সে রূপান্তরিত হবে।
৩. ডায়লগ বক্সের ফন্ট (Font) অংশের স্ক্রোল তীরে ক্লিক করে করে বাংলা ফন্ট নির্বাচন করতে হবে।
৪. ফন্ট স্টাইল (Font style) অংশ থেকে অক্ষরের ধরন নির্বাচন করতে হবে।
৫. সাইজ (Size) অংশে অক্ষরের আকার নির্বাচন করে ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

টাইপ করার নিয়ম

কোনো ঘর সিলেক্ট করে টাইপ করার পর কী-বোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দিলে টাইপ করা বিষয় ঐ ঘরে সন্নিবেশিত হয়ে যাবে। টাইপ করার সময় ফর্মুলা বার-এ লেখাগুলো উঠতে থাকবে। বাংলার ক্ষেত্রে অর্থহীন কিছু ইংরেজি বর্ণ দেখা যাবে। এ পর্যায়ে ফর্মুলা বার-এর বাম পাশে এবং সক্রিয় ঘর নির্দেশকের ডান পাশে, অর্থাৎ এ দুটির মাঝখানে ক্রসচিহ্ন এবং টিকচিহ্ন দেখা যাবে। টিকচিহ্নে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলেও কী-বোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দেওয়ার কাজ হবে। পক্ষান্তরে, ক্রসচিহ্নে ক্লিক করলে টাইপ করা বিষয়বস্তু বাতিল (Cancel) হয়ে যাবে।
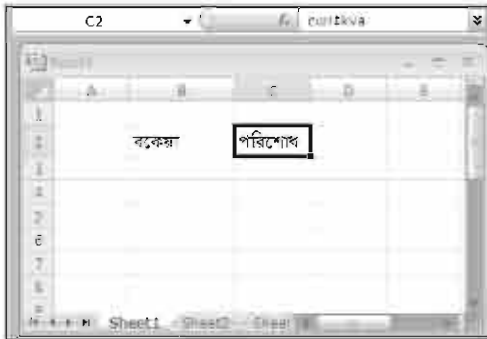
ওয়ার্কশিটে ফর্মুলার (Formula)-এর ব্যবহার

বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন সংখ্যার সঙ্গে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, শতকরা হিসাব এবং ক্ষুদ্রতর, বৃহত্তর ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিতে ফলাফল লাভের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকেই সাধারণভাবে ফর্মুলা বলা হয়। এক্সেলের যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির চিহ্ন গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ–

যোগ +
বিয়োগ – (হাইফেন)
গুণ * (তারকা চিহ্ন)
ভাগ / (অবলিক)
ঘাত ^ (Exponentiation)
শতকরা %

যোগ, বিয়োগ এবং শতকরা চিহ্ন পরিচিত। কিন্তু, গুণ ও ভাগ চিহ্ন পরিচিত চিহ্নের মতো নয়। কম্পিউটারের গুণ চিহ্ন হচ্ছে তারকা চিহ্ন (*) এবং ভাগ চিহ্ন হচ্ছে অবলিক চিহ্ন (/)।

ফর্মুলায় একইসঙ্গে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। ধরা যাক, একটি ঘরের সঙ্গে অন্য ঘরের সংখ্যা যোগ করে তৃতীয় একটি ঘরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। ঘর তিনটির সংখ্যাগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ৩, ৫ এবং ২। এ ক্ষেত্রে ফর্মুলা টাইপ করার উপর ফলাফল নির্ভর করবে। যেমন– ৩+৫/২-এর ফল হবে ৫.৫ এবং (৩+৫)/২-এর ফল হবে ৪। কম্পিউটার ভাগ/গুণের কাজ আগে করে এবং পরে যোগ/বিয়োগের কাজ করে। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও শতকরা হিসেবের কয়েকটি পদ্ধতির নমুনা ও ফল নিচে দেওয়া হল–

৩+৫/২=৫.৫

(৩+৫)/২= ৪

২+৪-৬=০

২+৩*৩=১১

২+৩*৩/২ =৬.৫

(২+৩*৩)/২=৫.৫

(২+৩)*৩/২ = ৭.৫

(২+৩)/২*২ = ৫

১৫০*৩০% = ৪৫

ফর্মুলায় ব্যবহৃত তুলনামূলক মান ভিত্তিক চিহ্নগুলো হচ্ছে–

= সমান

< ক্ষুদ্রতর

<= ক্ষুদ্রতর বা সমান

> বৃহত্তর

>= বৃহত্তর বা সমান

<> সমান নয়

এছাড়া বিভিন্ন ঘরের উল্লেখ (cell reference) বা বিভিন্ন ঘরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোলন (;), কমা (,) এবং স্পেস ব্যবহার করা হয়। যেমন– A1 ঘর থেকে A10 ঘর পর্যন্ত যোগ করার জন্য টাইপ করা যায় = SUM (A1:A10)। বিচ্ছিন্ন ঘরের যোগ করার জন্য টাইপ করা যায় = SUM (A1: A3, A6: A10)।

একটি ছাপাখানার হিসেবের ওয়ার্কশিট তৈরি

প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী 'মুদ্রণ ঘর' ওয়ার্কশিটের প্রথম পর্যায়ের পূরণের কাজ করার জন্য–

১. মাউস পয়েন্টারের সাহায্যে B1 ঘর সিলেক্ট করতে হবে।

২. টাইপ করা বিষয়বস্তুর পরিমাণ বেশি হলে পাশের C কলাম যদি শূন্য না থাকে, তাহলে B কলামের জায়গার অতিরিক্ত বিষয়বস্তু একবারে দেখা যাবে না। এমতাবস্থায়, সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সংকুলানের জন্য কলামের পাশাপাশি মাপ বাড়াতে হবে। কলামের পাশাপাশি মাপ বাড়ানোর জন্য–

ক. মাউস পয়েন্টার B কলাম নির্দেশক বর্ণের ডান দিকের রেখার উপর নিলে পাশাপাশি দ্বিমুখী তীরে পরিণত হবে।

খ. মাউসে চাপ রেখে দ্বিমুখী তীরটি ডান দিকে সরিয়ে নিলে কলামের পাশাপাশি মাপ বেড়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ লেখা কলামের মধ্যেই সংকুলান হয়ে যাবে।

অথবা

লেখা অনুযায়ী কলামের পাশাপাশি মাপ বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে নির্দিষ্ট কলাম নির্দেশক বর্ণের ডান দিকের রেখার উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ডবল-ক্লিক করলে কলামের পাশাপাশি মাপ লেখার পরিমাণ অনুযায়ী বেড়ে যাবে।

৩. উপরে বর্ণিত নিয়মে B1 ঘরে 'মুদ্রণ ঘর' টাইপ করতে হবে। এরপর B2 ঘর সিলেক্ট করে 'ত্রৈমাসিক হিসাব' টাইপ করতে হবে।

	A	B	C	D
1		মুদ্রণ ঘর		
2		ত্রৈমাসিক হিসাব		
3				
4				
5		অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
6	আয়	১০০০০	৭০০০	১৪০০০
7	অফিস খরচ	২০০০	২৫০০	৩০০০
8		----------------	---------	---------
9	লাভ	৮০০০	৪৫০০	১১০০০
10	ঘর ভাড়া	২০০০	২০০০	২০০০
11	বিদ্যুৎ খরচ			
12		----------------	---------	---------
13	প্রকৃত লাভ	৬০০০	২৫০০	৯০০০

৪. ক. B5 ঘরটি ক্লিক করে সক্রিয় করার পর 'অক্টোবর' টাইপ করে কী-বোর্ডের ট্যাব (Tab) বোতামে চাপ দিলেৎ B5 ঘরে অক্টোবর লেখা সন্নিবেশিতহ হবে এবং C5 ঘরটি সক্রিয় হবে। C5 ঘরে 'নভেম্বর' টাইপ করে কী-বোর্ডের ট্যাব (Tab) বোতামে চাপ দিতে হবে। এতে D5 ঘরটি সক্রিয় হবে। D5 ঘরে 'ডিসেম্বর' টাইপ করে ফর্মুলা বার-এর এন্টার বা টিক চিহ্নে ক্লিক করতে হবে অথবা কী-বোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কোনো একটি সক্রিয় ঘরে কিছু টাইপ করার পর কী-বোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে বা নিম্নমুখী তীর বোতামে (Down Arrow Key) চাপ দিলে ঐ ঘরে টাইপ করা লেখা সন্নিবেশিত হয়ে যায় এবং নিচের ঘরটি সক্রিয় ঘরে পরিণত হয়। ট্যাব (Tab) বোতামে চাপ দিলে ডান দিকের ঘর, ঊর্ধ্বমুখী তীর বোতামে (Up Arrow Key) চাপ দিলে উপরের ঘর এবং বামমুখী তীর বোতামে চাপ দিলে বাম দিকের ঘর সক্রিয় ঘরে পরিণত হয়।

৫. A6 ঘরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে A6 ঘর সক্রিয় করার পর–
'আয়' টাইপ করে এন্টার বোতাম চাপ দিতে হবে।
'অফিস খরচ' টাইপ করে দু'বার এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে। এতে A9 ঘর সক্রিয় হবে।
'লাভ' টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে।
'ঘর ভাড়া' টাইপ করার পর এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে।
'বিদ্যুৎ খরচ' টাইপ করে দু'বার এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে। এতে A13 ঘর সক্রিয় হবে।
'প্রকৃত লাভ' টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে।

৬. একই নিয়মে হিসাবের ঘরগুলোতে নির্দিষ্ট সংখ্যা বা অঙ্ক বসাতে হবে।

৭. এবার ফর্মুলার সাহায্যে 'লাভ' ও 'প্রকৃত লাভ' সারি দুটি পূরণ করতে হবে।
ফর্মুলা টাইপের কাজ শুরু করতে হয় সমান-সমান চিহ্ন (=) দিয়ে।
B9 ঘরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে ঘরটি সক্রিয় করার পর ফর্মুলা বসাতে হবে বা টাইপ করতে হবে এভাবে–
= B6-B7
ফর্মুলা টাইপ করার পর এন্টার বোতামে চাপ দিলে ফর্মুলা কার্যকর হবে।

৮. প্রকৃত লাভ-এর সারিটি পূরণ করতে হবে একটু অন্য রকমভাবে। এখানে ১০ ও ১১ নম্বর সারির যোগফলকে ৯ নম্বর সারির লাভের অঙ্ক থেকে বিয়োগ করতে হবে। অতএব, ফর্মুলাটি টাইপ করতে হবে এভাবে–
= B9-(B10+B11)
শেষের বন্ধনী টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিলে B13 ঘরে প্রকৃত লাভের অঙ্ক ১৯ বসে যাবে।
এবার C13 ও D13 অর্থাৎ নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের প্রকৃত লাভের অঙ্ক বের করার জন্য–

১. B13 সহ C13 ও D13 সিলেক্ট করতে হবে।

২. হোম ট্যাবের রিবনের এডিটিং (Editing) অংশে ফিল (Fill) আইকনে ক্লিক করলে অপশন তালিকা প্রদর্শিত হবে। এ তালিকা থেকে রাইট (Right) সিলেক্ট করতে হবে।

অথবা

কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে R বোতামে চাপ দিলে C13 ও D13 ঘর দুটিতে প্রকৃত লাভের অঙ্ক বসে যাবে।

– একই নিয়মে C9 ও D9 ঘরে লাভের অঙ্ক পাওয়ার জন্য ফিল রাইট পদ্ধতিতে ফর্মুলা বসাতে হবে।

সর্বশেষ কাজ হচ্ছে ৮ ও ১২ নম্বর সারিতে বিভাজন রেখা বসানো। এ জন্য–

৯. B8 ঘর সিলেক্ট করে হাইফেন (-) টাইপ করতে হবে।

ক. ঘরটি সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় হোম ট্যাবভুক্ত রিবনের ফন্ট, এ্যালাইনমেন্ট, নাম্বার ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে ফরমেট সেলস (Format Cells) ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

অথবা

সেলস অংশের ফরমেট মেনুর ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন অপশনের তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকার একেবারে নিচে ফরমেট সেলস কমান্ড সিলেক্ট করলে ফরমেট সেলস ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

খ. ডায়লগ বক্সের এ্যালাইনমেন্ট (Alignment) ট্যাব সিলেক্ট করলে ডায়লগ বক্সটি এ্যালাইনমেন্ট (Alignment) ডায়লগ বক্সে রূপান্তরিত হবে।

– এখান থেকে হরাইজন্টাল (Horizontal) পুল-ডাউন মেনুর তীরে ক্লিক করলে যে তালিকা পাওয়া যাবে সেখান থেকে ফিল (Fill) সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স চলে যাবে এবং B8 ঘরটি পূর্ণ বিভাজন রেখাযুক্ত হয়ে যাবে।

গ. B8 ঘরটি সিলেক্ট করে মাউসে চাপ রেখে ডান দিকে ড্র্যাগ করে C8 ও D8 ঘর দুটি সিলেক্ট করতে হবে।

ঘ. রিবনের এডিটিং (Editing) অংশে ফিল (Fill) আইকনে ক্লিক করলে অপশন তালিকা প্রদর্শিত হবে। এ তালিকা থেকে রাইট (Right) সিলেক্ট করতে হবে।

অথবা

কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে R বোতামে চাপ দিলে C8 ও D8 ঘর দুটি বিভাজন রেখাযুক্ত হয়ে যাবে।

১০. এবার ১২ নম্বর সারির বিভাজন রেখাও উপরে বর্ণিত ৯ নম্বর ধাপের নিয়মে পূরণ করতে হবে।

আর মাত্র একটি বিষয় বাকি।

ওয়ার্কশিটের পরিচিতি এবং বর্ণনামূলক লেখাগুলো সুন্দর করে সাজাতে হবে। এ জন্য–

ক. B1 ঘরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে 'মুদ্রণ ঘর' ছাপাখানা সিলেক্ট করতে হবে।

খ. ফন্ট ডায়লগ বক্সের সাহায্যে অক্ষরের আকার-আকৃতি নির্ধারণ করতে হবে।
ওয়ার্কশিটের শিরোনাম হিসেবে মুদ্রণ ঘর ছাপাখানার নাম বড় অক্ষরে সুন্দর দেখাবে।

গ. মনে হতে পারে শিরোনামটি একটু ডানে সরানো গেলে ভালো দেখাত। এজন্য ফর্মুলা বার-এর অর্থহীন ইংরেজি অক্ষরগুলোর একবারে বামে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে। ক্লিক করার পর যদি দেখা যায় ইনসার্সন পয়েন্টারের বাম পাশে অক্ষর আছে, তাহলে কী-বোর্ডের বামমুখী তীরচিহ্ন বোতামে (Left Arrow Key) চাপ দিয়ে ইনসার্সন পয়েন্টারকে অক্ষরগুলোর একেবারে বামে নিয়ে আসতে হবে।

- এবার স্পেসবার-এ চাপ দিতে থাকলে লেখাগুলো ডান দিকে সরে যেতে থাকবে।
- এন্টার বোতামে চাপ দিলে দেখা যাবে 'মুদ্রণ ঘর' শিরোনামটি কিছুটা ডান দিকে সরে গেছে। যদি আরও ডানে সরাতে হয়, তাহলে একই রকমভাবে ফর্মুলা বার-এর লেখার বাম পাশে ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিতে হবে।
- এরপর উপরে বর্ণিত নিয়েমই 'ত্রৈমাসিক হিসাব' লেখা লাইনটি বিন্যস্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক হিসাবের জন্য ফন্ট সাইজ (Size) টেক্সট বক্সে ১৮ পয়েন্ট নির্বাচন করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে, ফন্ট ডায়লগ বক্সের সাইজ (Size)-এর তালিকায় যদি প্রয়োজনীয় পয়েন্টের সংখ্যা না পাওয়া যায়, তাহলে সাইজ (Size) টেক্সট বক্সে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি টাইপ করে দিতে হবে। এতক্ষণে লক্ষ করলে দেখা যাবে, হিসাব বা ওয়ার্কশিটটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

তৈরি ওয়ার্কশিটটি এবার একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। যেমন– নভেম্বর মাসের আয় ৭০০০-এর পরিবর্তে ৬০০০ বা ৮০০০ টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিলে দেখা যাবে ঐ মাসের লাভ এবং লাভের ঘরের সংখ্যাগুলো আনুপাতিক হারে আপনাআপনিই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অন্যান্য ঘরের সংখ্যাও পরিবর্তন করে একইরকম ফল পাওয়া যাবে। সংখ্যাগুলো ছোট হওয়ায় মুখে মুখে হিসাব মিলিয়ে দেখা যাবে পরিবর্তনগুলো সঠিক হয়েছে। অর্থাৎ, এতে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না যে সংখ্যা যত বড়ই হোক এবং ওয়ার্কশিট যত দীর্ঘই হোক হিসাবের কাজটি নির্ভুলভাবেই সম্পন্ন হবে।

ওয়ার্কশিট সংরক্ষণ

অন্যান্য এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মতোই, বিশেষ করে ইতোপূর্বে শেখা ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের মতো, একই নিয়মে অফিস মেনু থেকে সেভ (Save) কমান্ড দিয়ে সেভ এ্যাজ (Save As) ডায়লগ বক্সে ফোল্ডার নির্বাচন ও ফাইলের নাম টাইপ করে ওয়ার্কশিট সংরক্ষণ করতে হবে।

চার্ট গ্রাফ (Chart/Graph) তৈরি করা

মুদ্রণ ঘর ওয়ার্কশিটের, ধরা যাক, ৩ মাসের আয় এবং প্রকৃত লাভের ভিত্তিতে চার্ট বা গ্রাফ তৈরি করা যেতে পারে। এ জন্য–

১. মাস এবং আয়ের সারি দুটি সিলেক্ট করতে হবে।

২. অফিস বোতামের নিচে ক্লিপবোর্ড (Clipboard) গ্রুপে অবস্থিত কপি (Copy) আইকনে ক্লিক করতে হবে।

অথবা

কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে C বোতামে চাপ দিতে হবে। এর যে কোনো প্রক্রিয়ায় সিলেক্ট করা অংশ কপি হবে।

৩. ওয়ার্কশিটের নিচের অংশে একটি সারির প্রথম ঘরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে।

৪. অফিস বোতামের নিচে ক্লিপবোর্ড (Clipboard) গ্রুপে অবস্থিত পেস্ট (Paste) আইকনে ক্লিক করতে হবে।

অথবা

কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে V বোতামে চাপ দিতে হবে।

এর যে কোনো প্রক্রিয়ায় পেস্ট কমান্ড কার্যকর করার পর কপি করা সারি দুটির বিষয়বস্তু পেস্ট করা দুটি সারিতে হুবহু বসে যাবে।

৫. পেস্ট করা বিষয়বস্তুর ঠিক নিচের সারিতে প্রকৃত লাভের সারি কপি ও পেস্ট করে বসাতে হবে। ওয়ার্কশিট

থেকে কপি করতে গেলে সিলেক্ট করার পর যদি ঐ ঘরগুলোতে শুধু ফর্মুলা দেখা যায়, তাহলে আপাতত কপি না করে, প্রকৃত লাভের সারিটি টাইপ করে বসিয়ে নিলেই হবে।

	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
আয়	১০০০০	৭০০০	১৪০০০
প্রকৃত লাভ	৬০০০	২৫০০	৯০০০

৬. পেস্ট করা সবগুলো লাইন– মাস, আয় ও প্রকৃত লাভ– এ তিনটি সারি এক সঙ্গে সিলেক্ট করতে হবে।

৭. ইনসার্ট (Insert) ট্যাবের চার্ট গ্রুপের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে ইনসার্ট চার্ট (Insert Chart) ডায়লগ বক্স আসবে।

৮. ডায়লগ বক্সের বাম দিকের কলামে চার্ট/গ্রাফের নামের তালিকা রয়েছে। এ তালিকা থেকে যে ধরনের চার্ট/গ্রাফের নাম সিলেক্ট করা হবে, ডান দিকের অংশে সেই গ্রুপের চার্ট/গ্রাফের অনেকগুলো নমুনা প্রদর্শিত হবে। এর ভেতর থেকে প্রথম নমুনা সিলেক্ট করে ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৮. সিলেক্ট করা নমুনা অনুযায়ী চার্ট/গ্রাফ তৈরি হয়ে যাবে। চার্ট/গ্রাফটি তৈরি হবে ওয়ার্কশিটে সিলেক্ট করা ডাটা/তথ্যের ভিত্তিতে।

গ্রাফ সম্পাদনা ও আনুষঙ্গিক কাজ

চার্ট/গ্রাফ (Chart/Graph) তৈরির প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একটি পূর্ণ চার্ট বা গ্রাফ তৈরির পর বিভিন্ন প্রকার সম্পাদনার কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন– গ্রাফে ব্যবহৃত লেখার অক্ষরগুলো ছোট-বড় করা, গ্রাফের সঙ্গে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা, গ্রাফটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করা, ছোট-বড় করা ইত্যাদি।
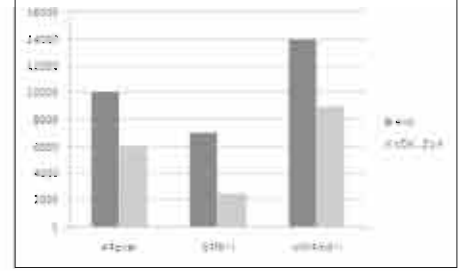
প্রথমে অর্থহীন ইংরেজি অক্ষরগুলো বাংলায় রূপান্তরিত করতে হবে।

সাধারণত প্রাথমিকভাবে একটি চার্ট/গ্রাফের ডান দিকে থাকে লিজেন্ড, নিচে থাকে হরাইজন্টাল এক্সিস এবং বাম দিকে থাকে ভার্টিকেল এক্সিস। চার্টের উপরে শিরোনাম না থাকলে শিরোনাম যুক্ত করতে হবে।

লিজেন্ড এবং দুটি এক্সিসের অর্থহীন ইংরেজি অক্ষরগুলো বাংলায় রূপান্তরিত করার জন্য–
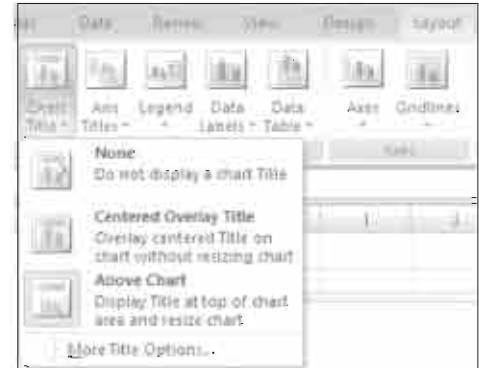
১. লিজেন্ডের উপর ক্লিক করলে লিজেন্ড সিলেক্টেড হবে।

২. হোম ট্যাবের ফন্ট ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে বাংলা ফন্টের নাম সিলেক্ট করলে লিজেন্ডের লেখা বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

– একই নিয়মে হরাইজন্টাল এক্সিস এবং ভার্টিক্যাল এক্সিসের লেখা বাংলায় রূপান্তরিত করতে হবে।

চার্টে শিরোনাম যুক্ত করা এবং হরাইজন্টাল ও ভার্টিক্যাল এক্সিসের পরিচিতি যুক্ত করার জন্য–

১. চার্ট সিলেট করতে হবে। চার্টের ভেতরে যে কোনো ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করলে চার্টটি সিলেক্টেড হবে।

২. লেআউট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে।

৩. লেআউট ট্যাবের রিবনে লেবেলস (Lebels) গ্রুপে বা অংশে চার্ট টাইটেল ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে চার্টের

টাইটেল বা শিরোনাম ৩টি অপশন তালিকা আসবে। এ তালিকা থেকে এবাভ চার্ট (Above Chart) সিলেক্ট করতে হবে।

– চার্টের উপরের অংশে শিরোনাম টাইপ করার জন্য একটি বক্সে কিছু লেখা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে। কী-বোর্ডের ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিয়ে লেখাটি মুছে ফেলে শিরোনাম টাইপ করতে হবে। টাইপে সব অক্ষর ঠিকমতো না এলে মূল ওয়ার্কশিটে শিরোনাম টাইপ করে কাট/কপি করে চার্টের শিরোনামের বক্সে পেস্ট করতে হবে।
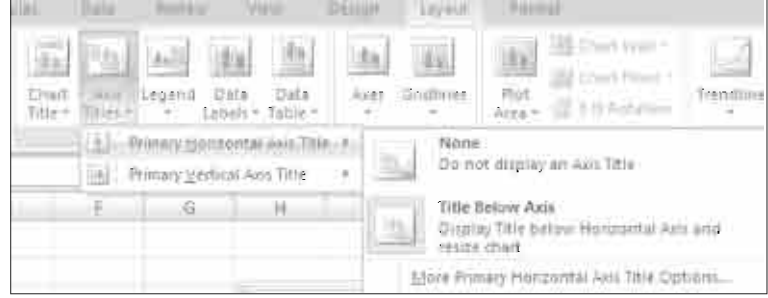
৪. হরাইজন্টাল এক্সিসে 'মাস' এবং ভার্টিক্যাল এক্সিসে 'আয় ও প্রকৃত লাভের পরিমাণ' যুক্ত করার জন্য–

ক. রিবনে এক্সিস টাইটেল (Axis Title) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে প্রাইমারি হরাইজন্টাল এক্সিস টাইটেল (Primary Horizontal Axis Title) এবং প্রাইমারি ভার্টিক্যাল এক্সিস টাইটেল (Primary Vertical Axis Title) নামে দুটি অপশন আসবে।

খ. এ অপশন থেকে প্রাইমারি হরাইজন্টাল এক্সিস টাইটেল (Primary Horizontal Axis Title) অপশনের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু আসবে। এ মেনু থেকে টাইটেল বিলো এক্সিস (Title Below Axis) সিলেক্ট করতে হবে।

গ. চার্টের নিচের অংশে হরাইজন্টাল এক্সিসের পরিচিতি টাইপ করার জন্য একটি টেক্সট বক্সে কিছু লেখা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে।

– এ লেখা মুছে উপরে শিরোনাম যুক্ত করার প্রক্রিয়ায় বাংলায় শিরোনাম টাইপ করতে হবে।

৫. ভার্টিক্যাল এক্সিসে 'আয় ও প্রকৃত লাভের পরিমাণ' যুক্ত করার জন্য–
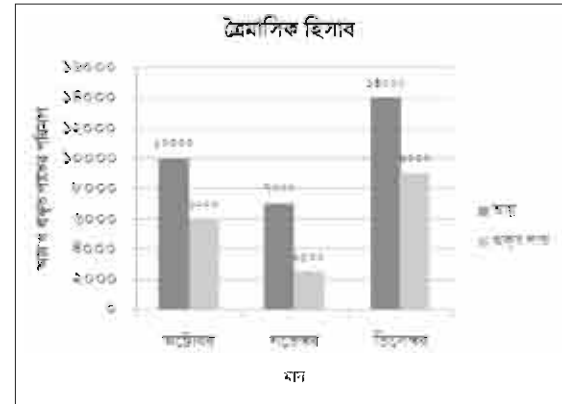
ক. এক্সিস টাইটেল (Axis Title) ড্রপ-ডাউনের প্রাইমারি ভার্টিক্যাল এক্সিস টাইটেল (Primary Vertical Axis Title)-এর ফ্লাইআউট মেনু থেকে রোটেট টাইটেল (Rotate Title) সিলেক্ট করতে হবে।

– এরপর উপরে বর্ণিত নিয়মে টাইপের কাজ করতে হবে।

৬. চার্টের প্রতিটি স্তম্ভের উপর পরিমাণসূচক সংখ্যা যুক্ত করার জন্য–

ক. ডাটা লেবেলস ড্রপ-ডাউন অপশন থেকে আউটসাইড এন্ড সিলেক্ট করলে প্রতিটি স্তম্ভের উপর পরিমাণসূচক সংখ্যা যুক্ত হয়ে যাবে।

খ. ইংরেজি অক্ষরের সংখ্যাকে বাংলায় রূপান্তরিত করার জন্য সংখ্যার উপর ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে।

গ. হোম রিবনের ফন্ট তালিকা থেকে বাংলা ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে।

এ পর্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চার্ট তৈরি হবে। এরপর চার্টে আরও নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যাবে। যেমন– স্তম্ভের রং পরিবর্তন করা, চার্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে রং প্রয়োগ করা, চার্টে গ্রিডলাইন যুক্ত করা ইত্যাদি।

বার, লাইন, পাই এবং অন্যান্য চার্টে পরিবর্তন করা

চার্ট তৈরি করার পর প্রয়োজন হলে অন্যান্য ধরনের চার্টে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করে নেওয়া যাবে। এ জন্য চার্টের উপর ক্লিক করলে চার্টটি সিলেক্টেড থাকবে। এ অবস্থায় রিবনের চার্ট গ্রুপ থেকে অন্য যে কোনো চার্টের ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে যে নমুনা সিলেক্ট করা হবে, চার্টটি সেই নমুনা অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

একবার একটি চার্ট তৈরি করার পর ঐ চার্টটি যে কোনো মুহূর্তে প্রয়োজন হলে, দু'একটি কমান্ড ব্যবহার করেই অন্য রূপে রূপান্তরিত করার জন্য প্রথমে চার্টটি সিলেক্ট করে নিতে হবে। এরপর পূর্ব-বর্ণিত নিয়মে চার্ট টাইপ ডায়লগ বক্সের সাহায্যে বার, লাইন এবং পাই চার্টে রূপান্তরিত করতে হবে।
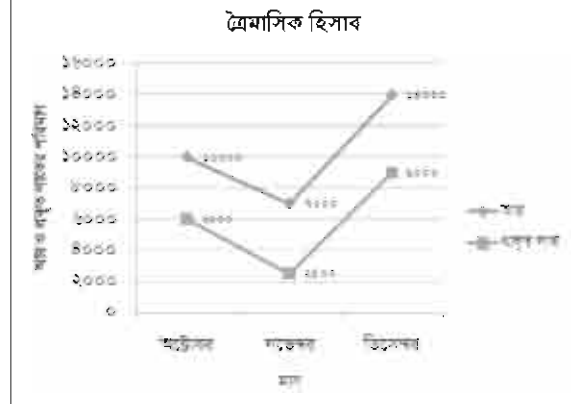
ফর্মুলার সাহায্যে বেতন বিল তৈরি

এক্সেল প্রোগ্রামের সাহায্যে অফিস-আদালত, শিল্প-করখানা এবং বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বেতন খুব সহজে এবং নির্ভুলভাবে তৈরি করা যায়। নির্দিষ্ট ঘরসমূহে একবার ফর্মুলা বসিয়ে দেওয়ার পর শুধু মূল বেতনের অঙ্ক টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য হিসাব মুহূর্তের মধ্যে আপনাআপনিই সম্পন্ন হয়ে যায়। নমুনা বেতন বিলটির দু'টি অংশ আছে। প্রথম অংশ মোট বেতনের এবং দ্বিতীয় অংশ কর্তন (Deduction)-এর। মোট বেতন থেকে মোট কর্তন বাদ দিলে প্রকৃত বেতন পাওয়া যাবে।

ওয়ার্কশিটের উপরের অংশে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বিল এবং কলাম শিরোনাম পূর্ব-বর্ণিত নিয়মে টাইপ করতে হবে। জায়গা সংকুলানের সুবিধার্থে শিরোনামগুলো সংক্ষেপে টাইপ করা হয়েছে। যেমন; মূল বেতন (মূ:বে:), বাড়ি ভাড়া (বা:ভা:), চিকিৎসা (চিকি:), মোট বেতন (মো:বে:), ভবিষ্যৎ তহবিল (ভ:তহ:), যাতায়াত (যাতা:), মোট কর্তন (মো:ক:) এবং প্রকৃত বেতন (প্র:বে:)। বেতন ও কর্তনের খাতগুলোর শিরোনাম টাইপ করার পর A5 থেকে নিচের দিকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাম টাইপ করতে হবে। এরপর বিভিন্ন খাতের অঙ্ক বসানোর পালা। এ ক্ষেত্রে শুধু মূল বেতন এবং যাতায়াতের ঘর দু'টি ছাড়া অন্যান্য ঘরগুলোতে ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে। যাতায়াত বাবদ সবার নিকট থেকে ৪০ টাকা করে কেটে রাখা হয়। অতএব, G5 ঘরে ৪০ টাইপ করতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট ঘরগুলোতে ফর্মুলা টাইপ করতে হবে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল বেতন টাইপ করা হয়েছে। বাকি সবগুলো ঘর ফর্মুলার সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বিল							
2		বেতন				কর্তন			
3									
4	নাম	মূ:বে:	বা:ভা:	চিকি:	মো:বে:	ভ:তহ:	যাতা:	মো:ক:	প্র:বে:
5	কাসেম আলী	৯০০০	৩৬০০	১০০	১২৭০০	১০৫০	৪০	১০৯০	১১৬১০
6	শফি রহমান	৮০০০	৩২০০	১০০	১১৩০০	১২০০	৪০	১২৪০	১০০৬০
7	নিয়ামত শেখ	৭০০০	২৮০০	১০০	৯৯০০	১০৫০	৪০	১০৯০	৮৮১০
8	সিরাজ মিয়া	৬০০০	২৭০০	১৫০	৮৮৫০	৯০০	৪০	৯৪০	৭৯১০
9	রহমান আলী	৫০০০	২২৫০	১৫০	৭৪০০	৭৫০	৪০	৭৯০	৬৬১০
10	শরাফত মিয়া	৪৫০০	২০২৫	১৫০	৬৬৭৫	৬৭৫	৪০	৭১৫	৫৯৬০
11	হাফিজ শেখ	৪০০০	২০০০	২০০	৬২০০	৬০০	৪০	৬৪০	৫৫৬০
12	শিহাব চৌধুরী	৩৫০০	১৭৫০	২০০	৫৪৫০	৫২৫	৪০	৫৬৫	৪৮৮৫
13	রকিব আহমদ	৩০০০	১৫০০	২০০	৪৭০০	৪৫০	৪০	৪৯০	৪২১০
14	ইহসান		FALSE	FALSE	০	০	৪০	৪০	-৪০
15	হাকিম		FALSE	FALSE	০	০	৪০	৪০	-৪০
16	জাবেদ		FALSE	FALSE	০	০	৪০	৪০	-৪০
17	নিজাম উদ্দিন	২৫০০	১২৫০	২০০	৩৯৫০	৩৭৫	৪০	৪১৫	৩৫৩৫

কোন ঘরে কী ফর্মুলা কীভাবে টাইপ করত হবে, তা নিচে দেয়া হল–

Cell	Formulas
C5	= IF(B5>=7000,B5*40%,IF(B5>=4500,B5*45%,IF(B5>=2000,B5*50%)))
D5	= IF(B5>=7000,100,IF(B5>=4500,150,IF(B5>=2000,200)))
E5	= SUM(B5:D5)
F5	= B5*15%
H5	= SUM(F5:G5)
I5	= SUM(E5-H5)

ফর্মুলার ব্যাখ্যা

C5 ঘরে ফর্মুলার অর্থ হচ্ছে– যাদের মূল বেতন ৭০০ টাকা থেকে তদূর্ধ্ব অঙ্কের, তারা বাড়ি ভাড়া বাবদ পাবেন মূল বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ (৪০%), যাদের মূল বেতন ৪৫০০ টাকা থেকে তদূর্ধ্ব অঙ্কের, তারা বাড়ি ভাড়া বাবদ পাবেন মূল বেতনের শতকরা ৪৫ ভাগ (৪৫%) এবং যাদের মূল বেতন ২০০০ টাকা থেকে তদূর্ধ্বে, তারা বাড়ি ভাড়া বাবদ পাবেন মূল বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ (৫০%)।

D5 ঘরে ফর্মুলার অর্থ হচ্ছে– যাদের মূল বেতন ৭০০০ টাকা থেকে তদূর্ধ্বে, তারা চিকিৎসা ভাতা হিসেবে পাবেন ১০০ টাকা, যাদের মূল বেতন ৪৫০০ টাকা থেকে তদূর্ধ্বে, তারা চিকিৎসা ভাতা হিসেবে পাবেন ১৫০ টাকা এবং যাদের মূল বেতন ২০০০ টাকা থেকে তদূর্ধ্বে, তারা চিকিৎসা ভাতা হিসেবে পাবেন ২০০ টাকা।

E5 ঘরে B5 থেকে D5 পর্যন্ত ঘরগুলোর যোগফল নামানোর সহজ ফর্মুলা টাইপ করা হয়েছে। এ ফর্মুলা প্রথম ওয়ার্কশিটেই ব্যবহার করা হয়েছে। F5 ঘরে ভবিষ্যৎ তহবিলের জন্য সবার নিকট থেকে মূল বেতনের শতকরা ১৫ ভাগ (১৫%) হিসেবে কর্তন (Deduction) করার ফর্মুলা টাইপ করা হয়েছে।

H5 ঘরে F5 ও G5 ঘরের যোগফল নামানোর সহজ ফর্মুলা টাইপ করা হয়েছে। কর্তনের আরো খাত থাকতে পারে। যদি থাকে, তা একই নিয়মে হিসাব করতে হবে।

I5 ঘরে E5 (মোট বেতন) থেকে H5 (মোট কর্তন) বিয়োগ করে প্রকৃত বেতনের পরিমাণ নামানোর ফর্মুলা টাইপ করা হয়েছে।

এখন B5 ঘরে মূল বেতন হিসেবে ৯০০০ টাকা টাইপ করলে প্রথম ব্যক্তির বেতনের প্রতিটি খাতের অঙ্ক পাওয়া যাবে।

ফর্মুলায় ব্যবহৃত প্রতিটি IF-এর জন্য ফর্মুলার শেষে একটি করে প্রথম বন্ধনী (ডান দিকের) ব্যবহার করতে হবে।

ওয়ার্কশিটের বাকি অংশে ফর্মুলা কার্যকর করার জন্য B5 থেকে I17 পর্যন্ত সিলেক্ট করে হোম ট্যাবের রিবনের এডিটিং (Editing) অংশে ফিল (Fill) আইকনে ক্লিক করলে অপশন তালিকা প্রদর্শিত হবে। এ তালিকা থেকে ডাউন (Down) কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে অথবা কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে D বোতামে চাপ দিতে হবে। এতে ওয়ার্কশিটের বাকি অংশে ফর্মুলা কার্যকর হবে।

কোনো ব্যক্তির মূল বেতনের কলাম থাকলে শুধু যাতায়াতের ঘরটিতে ৪০ দেখা যাবে। কারণ, এ ঘরটির সঙ্গে মূল বেতনের কোনো সম্পর্ক নেই। একইসঙ্গে মোট বেতনের ঘরে -৪০ দেখা যাবে। কারণ, ঐ ব্যক্তির বেতন তো দেওয়া হয়নি, বরং তাঁর নিকট থেকে ৪০ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য খাতগুলোর হিসাব যেহেতু মূল বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারিত, সেহেতু ঐ ঘরগুলো তাদের হিসেবের উৎস বা ভিত্তি খুঁজে পায়নি।

এরপর যদি আরও ব্যক্তির নাম যুক্ত করতে হয়, তাহলে একই নিয়মে শেষ সারি থেকে নিচের অংশ সিলেক্ট করে কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে E বোতামে চাপ দিয়ে ফর্মুলা কার্যকর করতে হবে।

বর্ণানুক্রমিক ও সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস

একটি ওয়ার্কশিট তৈরি করার পর যে কোনো কলামের ভিত্তিতে ওয়ার্কশিটের সম্পূর্ণ তথ্য বর্ণানুক্রমিক এবং সংখ্যানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত (Sort) করা যায়। বর্ণানুক্রমিক এবং সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস আরোহী (Ascending) পদ্ধতি এবং অবরোহী (Descending) পদ্ধতি উভয়ভাবে করা যায়। আরোহী পদ্ধতি হচ্ছে ছোট ক্রম থেকে বড় ক্রমের দিকে যাওয়া (A ...B ...C ...Z, 1 ...10 ...50 ...100) এবং অবরোহী হচ্ছে বড় ক্রম থেকে ছোট ক্রমের দিকে যাওয়া (Z ...C ...B ...A, 100 ...50 ...10 ...1)।

Students of Class IX

Sl No.	Name	Father's Name	Age	Village
1	Mijan Mandol	Kader Mandol	13	Biasat
2	Abul Baset	Khabir Uddin	15	Biasat
3	Majid Choudhury	Ali ahmed Choudhury	14	Hatipur
4	Hamid Miah	Rahim Miah	16	Biasat
5	Khaled Masum	Masum Khan	13	Hatipur
6	Abul Kalam	Abul Hashem	15	Hatipur

নাম, গ্রাম ইত্যাদি কলামের ডাটা বর্ণানুক্রমিক এবং ক্রমিক নম্বর, বয়স ইত্যাদি কলামের ডাটা সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যাস (Sort) করা যাবে।

প্রথমবার সর্টের সময় একটি ডায়লগ বক্স আসতে পারে। এ ডায়লগ বক্সের এক্সপান্ড (Expand....) অপশনের গোলকে বা রেডিও বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিতে হবে। না হলে একটি ঘর সিলেক্ট করে সর্ট করার পর সম্পূর্ণ সারিসহ সর্ট না হলে আনডু করতে হবে। এরপর আবার সর্ট আইকনে ক্লিক করলে সম্পূর্ণ সারিসহ সর্ট সম্পন্ন হবে।

Sl No.	Name	Father's Name	Age	Village
1	Mijan Mandol	Kader Mandol	13	Biasat
2	Abul Baset	Khabir Uddin	15	Biasat
3	Majid Choudhury	Ali ahmed Choudhury	14	Hatipur
4	Hamid Miah	Rahim Miah	16	Biasat
5	Khaled Masum	Masum Khan	13	Hatipur
6	Abul Kalam	Abul Hashem	15	Hatipur

উপরের নমুনা ওয়ার্কশিটের তথ্য নামের ভিত্তিতে আরোহী পদ্ধতিতে বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্তকরণের জন্য নামের ঘরের যে কোনো একটি নাম সিলেক্ট করতে হবে। এরপর ডাটা ট্যাব রিবনের আরোহী বিন্যস্তকরণ আইকনে ক্লিক করলে গোটা ওয়ার্কশিট নামের ভিত্তিতে আরোহী ক্রমানুসারে বিন্যস্ত হয়ে যাবে।

একই পদ্ধতিতে গ্রাম, পিতার নাম, ক্রমিক নম্বর, বয়স ইত্যাদির ভিত্তিতে ওয়ার্কশিট বিন্যস্ত করা যাবে।

Students of Class IX

Sl No.	Name	Father's Name	Age	Village
2	Abul Baset	Khabir Uddin	15	Biasat
6	Abul Kalam	Abul Hashem	15	Hatipur
4	Hamid Miah	Rahim Miah	16	Biasat
5	Khaled Masum	Masum Khan	13	Hatipur
3	Majid Choudhury	Ali ahmed Choudhury	14	Hatipur
1	Mijan Mandol	Kader Mandol	13	Biasat

টেবিলের ডাটা বয়সের ভিত্তিতে সংখ্যানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করার জন্য এ কলামের যে কোনো ঘরে ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে। এরপর রিবনের আরোহী (Ascending) আইকনে ক্লিক করলে ওয়ার্কশিটের সমগ্র ডাটা বয়সের ভিত্তিতে আরোহী বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে যাবে এবং অবরোহী (Descending) আইকনে ক্লিক করলে টেবিলের সমগ্র ডাটা বয়সের ভিত্তিতে অবরোহী বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে যাবে।

পরীক্ষার ফলাফলে প্রাপ্ত লেটারগ্রেড নির্ণয়

পরীক্ষার ফলাফলে প্রাপ্ত লেটারগ্রেড নির্ণয়ের জন্য–

১. 'প্রাপ্ত গ্রেড' নামে আর একটি কলাম তৈরি করতে হবে।

২. কলামের প্রথম ঘর সিলেক্ট করে ফর্মুলা বার-এ প্রদর্শিত ফর্মুলা টাইপ করে এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে

অথবা

ফর্মুলা বার-এর বাম পাশে টিকচিহ্নে ক্লিক করতে হবে। এতে নয়ন মণি দাসীর লেটারগ্রেড পাওয়া যাবে।

৩. সম্পূর্ণ কলামে ফর্মুলা কার্যকর করার জন্য I7 থেকে I21 পর্যন্ত ঘরগুলো সিলেক্ট করে হোম ট্যাবের রিবনের এডিটিং (Editing) অংশে ফিল (Fill) আইকনে ক্লিক করলে অপশন তালিকা প্রদর্শিত হবে। এ তালিকা থেকে ডাউন (Down) কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে

অথবা

কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে D বোতামে চাপ দিতে হবে।

এতে ওয়ার্কশিটের বাকি অংশে ফর্মুলা কার্যকর হবে এবং প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর লেটারগ্রেড প্রদর্শিত হবে।

I7 =IF(H7>=400,"A+",IF(H7>=350,"A", IF(H7>=300,"-A",IF(H7>=250,"B",IF(H7<=249,"Fail")))))

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5									
6	ক্রমিক	নাম	বাংলা	ইংরেজি	পদার্থবিদ্যা	রসায়ন	অংক	মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গ্রেড
7	১৫	নয়ন মণি দাসী	৮০	৮০	৮০	৮৫	৯০	৪১৫	A+
8	৪	আব্দুর রহমান	৭০	৮০	৯০	৮০	৮৫	৪০৫	A+
9	১৩	আতিকুল্লাহ খান	৫০	৬০	৭৮	৬৮	৯০	৩৪৬	-A
10	৫	ফাতেমা খাতুন	৬০	৫৫	৮০	৮৫	৬০	৩৪০	-A
11	১৪	হাবিব মণ্ডল	৬০	৬৫	৭০	৮০	৬০	৩৩৫	-A
12	১২	মরিয়ম শাহনাজ	৫৫	৬০	৮০	৬০	৭৫	৩৩০	-A
13	৩	মোঃ খাদেমুল ইসলাম	৩৩	৫০	৮০	৭৫	৯০	৩২৮	-A
14	২	মোঃ মমিন উদ্দিন	৫০	৪০	৬৫	৭০	৮০	৩০৫	-A
15	৬	রহিমা শিরিন	৪৫	৫৬	৭০	৬৫	৬৮	৩০৪	-A
16	১১	আবুল হাসেম শেখ	৪০	৫০	৬০	৫৫	৮৩	২৮৮	B
17	১	আব্দুল হাকিম	৪০	৩৫	৬০	৬৫	৭০	২৭০	B
18	৭	কবিরুল ইসলাম	৫০	৫৫	৫০	৫৫	৬০	২৭০	B
19	১০	মোঃ দবির উদ্দিন	৪০	৩৫	৪০	৫০	৬০	২২৫	Fail
20	৯	আসমাতুন্নেছা খানম	৪০	৪৫	৩৭	৪০	৫৫	২১৭	Fail
21	৮	আনিসুর রহমান চৌধুরী	৩৩	৩৫	৪৫	৫০	৪০	২০৩	Fail

ফর্মুলার ব্যাখ্যা

=IF(H7>=400,"A+",IF(H7>=350,"A", IF(H7>=300,"-A",IF(H7>=250,"B",IF(H7<=249,"Fail")))))

উপর্যুক্ত ফর্মুলার অর্থ হচ্ছে– যাদের মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪০০ অথবা ৪০০-এর বেশি তাদের লেটারগ্রেড হবে A+.

যাদের মোট প্রাপ্ত নম্বর ৩৫০ অথবা ৩৫০-এর বেশি তাদের লেটারগ্রেড হবে -A.

যাদের মোট প্রাপ্ত নম্বর ২৫০ অথবা ২৫০-এর বেশি তাদের লেটারগ্রেড হবে B.

যাদের মোট প্রাপ্ত নম্বর ২৪৯ অথবা ২৪৯-এর কম তারা পরীক্ষায় Fail করেছে।

ফর্মুলায় প্রতিটি IF ব্যবহারের জন্য ফর্মুলার শেষে একটি করে প্রথম বন্ধনী (ডান দিকের) ব্যবহার করতে হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ডাটাবেজ
(মাইক্রোসফট এক্সেস ২০০৭)

ডাটাবেজ ও এক্সেস সম্পর্কে ধারণা

ডাটাবেজকে বলা হয় তথ্য ভাণ্ডার। এ তথ্য ভাণ্ডারে বিভিন্ন প্রকার এবং বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। একজন ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো তথ্য এ তথ্য ভাণ্ডার থেকে আহরণ বা সংগ্রহ করতে পারেন। ডাটাবেজকে 'তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Database Management System=DBMS) হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত তথ্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যবহৃত হয় বলে ডাটাবেজকে 'তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Database Management System=DBMS) বলে অভিহিত করা হয়।

কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর তথ্য বিভিন্ন নামে বা নথিতে সংরক্ষিত করা হয়। এতে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। একটি ডাটাবেজ মূলত কলাম এবং সারির সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কলামের একটি করে হেডিং বা শিরোনাম থাকে। এই হেডিং বা শিরোনাম থেকেই বুঝা যায় সেই কলামে কী ধরনের ডাটা বা তথ্য আছে। হেডিং বা শিরোনামগুলো ফিল্ড নামে পরিচিত। আর পাশাপাশি কয়েকটি কলামের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি সারি। প্রতিটি সারিকে বলা হয় রেকর্ড। এ সম্পর্কে তত্ত্বীয় অংশে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

মাইক্রোকম্পিউটারে ডাটাবেজের কাজ করা হয় প্রধানত মাইক্রোসফট এক্সেস সফটওয়্যারের সাহায্যে। মাইক্রোসফট এক্সেস হচ্ছে মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের একটি জনপ্রিয় ডাটাবেজ সফটওয়্যার। এক্সেসের বর্তমান সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেস ২০০৭ (Microsoft Office Eccess 2007)।

এক্সেস দিয়ে বিপুল পরিমাণ ডাটা সহজে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়। তবে অন্যান্য ডাটাবেজ দিয়েও ডাটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করা যায়। অন্য ডাটাবেজগুলো ডস ভিত্তিক হওয়াতে এগুলো বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। এক্সেস উইন্ডোজ ভিত্তিক হওয়াতে এর জনপ্রিয়তাও বেশি।

এক্সেস প্রোগ্রামে কাজ শুরুর প্রস্তুতি

এক্সেস প্রোগ্রামের সাহায্যে ডাটাবেজের কাজ করা জন্য কম্পিউটারে অবশ্যই মাইক্রোসফট অফিস এক্সেস ২০০৭ ইনস্টল করা থাকতে হবে। যদি না থাকে তাহলে ইনস্টল করে নিতে হবে।

এক্সেস প্রোগ্রাম খোলা

লেখালেখির কাজের জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রাম খোলার পদ্ধতি সম্পর্কে এর আগে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে সচিত্র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একই নিয়মে–

১. ডেস্কটপ থেকে স্টার্ট (Start)→ প্রোগ্রাম (Programs)→ মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office)→ মাইক্রোসফট অফিস এক্সেস ২০০৭ (Microsoft Office Eccess 2007) কমান্ড দিলে প্রোগ্রামের প্রারম্ভিক উইন্ডো আসবে।

২. এ প্রারম্ভিক উইন্ডোতে অনেকগুলো সচিত্র অপশন থাকবে। এর ভেতর থেকে ব্লাংক ডাটাবেজ (Blank Database) আইকনে ডবল-ক্লিক করলে ব্লাংক ডাটাবেজ ফাইলের নাম দেওয়ার জন্য ডান দিকে ডায়লগ বক্স যুক্ত হবে।

৩. এ ডায়লগ বক্সের ফাইল নেম (Name) ঘরে ডাটাবেজ ১ (Database 1) এবং এর নিচে ফাইল সংরক্ষণের পাথ (Path) প্রদর্শিত হবে। ঐ অবস্থানে ফাইল সংরক্ষণ না করে ব্যবহারকারী তাঁর সুবিধামতো অবস্থানে ফাইল সংরক্ষণের জন্য–

৪. ফাইল নেম ঘরের ডান দিকে ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করলে ফাইল নিউ ডাটাবেজ (File New Database) নামে একটি ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সে, ধরা যাক এক্সেস প্র্যাকটিকেল ফাইলস নামে একটি নতুন ফোল্ডার খুলে ডায়লগ বক্সের বোতামে ক্লিক করতে হবে। পূর্বে প্রদর্শিত পাথের জায়গায় নতুন পাথ প্রদর্শিত হবে।

Save As
Table Name:
Anan Main Table
OK Cancel

৫. ফাইল নেম ঘরের ডাটাবেজ ১ (Database 1) লেখাটি মুছে আনন্দ টাইপ করতে হবে (অন্য যে কোনো নাম টাইপ করা যেতে পারে)।

৬. ডায়লগ বক্সের ক্রিয়েট (Create) বোতামে ক্লিক করলে টেবিল তৈরি করার আগের অবস্থায় একটি শূন্য ডাটাবেজ উইন্ডো আসবে। এ উইন্ডোর টাইটেল বার-এ লেখা থাকবে 'আনন্দ : ডাটাবেজ (এক্সেস ২০০৭)-মাইক্রোসফট এক্সেস (Ananda:Database (Eccess 2007)-Microsoft Eccess)।

ডাটাবেজ টেবিল তৈরি

শূন্য ডাটাবেজ উইন্ডো থেকে টেবিল তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। এ জন্য–

১. শূন্য ডকুমেন্টের উপরের বাম কোণে অফিস বোতাম (Office Button)-এর নিচে ভিউ (View) ড্রপ-ডাউন আইকনে ক্লিক করলে সেভ এ্যাজ (Save As) ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সে টেবিলের জন্য একটি নাম টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে ডিজাইন ভিউ (Design View) উইন্ডো আসবে। এ উইন্ডোতে টেবিলের শিরোনাম বা ডাটাবেজের ফিল্ড তৈরি করতে হবে। ফিল্ড তৈরি করার জন্য–

২. ফিল্ড নেম (Field Name) ঘরে ক্রমিক নম্বর (Sl No) টাইপ করে কী-বোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলে কার্সর ডাটা টাইপ (Data Type) ঘরে চলে যাবে। এ ঘরের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে ডাটার বিভিন্ন প্রকার ধরন বা টাইপের তালিকা দেখা যাবে। যেমন– বর্ণ (Text), নম্বর (Number), মুদ্রা (Currency), দিন/তারিখ (Date/Time) ইত্যাদি। এ তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় টাইপ সিলেক্ট করতে হবে। নম্বর সিলেক্ট করলে এ ফিল্ডের ডাটা দিয়ে অঙ্ক বা হিসেব-নিকেশের কাজ করা যাবে। দিন/তারিখের ফিল্ডের ডাটা বা তথ্যের ভিত্তিতে বয়স বের করা যাবে এবং বয়স সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করা যাবে। বর্ণ ভিত্তিক ফিল্ডের ডাটার সাহায্যে কোনো গাণিতিক, যেমন– যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করা যাবে না।
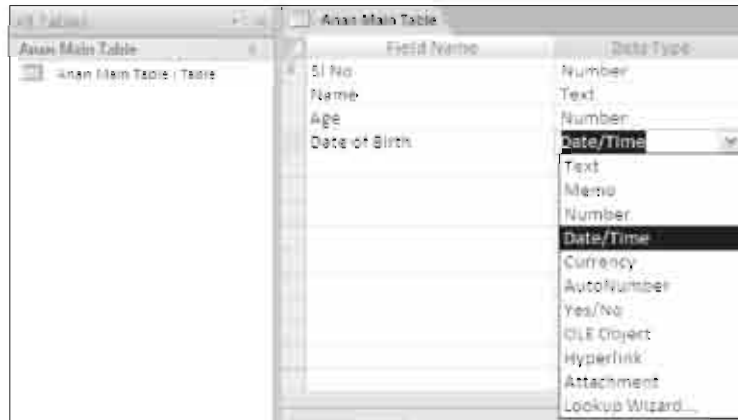
- ডাটা টাইপ সিলেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে ফিল্ডস প্রোপার্টি অংশে ডাটার আরও কিছু বিষয় নির্ধারণ করে দিতে হবে। যেমন– ফিল্ড সাইজ (Field Size)-এর ডান পাশের ঘরে নির্ধারণ করে দিতে হবে কোন ফিল্ডের আকার কত বড় হবে এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কেমন হবে। এ ফিল্ডের একটি নিজস্ব মান থাকে। প্রয়োজনে এটি পরিবর্তন করা যায়। ফিল্ড সাইজ প্রয়োজনের তুলনায় একটু বড় হওয়া ভালো। এতে ডাটা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে না। তবে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি বড় করাও ঠিক নয়।

৩. ফিল্ডের নাম টাইপ করা শেষ হলে ভিউ (View) ড্রপ-ডাউন আইকনে ক্লিক করলে বা ভিউ (View) ড্রপ-ডাউন আইকনের মেনু তালিকা থেকে ডাটাশিট ভিউ (Datasheet View) সিলেক্ট করলে ডাটা এন্ট্রি করার জন্য ডাটাশিট ভিউ (Datasheet View) উইন্ডো ফিরে আসবে। এ উইন্ডোতে ডাটা এন্ট্রি করতে হবে।

ডাটা এন্ট্রি করা

ডাটাশিট ভিউ (Datasheet View)-এ টেবিলের প্রথম ফিল্ডটি সিলেক্টেড থাকবে। না থাকলে সিলেক্ট করে নিতে হবে এবং ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের সাধারণ নিয়মে টাইপ করে টেবিলে ডাটা এন্ট্রি বা তথ্য সন্নিবেশিত করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ডাটা এন্ট্রির শুরুতেই ফন্ট, ফন্টের আকার ইত্যাদি নির্ধারণ করে নেওয়া যেতে পারে। না হলে ডাটা এন্ট্রির যে কোনো সময় ফন্ট, ফন্টের আকার ইত্যাদি নির্ধারণ করে নেওয়া যায়।

এক ফিল্ডের ডাটা টাইপ করা হয়ে গেলে কী-বোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলে কার্সর পরবর্তী ফিল্ডে চলে যাবে।
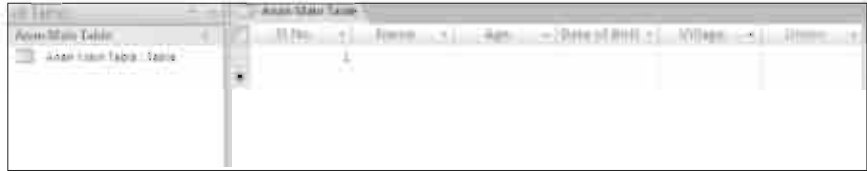
সর্বশেষ ফিল্ডের ডাটা টাইপ করে কী-বোর্ডের ট্যাব বোতামে চাপ দিলে কার্সর পরবর্তী রেকর্ডের প্রথম ফিল্ডে চলে আসবে। একই নিয়মে একটি টেবিল বা ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

মনে রাখতে হবে– কাজ করার সময় কিছুক্ষণ পর পর সংরক্ষণ করতে হবে। সেভ (Save) বা সংরক্ষণ করার জন্য অফিস মেনুর সেভ (Save) কমান্ড দিয়ে বা অফিস বোতামের ডান পাশে সেভ (Save) আইকনে ক্লিক করে বা কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে S বোতামে চাপ দিয়ে সংরক্ষণের কাজ করতে হবে।

বর্ণিত নিয়মে নিচের নমুনা অনুযায়ী একটি ডাটাবেজ টেবিল তৈরি করা যেতে পারে।

অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন

অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তনের জন্য টেবিলের যে কোনো ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার রেখে ফন্টের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করলে সম্পূর্ণ টেবিলের অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি ঘরের অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না।

বানান সংশোধন

বানান সংশোধনের জন্য যে ঘরের লেখার বানান সংশোধন করতে হবে সেই ঘরে ডবল-ক্লিক করলে ঐ ঘরের লেখা সিলেক্টেড হবে। সংশোধিত বানান টাইপ করতে হবে। সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় লেখার পাশে ক্লিক করলে সিলেকশন উঠে যাবে। এ অবস্থায় সাধারণ নিয়মে টাইপ করে বানান সংশোধনের কাজ করতে হবে।

টেবিলে নতুন ফিল্ড বা কলাম যোগ করা

ডাটাবেজ তৈরির কোনো এক পর্যায়ে মনে হতে পারে টেবিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড যোগ করা হয়নি। এমতাবস্থায় টেবিলে নতুন ফিল্ড যোগ করার জন্য কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন–

১. টেবিলে সর্বশেষ ফিল্ডের ডান দিকে এ্যাড নিউ ফিল্ড (Add New Field) নামে একটি ফিল্ড থাকে। এ ফিল্ডে কোনো ডাটা এন্ট্রি হয় না। এ ফিল্ডকে সক্রিয় নতুন ফিল্ডে পরিণত করার জন্য–

– ডবল-ক্লিক করতে হবে। ডবল-ক্লিক করলে এ্যাড নিউ ফিল্ড (Add New Field) লেখা উঠে যাবে এবং ফিল্ডে ইনসার্সন পয়েন্টার অবস্থান করবে। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় ফিল্ডের নাম টাইপ করতে হবে। এবার এ ফিল্ডে ডাটা এন্ট্রি করা যাবে।

অথবা

২. এ্যাড নিউ ফিল্ড (Add New Field) কলামটি সিলেক্ট করতে হবে। ডাটাশিট (Datasheet) ট্যাবের রিবনে রিনেম (Rename) আইকনে ক্লিক করলে ফিল্ডের লেখা উঠে যাবে এবং ফিল্ডে ইনসার্সন পয়েন্টার অবস্থান করবে। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় ফিল্ডের নাম টাইপ করতে হবে। এবার এ ফিল্ডে ডাটা এন্ট্রি করা যাবে।

অথবা

৩. ভিউ (View) আইকনে ক্লিক করে বা ভিউ ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে ডিজাইন ভিউ (Design View) সিলেক্ট করলে ডিজাইন ভিউ (Design View) উইন্ডো আসবে। এ উইন্ডোতে বর্তমান ফিল্ডগুলোর নাম দেখা যাবে। যে অবস্থানে নতুন ফিল্ড তৈরি করতে হবে তার নিচের ফিল্ডে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে। রিবনে ইনসার্ট রো (Insert Row) আইকন ক্লিক করলে ইনসার্সন পয়েন্টার বিশিষ্ট ফিল্ডের উপরে একটি শূন্য ফিল্ড যুক্ত হবে। ফিল্ডের নাম, ধরা যাক, শিক্ষিত/অশিক্ষিত (Literate/Illiterate), টাইপ করতে হবে।

– এবার ডাটাশিট উইন্ডোতে ফিরে গিয়ে দেখা যাবে এ নামে একটি নতুন শূন্য ফিল্ড যুক্ত হয়েছে। ফিল্ডটি পূরণ করতে হবে।

ফিল্ড বা কলাম বাতিল করা

কোনো অপ্রয়োজনীয় ফিল্ড বাতিল করার জন্য ঐ ফিল্ডটি সিলেক্ট করে হোম (Home) ট্যাব অথবা ডাটাশিট (Datasheet) ট্যাবের রিবন থেকে ডিলিট (Delete) আইকন/ড্রপ-ডাউন তালিকায় কলাম (Column) সিলেক্ট করতে হবে।

বাতিলের কমান্ড কার্যকর হওয়ার আগে সতর্কতাসূচক বার্তা আসবে। বার্তাবক্সে 'হ্যাঁ' সূচক বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা ফিল্ড স্থায়ীভাবে বাতিল হয়ে যাবে। একবার বাতিল হয়ে গেলে আর আনডু করা যায় না।

রেকর্ড বা সারি বাতিল করা

কোনো রেকর্ড বা সারি (Row) বাতিল করার জন্য ঐ রেকর্ড বা সারি সিলেক্ট করে হোম (Home) ট্যাবের রিবন থেকে ডিলিট (Delete) আইকন/ড্রপ-ডাউন তালিকায় ডিলিট (Delete) সিলেক্ট করতে হবে।

বাতিলের কমান্ড কার্যকর হওয়ার আগে সতর্কতাসূচক বার্তা আসবে। বার্তাবক্সে 'হ্যাঁ' সূচক বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা রেকর্ড বা সারি (Row) স্থায়ীভাবে বাতিল হয়ে যাবে। একবার বাতিল হয়ে গেলে আর আনডু করা যায় না।

ডাটার বর্ণানুক্রমিক ও সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস

একটি টেবিল তৈরি করার পর যে কোনো ফিল্ড বা কলামের ভিত্তিতে ডাটাবেজের সম্পূর্ণ ডাটা বর্ণানুক্রমিক এবং সংখ্যানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত (Sort) করা যায়। বর্ণানুক্রমিক এবং সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস আরোহী (Ascending) পদ্ধতি এবং অবরোহী (Descending) পদ্ধতি উভয়ভাবে করা যায়। আরোহী পদ্ধতি হচ্ছে ছোট ক্রম থেকে বড় ক্রমের দিকে যাওয়া

(A ...B ...C ...Z, 1 ...10 ...50 ...100) এবং অবরোহী হচ্ছে বড় ক্রম থেকে ছোট ক্রমের দিকে যাওয়া (Z ...C ...B ...A, 100 ...50 ...10 ...1)।

Anan Main Table

Sl No	Name	Age	Date of Birth	Male/Femah	Village	Union
11	Knokon Mollah	15	8/9/1993	M	Tepra	Kanaihat
9	M. A. Kalam	16	2/6/1992	M	Basail	Raukhali
2	M. A. Khalek	18	1/1/1990	M	Nanda	Bhasantara
19	Khadem Hossain	21	3/4/1984	F	Basail	Raukhali
12	M. A. Latif	22	3/4/1985	M	Basail	Raukhali
16	Rahela Khatun	24	1/9/1983	F	Tepra	Kanaihat
8	Rahima Banu	25	3/5/1982	F	Tepra	Kanaihat
6	Rahim Choudhury	28	3/6/1981	M	Basail	Raukhali
5	Habib Uddin Miah	30	2/5/1978	M	Dhakpara	Dishanchai
15	Kaiman Nesa	33	2/3/1974	F	Tepra	Kanaihat
18	Narendra Halder	34	7/7/1975	M	Dhakpara	Dishanchai
3	Kuddus Miah	35	2/4/1973	M	Basail	Raukhali
7	Abdul Karim Khan	40	6/5/1969	M	Nanda	Bhasantara
13	Hanifa Begam	41	5/6/1968	F	Nanda	Bhasantara
20	Nasreen Choudhury	47	2/5/1960	F	Dhakpara	Dishanchai
4	Hamid Sheik	50	3/4/1957	M	Dhakpara	Dishanchai
1	Nilmoni Saha	54	3/4/1952	F	Tepra	Kanaihat
14	Momim Uddin Sheik	55	3/4/1953	M	Dhakpara	Dishanchai
10	Charubala Dasi	60	5/4/1948	F	Nanda	Bhasantara
17	Kanailal Das	70	6/6/1936	M	Nanda	Bhasantara

নাম, গ্রাম এবং ইউনিয়ন ফিল্ডের ডাটা বর্ণানুক্রমিক এবং ক্রমিক নম্বর, বয়স এবং জন্ম তারিখ ফিল্ডের ডাটা সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যাস (Sort) করা যাবে।

টেবিলের ডাটা বয়সের ভিত্তিতে সংখ্যানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করার জন্য এ ফিল্ডের যে কোনো ঘরে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে। এরপর রিবনের আরোহী (Ascending) আইকনে ক্লিক করলে টেবিলের সমগ্র ডাটা বয়সের ভিত্তিতে আরোহী বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে যাবে এবং অবরোহী (Descending) আইকনে ক্লিক করলে টেবিলের সমগ্র ডাটা বয়সের ভিত্তিতে আরোহী বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে যাবে।

একই পদ্ধতিতে অন্যান্য বিন্যাসের কাজ করতে হবে।

ডাটা বিন্যস্তকরণের পর রেকর্ডের অবস্থান পরিবর্তিত হবে। কিন্তু, রেকর্ডের অন্যান্য তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন– বয়সের ভিত্তিতে আরোহী পদ্ধতির বিন্যাসের পর ১১ নম্বর রেকর্ডটি সবার উপরে চলে আসবে। কারণ, ১১ নম্বর রেকর্ডের বয়স সবচেয়ে কম। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে, ১১ নম্বর রেকর্ডের অন্যান্য তথ্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

তথ্য অনুসন্ধান করা

বিপুল পরিমাণ তথ্য বা ডাটা সংবলিত একটি ডাটাবেজ থেকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম খুঁজে বের করার জন্য হোম ট্যাবের রিবনে ফাইন্ড আইকনে ক্লিক করলে ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস (Find and Replace) ডায়লগ বক্স আসবে। ডায়লগ বক্সের ফাইন্ড হোয়াট (Find What) ঘরে যে ব্যক্তিকে খুঁজতে হবে সেই ব্যক্তির নাম বা নামের অংশ টাইপ করতে হবে। নামের অংশ হিসেবে পদবি টাইপ করা যেতে পারে অথবা অন্য যে কোনো অংশ টাইপ করা যেতে পারে। টাইপ করার পর ডায়লগ বক্সের ফাইন্ড নেক্সট (Find Next) বোতামে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে ফাইন্ড হোয়াট (Find What) ঘরে টাইপ করা নাম বা পদবি বা নামের অংশ হিসেবে টাইপ করা শব্দ সিলেক্টেড হয়ে যাবে। এ শব্দটি যদি পদবি হয় বা একই নামের অংশ হয়, তাহলে আবার ফাইন্ড নেক্সট (Find Next) বোতামে ক্লিক করতে হবে। এতে একই নামের অংশ বিশিষ্ট বা পদবি বিশিষ্ট পরবর্তী নাম সিলেক্টেড হবে। এভাবে বারবার ফাইন্ড নেক্সট (Find Next) বোতামে ক্লিক করে করে সবগুলো নাম খুঁজে বের করা যাবে বা দেখা যাবে। সর্বশেষ নাম দেখা হয়ে গেলে পর্দায় এ মর্মে বার্তা প্রদর্শিত হবে যে, সবগুলো নাম খোঁজার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায়, অন্য কোনো নাম খোঁজার প্রয়োজন না থাকলে ডায়লগ বক্সের ক্যান্সেল (Cancel) বোতামে ক্লিক করতে হবে।

ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস (Find and Replace) কমান্ডের অন্যান্য কাজ ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের মতোই।

শর্তযুক্ত তথ্য অনুসন্ধান

গোটা ডাটাবেজ থেকে শুধু নন্দা গ্রামের মানুষের তথ্য দেখা প্রয়োজন, শুধু রাউখালি ইউনিয়নের মানুষের তথ্য দেখা প্রয়োজন, গোটা ডাটাবেজে যাদের বয়স ৩০ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে তাদের তথ্য দেখা প্রয়োজন, যাদের বয়স ১৮ বছরের কম তাদের তথ্য দেখা প্রয়োজন ইত্যাদি আরও নানা শর্তের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হতে পারে। শর্তের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান করার কাজ কিন্তু খুবই সহজ। শর্তগুলো যুক্ত করার পর অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়ার পর মুহূর্তের মধ্যে শর্তের আওতাভুক্ত সকল তথ্য প্রদর্শিত হবে। শর্তযুক্ত তথ্য অনুসন্ধানের পদ্ধতি নিচে বর্ণিত হল :

যাদের বয়স ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে তাদের রেকর্ড অনুসন্ধান

যাদের বয়স ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে তাদের রেকর্ড অনুসন্ধান করার জন্য–

১. বয়স (Age) ফিল্ডের যে কোনো ঘরে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে।

২. রিবনের ডান দিকে সর্ট এন্ড ফিল্টার (Sort and Filter) অংশে সিলেকশন (Selection) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে কয়েক প্রকার শর্ত আরোপের তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে বিটুইন (Between) সিলেক্ট করলে বিটুইন নাম্বারস (Between Numbers) ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সের স্মলেস্ট (Smallest) ঘরে ৩০ এবং লার্জেস্ট (Largest) ঘরে ৬০ টাইপ করে OK বোতামে কিক্ল করলে গোটা ডাটাবেজের ভেতরে যাদের বয়স ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে শুধু তাদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

অথবা

১. সর্ট এন্ড ফিল্টার (Sort and Filter) অংশে ফিল্টার (Filter) আইকনে ক্লিক করলে বিভিন্ন প্রকার শর্ত আরোপের ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে।

২. ডায়লগ বক্সের নাম্বার ফিল্টারস (Number Filters) কমান্ডের ফ্লাইআউট তীরে ক্লিক করলে একটি ফ্লাইআউট তালিকা পাওয়া যাবে।
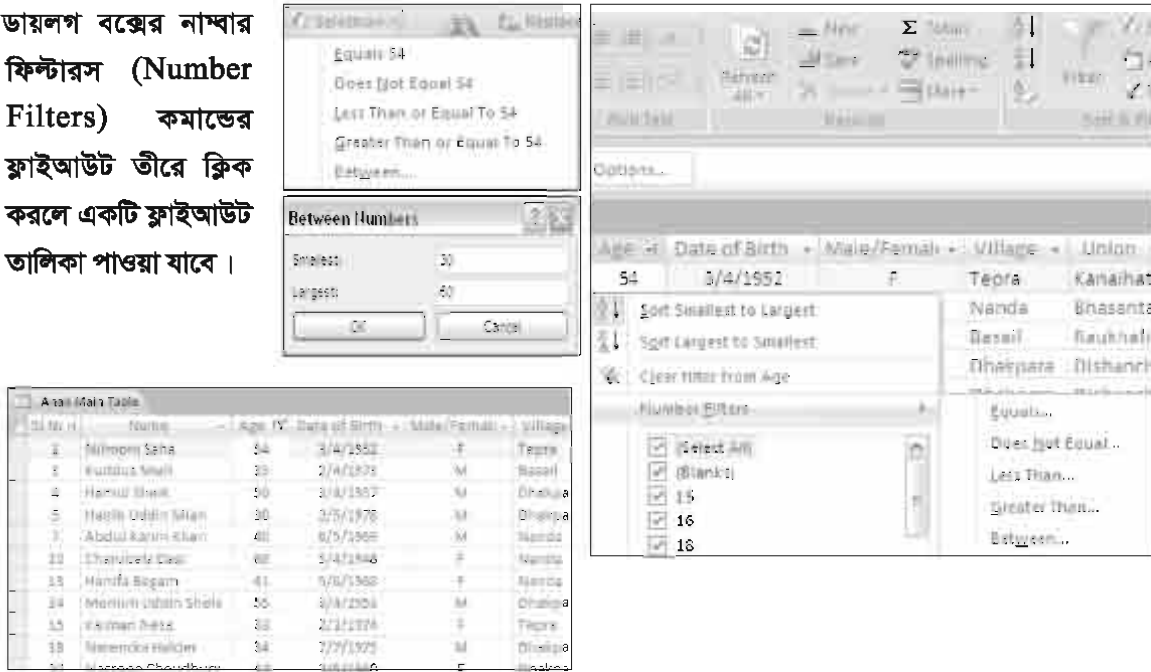
৩. এ তালিকা থেকে বিটুইন (Between) সিলেক্ট করলে বিটুইন নাম্বারস (Between Numbers) ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সের স্মলেস্ট ঘরে ৩০ এবং লার্জেস্ট ঘরে ৬০ টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে গোটা ডাটাবেজের ভেতরে যাদের বয়স ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে শুধু তাদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

টগল ফিল্টার (Toggle Filter) আইকনে ক্লিক করলে বা কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে জেড (Z) বোতামে চাপ দিলে বা আনডু করলে আবার মূল ডাটাবেজ ফিরে আসবে।

গ্রামের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান

নমুনা ডাটাবেজে চারটি গ্রামের নাম আছে। এর ভেতর থেকে যে কোনো একটি গ্রামের তথ্য দেখা যেতে পারে। যে কোনো দু'টি বা তিনটি গ্রামের তথ্য দেখা যেতে পারে।

যে কোন একটি গ্রামের তথ্য দেখার জন্য–
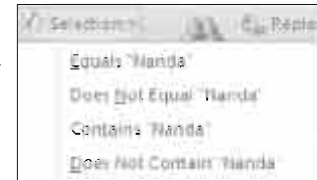
১. যে গ্রামের তথ্য দেখার প্রয়োজন সেই গ্রামের নামের ঘরে মাউস উয়েন্টার ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে।

২. রিবনের ডান দিকে সর্ট এন্ড ফিল্টার (Sort and Filter) অংশে সিলেকশন (Selection) ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে কয়েক প্রকার শর্ত আরোপের তালিকা পাওয়া যাবে। যে গ্রামের নামের ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার থাকবে এ তালিকায় সে গ্রামের নামটি উপরে থাকবে। উদাহরণে নন্দা গ্রামের নামের ঘরে ইনসার্সন পয়েন্টার রাখা হয়েছিল। নন্দা গ্রামের নামের সঙ্গে চারটি শর্ত আছে।

– এর মধ্যে ইকুয়ালস নন্দা (Equals "Nanda") কনটেইনস নন্দা (Contains "Nanda") সিলেক্ট করলে শুধু নন্দা গ্রামের রেকর্ডগুলো দেখা যাবে।

– ডাজ নট ইকুয়াল নন্দা বা ডাজ নট কনটেইন নন্দা সিলেক্ট করলে নন্দা গ্রাম ছাড়া অন্যান্য সকল গ্রামের তথ্য বা রেকর্ড দেখা যাবে।

টগল ফিল্টার (Toggle Filter) আইকনে ক্লিক করলে বা কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে জেড (Z) বোতামে চাপ দিলে বা আনডু করলে আবার মূল ডাটাবেজ ফিরে আসবে।

একাধিক গ্রামের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধান

একাধিক গ্রামের ভিত্তিতে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য–

১. যে কোনো গ্রামের নামের ঘরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে।

২. সর্ট এন্ড ফিল্টার (Sort and Filter) অংশে ফিল্টার (Filter) আইকনে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স পাওয়া যাবে। ডায়লগ বক্সের নিচের অংশে সবগুলো গ্রামের নাম সিলেক্টেড অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। এ তালিকা থেকে যে গ্রামগুলোর রেকর্ড দেখা প্রয়োজন সেই গ্রামগুলো ছাড়া বাকি গ্রামগুলোর বাম পাশের চেকবক্সে ক্লিক করে টিকচিহ্ন তুলে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নন্দা ও বাসাইল গ্রামের বাম পাশের চেকবক্সে টিকচিহ্ন রেখে বাকি চেকবক্সের টিকচিহ্ন তুলে দেওয়া হয়েছে।

৩. ডায়লগ বক্সের OK বোতামে কিক্ল করলে গোটা ডাটাবেজের ভেতরে শুধু নন্দা এবং বাসাইল গ্রামের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

– একই নিয়মে ইউনিয়নের ভিত্তিতে শর্তারোপ করে রেকর্ড দেখা যাবে।

টগল ফিল্টার (Toggle Filter) আইকনে ক্লিক করলে বা কী-বোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে জেড (Z) বোতামে চাপ দিলে বা আনডু করলে আবার মূল ডাটাবেজ ফিরে আসবে।

কুয়েরি এবং রিপোর্ট

এ যাবৎ বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দেখার কাজ করা যায়। কুয়েরি পদ্ধতিতেও শর্তযুক্ত তথ্য আহরণ ও প্রদর্শন করা যায়। তবে, শর্তযুক্ত তথ্য সংরক্ষণ এবং মুদ্রণ নেওয়ার জন্য প্রদর্শিত তথ্য কুয়েরি আকারে সংরক্ষণ করতে হয়। কুয়েরি আকারে সংরক্ষিত তথ্য সরাসরি মুদ্রণ নেওয়া যায়। কিন্তু মুদ্রণ নেওয়া বা মুদ্রিত আকারে তথ্য সরবরাহের জন্য রিপোর্ট আকারে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। এতে তথ্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়।

কুয়েরি পদ্ধতিতে তথ্য আহরণ এবং সংরক্ষণ

কুয়েরি পদ্ধতিতে তথ্য আহরণ এবং সংরক্ষণ করার জন্য–

১. ক্রিয়েট (Create) ট্যাবের রিবনে কুয়েরি ডিজাইন (Query Design) আইকনে ক্লিক করলে কুয়েরি পদ্ধতিতে তথ্য আহরণের ছক আসবে। এ ছকের সঙ্গে শো টেবিল (Show Table) ডায়লগ বক্স এবং টেবিলের ফিল্ড ধারক বক্স আসবে। যেহেতু একটি মাত্র টেবিল নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং একটি টেবিলই খোলা আছে, সেহেতু শো টেবিল (Show Table) ডায়লগ বক্সে বর্তমান টেবিলের নাম থাকবে। নামের উপর ডবল-ক্লিক করলে বা এ্যাড (Add) বোতামে ক্লিক করলে ফিল্ড ধারকে টেবিলের সবগুলো ফিল্ড বা হেডিং অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। শো টেবিল (Show Table) ডায়লগ বক্সের ক্লোজ (Close) বোতামে ক্লিক করে ডায়লগ বক্সটি বন্ধ করে দিতে হবে।

২. ফিল্ডের নামের উপর ডবল-ক্লিক করলে ঐ ফিল্ডটি ছকের প্রথম ফিল্ড ঘরে চলে আসবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবগুলো ফিল্ড ছকের ফিল্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

৩. যে ফিল্ডের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন সেই ফিল্ডের বরাবর নিচে ক্রাইটেরিয়া (Criteria) সারির ঘরে শর্ত যুক্ত করতে হবে। যেমন– বয়সের ক্ষেত্রে কয়েক রকম শর্ত আরোপ করা যেতে পারে– নির্দিষ্ট বয়সের বেশি বয়সের ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ, নির্দিষ্ট বয়সের কম বয়সের ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ বা নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যেকার ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ।

ক. নির্দিষ্ট বয়সের বেশি বয়সের ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ করার জন্য যদি >৩০ (>30) টাইপ করা হয় তাহলে শুধু ৩০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে। যদি >=৩০ (>=30) টাইপ করা হয় তাহলে ৩০ বছর বয়সী ব্যক্তিসহ ৩০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

খ. নির্দিষ্ট বয়সের কম বয়সের ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ করার জন্য যদি <৩০ (<30) টাইপ করা হয় তাহলে শুধু ৩০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে। যদি <=৩০ (<=30) টাইপ করা হয় তাহলে ৩০ বছর বয়সী ব্যক্তিসহ ৩০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

গ. নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যেকার ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ করার জন্য যদি >৩০ এবং <৬০ (>30 and <60) টাইপ করা হয় তাহলে শুধু ৩০ বছরের বেশি বয়সী এবং ৬০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

ঘ. নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যেকার ব্যক্তিদের রেকর্ড আহরণ করার জন্য যদি >=৩০ এবং <=৬০ (>=30 and <=60) টাইপ করা হয় তাহলে ৩০ বছর বয়সী ব্যক্তিসহ ৩০ বছরের বেশি বয়সী এবং ৬০ বছর বয়সী ব্যক্তিসহ ৬০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

Sl No	Name	Age	Date of Birth	Male/Female	Village	Union
3	Kuddus Miah	35	2/4/1973	M	Basail	Raukhali
4	Hamid Sheik	50	3/4/1957	M	Dhakpara	Dishanchar
5	Habib Uddin Miah	30	2/5/1978	M	Dhakpara	Dishanchar
7	Abdul Karim Khan	40	6/5/1969	M	Nanda	Bhasantara
10	Charubala Dasi	60	5/4/1948	F	Nanda	Bhasantara
13	Hanifa Begam	41	5/6/1968	F	Nanda	Bhasantara
14	Momim Uddin Sheik	55	3/4/1953	M	Dhakpara	Dishanchar
15	Kalman Nesa	33	2/3/1974	F	Tepra	Kanaihat
18	Narendra Halder	34	7/7/1975	M	Dhakpara	Dishanchar
20	Nasreen Choudhury	47	2/5/1960	F	Dhakpara	Dishanchar
1	Nilmoni Saha	34	3/4/1952	F	Tepra	Kanaihat

৪. শর্ত টাইপ করার পর রিবনের বাম দিকে রেজাল্ট অংশে রান (Run) আইকনে ক্লিক করলে প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

৫. মূল টেবিলের উপরে টেবিলের শিরোনামের পাশে কুয়েরি ১ (Query 1) শিরোনাম বিদ্যমান থাকবে।

৬. কুয়েরি ১ (Query 1)-এর উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে সেভ এ্যাজ ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সে কুয়েরির একটি নাম Age-Query টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে কুয়েরি ১-এর নাম টাইপ করা নামে পরিণত হবে (Age-Query) এবং টেবিলের বাম পাশের অংশে মূল টেবিলের নিচে কুয়েরির নাম (Age-Query) তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। কুয়েরির নামের সঙ্গে কুয়েরি আইকন থাকবে।

টেবিলের উপরে মূল টেবিলের শিরোনামের পাশে এ কুয়েরি ফাইলের শিরোনামে ক্লিক করলে অথবা মূল টেবিলের বাম পাশের অংশে কুয়েরি ফাইলটির নামের উপর ডবল-ক্লিক করলে কুয়েরি ফাইলটি সক্রিয় হবে। কুয়েরি ফাইলটি সক্রিয় থাকা অবস্থায় মুদ্রণ নিয়ে মুদ্রিত কুয়েরি সংরক্ষণ করে রাখা যাবে এবং প্রয়োজন হলে সরবরাহ ও বিতরণ করা যাবে।

একই নিয়মে জন্ম তারিখের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ, মুদ্রণ এবং সরবরাহ ও বিতরণ করা যাবে।

গ্রাম ও ইউনিয়নের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ

গ্রাম ও ইউনিয়নের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ করার জন্য–

১. ক্রিয়েট (Create) ট্যাবের রিবনে কুয়েরি ডিজাইন (Query Design) আইকনে ক্লিক করলে কুয়েরি পদ্ধতিতে তথ্য আহরণের ছক আসবে। এ ছকের সঙ্গে শো টেবিল (Show Table) ডায়লগ বক্স এবং টেবিলের ফিল্ড ধারক বক্স আসবে। যেহেতু একটি মাত্র টেবিল নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং একটি টেবিলই খোলা আছে, সেহেতু শো টেবিল (Show Table) ডায়লগ বক্সে বর্তমান টেবিলের নাম থাকবে। নামের উপর ডবল-ক্লিক করলে বা এ্যাড (Add) বোতামে ক্লিক করলে ফিল্ড ধারকে টেবিলের সবগুলো ফিল্ড বা হেডিং অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। শো টেবিল (Show Table) ডায়লগ বক্সের ক্লোজ (Close) বোতামে ক্লিক করে ডায়লগ বক্সটি বন্ধ করে দিতে হবে।

২. ফিল্ডের নামের উপর ডবল-ক্লিক করলে ঐ ফিল্ডটি ছকের প্রথম ফিল্ড ঘরে চলে আসবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবগুলো ফিল্ড ছকের ফিল্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

৩. গ্রাম/ইউনিয়ন ফিল্ডের বরাবর নিচে ক্রাইটেরিয়া (Criteria) সারির ঘরে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসাতে হবে।

৪. ধরা যাক, বাসাইল, টেপরা এবং নন্দা গ্রামের রেকর্ড আহরণ করতে হবে। এ জন্য–

ক. ক্রাইটেরিয়া (Criteria) ঘরে Basail টাইপ করতে হবে।

খ. Basail-এর নিচের ঘরে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে Tepra টাইপ করতে হবে।

গ. Tepra-এর নিচের ঘরে ক্লিক করে ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে Nanda টাইপ করতে হবে।

– টাইপ করা নামগুলোর দুই পাশে আপনাআপনি উদ্ধৃতি চিহ্ন যুক্ত হয়ে যাবে।

Sl.No.	Name	Age	Date of Birth	Male/Fema	Village	Union
2	M. A. Khalek	18	1/1/1990	M	Nanda	Bhasantara
3	Kuddus Miah	35	2/4/1973	M	Basail	Raukhali
4	Rahim Choudhury	28	3/6/1981	M	Basail	Raukhali
7	Abdul Karim Khan	40	6/5/1969	M	Nanda	Bhasantara
8	Rahima Banu	25	3/5/1982	F	Tepra	Kanaihat
9	M. A. Kalam	16	2/6/1992	M	Basail	Raukhali
10	Charubala Dasi	60	5/4/1948	F	Nanda	Bhasantara
11	Khokon Mollah	15	8/9/1993	M	Tepra	Kanaihat
12	M. A. Latif	22	3/4/1965	M	Basail	Raukhali
13	Hanifa Begam	41	5/6/1968	F	Nanda	Bhasantara
15	Kamran Nesa	33	2/3/1974	F	Tepra	Kanaihat
16	Rahela Khatun	24	1/9/1983	F	Tepra	Kanaihat
17	Kanailal Das	70	6/6/1936	M	Nanda	Bhasantara
1	Nilmoni Saha	54	3/4/1952	F	Tepra	Kanaihat
19	Khadem Hossain	21	3/4/1994	F	Basail	Raukhali

৪. শর্ত টাইপ করার পর রিবনে বাম দিকে রেজাল্ট অংশে রান (Run) আইকনে ক্লিক করলে প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী রেকর্ড প্রদর্শিত হবে।

৫. মূল টেবিলের উপরে কুয়েরি ১ (Query 1) শিরোনাম বিদ্যমান থাকবে।

৬. কুয়েরি ১ (Query 1)-এর উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে সেভ এ্যাজ ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সে কুয়েরির একটি নাম Village-Query টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে কুয়েরি ১-এর নাম টাইপ করা নামে পরিণত হবে (Village-Query) এবং টেবিলের বাম পাশের অংশে মূল টেবিলের নিচে কুয়েরির নাম (Village-Query) তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। কুয়েরির নামের সঙ্গে কুয়েরি আইকন থাকবে।

টেবিলের উপরে মূল টেবিলের শিরোনামের পাশে এ কুয়েরি ফাইলের শিরোনামে ক্লিক করলে অথবা মূল টেবিলের বাম পাশের অংশে কুয়েরি ফাইলটির নামের উপর ডবল-ক্লিক করলে কুয়েরি ফাইলটি সক্রিয় হবে। কুয়েরি ফাইলটি সক্রিয় থাকা অবস্থায় মুদ্রণ নিয়ে মুদ্রিত কুয়েরি সংরক্ষণ করে রাখা যাবে এবং প্রয়োজন হলে সরবরাহ ও বিতরণ করা যাবে। একই নিয়মে জন্ম তারিখের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ, মুদ্রণ এবং সরবরাহ ও বিতরণ করা যাবে।

রিপোর্ট

সাধারণত তথ্য সরবরাহ বা বিতরণের জন্য রিপোর্ট আকারে তথ্য বিন্যস্ত করা হয়। এ জন্য–

মূল ডাটাবেজ ফাইল বা যে কোনো কুয়েরি ফাইল সিলেক্ট করে ক্রিয়েট (Create) রিবনে রিপোর্ট (Report) আইকনে ক্লিক করলে সিলেক্টেড রেকর্ডগুলো রিপোর্ট উইন্ডোতে উপস্থাপিত হবে। উপস্থাপিত আঙ্গিকে রিপোর্ট বা প্রতিবেদনটি আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। বিশেষ করে ফিল্ড বা কলামগুলোর পাশাপাশি বিস্তৃতি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হতে পারে। ফিল্ড বা কলামের পাশাপাশি মাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য–

২. ফিল্ডের যে কোনো ঘরের প্রথমে বাম পাশে এবং পরে প্রয়োজন হলে ডান পাশে মাউস পয়েন্টার ক্লিক

করে বাম দিকে ড্রাগ করে ফিল্ড বা কলামের পাশাপাশি মাপ কমাতে হবে। একবারে না হলে বারবার চেষ্টা করে ফিল্ড বা কলামের মাপ ঠিক করে নিতে হবে।

৩. অক্ষরের আকার-আকৃতিও ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের সাধারণ নিয়মে, প্রয়োজন হলে, পরিবর্তন করে নিতে হবে।

৪. মূল টেবিলের উপরে যে টেবিল বা কুয়েরি ফাইলের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে সেই টেবিল বা কুয়েরি ফাইলের নাম থাকবে। উক্ত নামের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে সেভ এ্যাজ ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সে রিপোর্টের একটি নাম Full Table-Report টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে রিপোর্টের উপরে এবং রিপোর্টের বাম পাশের অংশে রিপোর্টের নাম Full Table-Report তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। রিপোর্টের নামের সঙ্গে রিপোর্ট আইকন থাকবে।

টেবিলের উপরে রিপোর্ট ফাইলের শিরোনামে ক্লিক করলে অথবা মূল টেবিলের বাম পাশের অংশে রিপোর্ট ফাইলটির নামের উপর ডবল-ক্লিক করলে রিপোর্ট ফাইলটি সক্রিয় হবে। রিপোর্ট ফাইলটি সক্রিয় থাকা অবস্থায় মুদ্রণ নিয়ে মুদ্রিত রিপোর্ট সংরক্ষণ করে রাখা যাবে এবং প্রয়োজন হলে সরবরাহ ও বিতরণ করা যাবে।

রিপোর্টে গ্রিডলাইন যুক্ত করা

রিপোর্ট তৈরি করার পর মনে হতে পারে গ্রিডলাইনের ধরনটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন অথবা গ্রিডলাইন উঠিয়ে দিলেই ভালো দেখাবে। গ্রিডলাইন হচ্ছে রেকর্ডগুলোর উপরে-নিচে এবং দুই পাশের রেখা বা লাইন। রিপোর্ট গ্রিডলাইন যুক্ত করা, বাদ দেওয়া বা গ্রিডলাইনের ধরনটা পরিবর্তন করার জন্য–

১. রিপোর্টের শিরোনামের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে একটি মেনু পাওয়া যাবে।

২. এ মেনু থেকে লেআউট ভিউ (Layout View) সিলেক্ট করলে রিপোর্টটি লেআউট ভিউয়ে উপস্থাপিত হবে। লেআউট ভিউয়ে রিপোর্টে গ্রিডলাইন যুক্ত করার কাজ করতে হবে। এ জন্য–

ক. রিপোর্টের যে কোনো ঘরে ক্লিক করলে প্রথম ফিল্ডের উপরের বাম কোণে টেবিল সিলেকশন আইকন দৃশ্যমান হবে। এ আইকনে ক্লিক করলে গোটা রিপোর্ট সিলেক্টেড হবে।

খ. গোটা রিপোর্ট সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় ফরমেট ট্যাবের রিবনে গ্রিডলাইনস আইকনে ক্লিক করলে বিভিন্নভাবে গ্রিডলাইন যুক্ত করার নমুনা ছক পাওয়া যাবে। এর ভেতর থেকে যে নমুনায় ক্লিক করা হবে রিপোর্টে সেভাবেই গ্রিড যুক্ত হবে।

গ. রিপোর্ট থেকে গ্রিডলাইন তুলে ফেলার জন্য একবারে নিচের নমুনা None-এ ক্লিক করতে হবে।

ঘ. গ্রিডলাইন মোটা-চিকন করা এবং ডট বা ড্যাশ বিশিষ্ট করার জন্য গ্রিডলাইনস (Gridlines) আইকনের পাশের আইকন/ড্রপ-ডাউন তালিকা ব্যবহার করতে হবে।

৩. গ্রিড যুক্ত করা বা বাদ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করে রিপোর্টের শিরোনামের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে একটি মেনু পাওয়া যাবে। এ মেনু থেকে রিপোর্ট ভিউ (Report View) সিলেক্ট করলে রিপোর্টটি রিপোর্ট ভিউয়ে ফিরে আসবে।

রিপোর্টের লগো এবং শিরোনাম পরিবর্তন করা

লগো

রিপোর্টের লগো (Logo) পরিবর্তন করার জন্য–

১. উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে লেআউট ভিউয়ে যেতে হবে।

২. লগো আইকনে ক্লিক করলে ইনসার্ট পিকচার ডায়লগ বক্স আসবে।

৩. ইনসার্ট পিকচার ডায়লগ বক্স থেকে, প্রয়োজন হলে ব্রাউজ করে, লগো হিসেবে ব্যবহারযোগ্য ছবির ফাইল সিলেক্ট করে ডায়লগ বক্সের বোতামে ক্লিক করতে হবে।
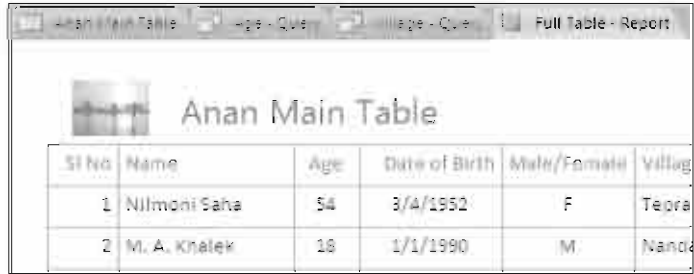
– বিদ্যমান লগোর স্থানে সিলেক্ট করা ছবিটি লগো হিসেবে বসে যাবে।

– লগো প্রতিস্থাপনের জন্য বিদ্যমান লগো সিলেক্ট করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

৪. লগো পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন করে রিপোর্টের শিরোনামের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে একটি মেনু পাওয়া যাবে। এ মেনু থেকে রিপোর্ট ভিউ (Report View) সিলেক্ট করলে রিপোর্টটি রিপোর্ট ভিউয়ে ফিরে আসবে।

শিরোনাম

Full Table-Report নামে রিপোর্ট ফাইল সেভ করা হলেও মূল রিপোর্টের নাম অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মূল রিপোর্টে শিরোনাম পরিবর্তন/সংশোধন করার জন্য–

১. উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে লেআউট ভিউয়ে যেতে হবে।

২. বিদ্যমান শিরোনামের উপর ডবল-ক্লিক করলে শিরোনামের বক্সটি সম্পাদনাযোগ্য হবে। শিরোনামের বক্সের ভেতর ইনসার্সন পয়েন্টার থাকবে।

৩. ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের নিয়মে বিদ্যমান শিরোনাম মুছে ফেলে নতুন শিরোনাম Full Table-Report টাইপ করতে হবে।

৪. শিরোনাম পরিবর্তন/সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করে রিপোর্টের শিরোনামের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে একটি মেনু পাওয়া যাবে। এ মেনু থেকে রিপোর্ট ভিউ (Report View) সিলেক্ট করলে রিপোর্টটি রিপোর্ট ভিউয়ে ফিরে আসবে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং

ভিজ্যুয়াল বেসিক প্রোগ্রাম খোলা

১. ভিজ্যুয়াল বেসিক চালু অবস্থায় না থাকলে এটি যথানিয়মে চালু করতে হবে।

২. আর যদি তা চালু অবস্থায় থাকে তাহলে নতুন একটি প্রজেক্ট খোলার জন্য File→New Project বাছাই করতে হবে। বর্তমান ফাইল সেভ করার জিজ্ঞাসা নিয়ে একটি ডায়লগ বক্স পর্দায় এলে তাতে প্রয়োজন অনুযায়ী Yes বা No বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৩. New Project ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হলে তাতে Standard EXE সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় OK বোতামে ক্লিক করতে হবে অথবা Standard EXE আইকনের উপর ডবল-ক্লিক করতে হবে।

একটি ফরমসহ নতুন একটি প্রজেক্ট ওপেন হবে। উক্ত ফরমটির ডিফল্ট নাম হল Form1।

এ ক্ষেত্রে প্রোজেক্টটি আগামী (Future) এবং ফরমটি আগামীদিনের স্কুল (Future School) নামে সেভ করা হয়েছে। সেভ করা প্রোজেক্ট ওপেন করার জন্য–

১. ভিজ্যুয়াল বেসিকের ফাইল (File) মেনু থেকে ওপেন (Open) সিলেক্ট করতে হবে।

২. ওপেন প্রোজেক্ট (Open Project) ডায়লগ বক্স এলে সেখান থেকে নির্দিষ্ট প্রোজেক্টটি সিলেক্ট করে ডায়লগ বক্সের ওপেন (Open) বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৩. প্রোজেক্টটি ওপেন হওয়ার পর ফরমসমূহ সাধারণত দেখা যায় না। ফরম আনার জন্য ভিউ (View) মেনু থেকে প্রোজেক্ট এক্সপ্লোরার (Project Explorer) সিলেক্ট করলে ডান পাশে প্রোজেক্ট এক্সপ্লোরার উইন্ডোটি স্থাপিত হবে।

৪. প্রোজেক্ট এক্সপ্লোরার উইন্ডোতে ফরমস (Forms) ফোল্ডারের বাম পাশের যোগচিহ্নে ক্লিক করলে প্রোজেক্টের সবগুলো ফরম দেখা যাবে।

৫. ফরমের তালিকা থেকে নির্দিষ্ট ফরমটির নামের উপর ডবল-ক্লিক করলে সেটি পর্দায় দেখা যাবে।

এটি একটি শূন্য ফরম। এই ফরমের উপর বিভিন্ন প্রকার কন্ট্রোল স্থাপন করে কাজ করতে হয়।
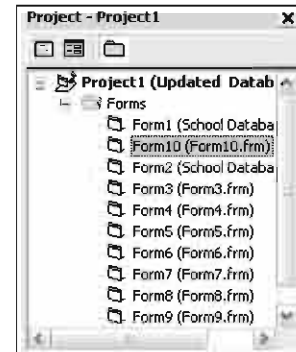
Input Box ফাংশন-এর ব্যবহার

১. Form1-এর উপর ডবল-ক্লিক করতে হবে।

২. কোড উইন্ডো প্রদর্শিত হলে তার ইভেন্ট প্রসিডিউর তালিকা থেকে Click সিলেক্ট করতে হবে।

৩. অতঃপর Private Sub Form_Click () Ges End Sub-এর মাঝখানে নিম্নোক্তভাবে কোড লিখতে হবে–

```
Private Sub Form_Click ()
  Dim EnterName As String
  EnterName=InputBox (“This is my name”)
  Print EnterName
End Sub
```
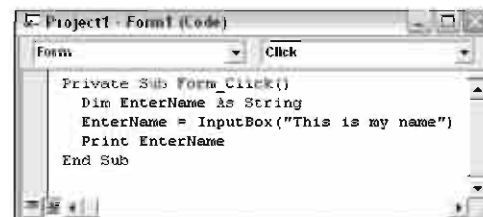
৪. এবার টুলবারে অবস্থিত Start বোতামে ক্লিক করে বা কী-বোর্ড থেকে F5 বোতাম চেপে প্রজেক্টটিকে রান করতে হবে।

৫. Form1 পর্দায় হাজির হবে। Form1-এর উপর মাউস দিয়ে ক্লিক করতে হবে।

৬. Project1 নামক একটি ডায়লগ বক্স হাজির হবে। তাতে This is my name প্রম্পটসহ একটি টেক্সট বক্স থাকবে। উক্ত টেক্সট বক্সে কিছু লিখে OK করলে Form -এ ঐ লেখাটি প্রদর্শিত হবে।

৭. এবার End বোতামে ক্লিক করে প্রজেক্টটিকে বন্ধ করতে হবে।

MsgBox ফাংশন-এর ব্যবহার

ভিজ্যুয়াল বেসিক চালু অবস্থায় না থাকলে এটি যথানিয়মে চালু করতে হবে। আর যদি চালু অবস্থায় এবং কোনো প্রজেক্ট কার্যরত অবস্থায় থাকে তবে–

১. নতুন একটি প্রজেক্ট খোলার জন্য File→New Project সিলেক্ট করতে হবে।

২. বর্তমান ফাইল সেভ করার জিজ্ঞাসা নিয়ে একটি ডায়লগ বক্স পর্দায় এলে তাতে প্রয়োজন অনুযায়ী Yes বা No ক্লিক করতে হবে।

৩. New Project ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হলে তাতে Standard EXE সিলেক্ট থাকা অবস্থায় OK বোতামে ক্লিক করতে হবে অথবা Standard EXE আইকনের উপর ডবল-ক্লিক করতে হবে।

- একটি ফরমসহ নতুন একটি প্রজেক্ট ওপেন হবে। উক্ত ফরমটির ডিফল্ট নাম হল Form1।

৪. Form1-এর উপর ডবল-ক্লিক করতে হবে। কোড উইন্ডো প্রদর্শিত হলে তার ডিফল্ট Load প্রসিডিউর-এ নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে–

```
Private sub Form_Load ()
   MsgBox "Good Morning Every Body"
End sub
```

৫. এবার টুলবারে অবস্থিত Start বোতামে ক্লিক করে কী-বোর্ড থেকে F5 বোতামে চেপে প্রজেক্টটিকে রান করালে Good Morning Every Body ডায়লগ বক্স পর্দায় হাজির হবে ।

৬. মেসেজ বক্সে অবস্থিত OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।

এবার End বোতামে ক্লিক করে প্রজেক্টটি বন্ধ করতে হবে।

বিভিন্ন কন্ট্রোল লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা

প্রোগ্রামে এমন কিছু কাজ উপস্থিত হয় যেগুলো একাধিক বার করার প্রয়োজন হয়। কোনো কাজ বার বার করার এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোনো কমান্ডকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কমান্ডের এই পুনরাবৃত্তিকে লুপিং (Looping) বলে। ভিজ্যুয়াল বেসিকে লুপিং করার জন্য বেশ কিছু স্টেটমেন্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে এ সমস্ত লুপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বলে এগুলোকে কন্ট্রোল লুপ বলা হয়।

Do .....Loop

প্রোগ্রামে একটি স্টেটমেন্ট ব্লককে (এক বা একাধিক কোড লাইন) বার বার আবর্তিত করার জন্য Do .....Loop স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ–

```
Do while Condition
Statememts
Loop
```

নিম্নে Do .....Loop ব্যবহার করে ১ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত যোগফল বের করার একটি প্রজেক্ট বর্ণনা করা হল।

১. যথানিয়মে ভিজ্যুয়াল বেসিক চালু করতে হবে।

২. New Project ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হলে তাতে Standard EXE থাকা অবস্থায় Open করতে হবে।

৩. লেবেল কন্ট্রোল সিলেক্ট করে ফরমের উপর ড্র্যাগ করে একটি লেবেল স্থাপন করতে হবে।

৪. ফরমে কন্ট্রোল স্থাপন করার জন্য নিচের এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে–

ক. টুল বক্স থেকে নির্দিষ্ট কন্ট্রোল সিলেক্ট করা।

খ. ফরমের যথাযথ অবস্থানে কন্ট্রোল স্থাপন করা।

গ. কন্ট্রোলের আকৃতি ঠিক করা।

ঘ. কন্ট্রোলের প্রোপার্টিসমূহ ঠিক করা।

৫. লেবেলের প্রোপার্টিজ উইন্ডোতে এর ক্যাপশন প্রোপার্টির মানের ঘরে Summation from 1 to টাইপ করতে হবে। প্রোপার্টিজ উইন্ডো আনার জন্য ভিউ মেনু থেকে প্রোপার্টিজ উইন্ডো সিলেক্ট করতে হবে। কোনো একটি কন্ট্রোল সিলেক্ট করলে ডান পাশে প্রোপার্টিজ উইন্ডোতে তার প্রোপার্টিসমূহ প্রদর্শিত হবে। টেক্সট অনুযায়ী লেবেলটির আকৃতি ছোট-বড় করতে হবে।

ভিজ্যুয়াল বেসিকের কিছু প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল

৬. এবার লেবেলের ডান পাশে একটি টেক্সট বক্স স্থাপন করতে হবে। প্রোপার্টিজ উইন্ডোতে এর টেক্সট প্রোপার্টির মানের ঘর থেকে Text1 লেখাটি মুছে ফেলতে হবে।

৭. ফরমে লেবেল ও টেক্সট বক্সের নিচে একটি কমান্ড বাটন স্থাপন করতে হবে। এর ক্যাপশন প্রোপার্টির মান পরিবর্তন করে Sum লিখতে হবে।

লেবেল ১ (Label1) কন্ট্রোলের প্রোপার্টিজ উইন্ডো থেকে ক্যাপশন পরিবর্তন করে Summation from 1 to করা হয়েছে

৮. লেবেল কন্ট্রোল সিলেক্ট করে ফরমে কমান্ড বাটনের নিচে ড্র্যাগ করে একটি লেবেল স্থাপন করতে হবে। এর ক্যাপশন প্রোপার্টির মানের ঘর থেকে Label2 লেখাটি মুছে ফেলতে হবে।

৯. এবার Sum বোতামটির উপর ডবল-ক্লিক করলে যে কোড উইন্ডো প্রদর্শিত হবে তার ইভেন্ট প্রসিডিউর তালিকা থেকে Click ইভেন্ট বাছাই করতে হবে।

অতঃপর নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে–

```
Private sub command1_click
   Dim i, sum As Integer
   sum = o
   i = 1
   do while i < = val (Text1.Text)
   sum = sum + i
   i = i + 1
   Loop
   Label2.Caption = str (sum)
End sub
```

এবার প্রোজেক্টটি রান করার জন্য টুলবারে অবস্থিত Start বোতামে ক্লিক করতে হবে। Form1 পর্দায় হাজির হবে। এখন টেক্সট বক্সে যে কোনো সংখ্যা টাইপ করে sum বোতামে ক্লিক করলে নিচের লেবেল ১ থেকে টাইপকৃত সংখ্যা পর্যন্ত যোগফল দেখাবে।

Do ... Loop-এ দেওয়া উদাহরণের ব্যাখ্যা

Private : কোনো Procedure-এর নামের পূর্বে Private ব্যবহার করা হলে যে মডিউলে Procedure-টি তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র সেই মডিউলের অন্যান্য Procedure এটাকে ব্যবহার করতে পারবে।

Sub: একটি প্রোগ্রামে একাধিক ইভেন্টের জন্য কোড লিখতে হয়। ভিজ্যুয়াল বেসিক-এ সব রকম ইভেন্টের কোড এক সাথে না লিখে প্রতিটি ইভেন্টের কোড আলাদা করে লিখতে হয়। প্রতিটি ইভেন্টকে আলাদা করে লেখার জন্য Sub লেখাটি ব্যবহার করা হয়।

Command1_Click : Form- G Command1 নামে যে বাটনটা সংযুক্ত করা হয়েছে, প্রোগ্রাম রান করার পর সে বাটনে ক্লিক করলে যে ইভেন্ট সংঘটিত হবে।

Dim : Dim হচ্ছে ভিজ্যুয়াল বেসিকের নিজস্ব শব্দ যা ভেরিয়েবল ঘোষণা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

i, sum : i I sum নামের দুটি ভেরিয়েবল (চলক)

As Integer : Integer ডাটা টাইপ হিসেবে declare করা।

sum = 0 : sum চলকের মান ০ ধরা হয়েছে।

i=1 : i চলকের মান ১ ধরা হয়েছে।

Do while : Do while লুপ শুরু

i < = val (Text1.Text) : Do while লুপের Condition। Condition সত্য হলে লুপের ভেতরের স্টেটমেন্ট কাজ করবে।

Text1.Text : Text1.Text হচ্ছে TextBox1-এ যে সংখ্যা টাইপ করা হবে সেই সংখ্যা

Val (Text1.Text) : TextBox1 থেকে প্রাপ্ত Text-কে value (মান) তে রূপান্তর। TextBox থেকে যে Text পাওয়া যায় তা String হিসেবে ধরা হয়। String কে সংখ্যায় নেওয়ার জন্য Val () ফাংশন ব্যবহার করা হয়।

লুপের Condition সত্য হলে Loop লেখার আগ পর্যন্ত Statement কাজ করবে। প্রোগ্রামের কন্ট্রোল Loop পর্যন্ত এসে আবার do while-এর Condition-এ ফিরে যাবে। Condition মিথ্যা হলে Loop লেখার নিচের কোড কাজ করে।

sum = sum + i : sum চলকে sum-এর পূর্বের মান এবং i-এর বর্তমান মানের যোগফল সেট হবে।

i = i + 1: i চলকের বর্তমান মান হবে পূর্বের মানের সাথে ১ যোগ করে।

Lable2.Caption : প্রোগ্রাম চলাকালীন সময় Lable 2-এর Caption (লেখা) পরিবর্তন করার জন্য

str (sum): sum নামক চলকে যে মান আছে তা str() ফাংশনের মাধ্যমে string-এ রূপান্তর। TextBox অথবা Label-এ লেখা পরিবর্তন করতে চাইলে লেখাটি string হিসেবে দিতে হয়। সংখ্যা (Integer/ long) টাইপের লেখা string-এ রূপান্তর করে না দিলে Error দেখাবে।

End sub : প্রতিটি ইভেন্ট প্রসিডিউর-এর সমাপ্তি বুঝানোর জন্য End sub লেখা হয়।

প্রোগ্রামটি রান করার পর টেক্সট বক্সে ২ টাইপ করে sum বাটনে ক্লিক করলে Private sub command1_Click ও End sub এর মধ্যবর্তী কোড কাজ করবে। প্রথমে sum এবং i এর মান যথাক্রমে ০ এবং ১ ধরা হবে। do while লুপের Condition-এ val (Text1.Text)-এর মান হবে ২. সেক্ষেত্রে Condition টি হবে ১<=২ যা সত্য। সুতরাং sum = sum+i এবং i= i+1 স্টেটমেন্ট কাজ করবে। sum এবং i এর মান হবে যথাক্রমে

sum = sum + i =0+1 =1

i=i+1 = 1+1 = 2

পরবর্তীতে যখন Condition চেক করবে তখন Condition হবে 2< = 2 যা সত্য; সুতরাং sum ও i এর মান হবে

sum = sum + i = 1+2=3

i= i+1 = 2+1= 3

তৃতীয়বার যখন Condition চেক করা হবে তখন Condition টি হবে 3<=2 যা মিথ্যা; সুতরাং লুপের ভেতরের কোড কাজ করবে না। Loop-এর নিচে Label 2-এর Caption পরিবর্তন হয়ে sum-এর মান 2 দেখাবে।

For Next

যখন ব্যবহারকারী জানে কতবার লুপ স্টেটমেন্ট কার্যকর করতে হবে তখন For.....Next লুপ ব্যবহার করা উত্তম। For.....Next লুপ একটি একটি চলক ব্যবহার করে যা লুপের প্রতিটি আবর্তনে একটি মান বাড়ায় বা কমায়। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ :

```
For courter = start To end [ step increment]
     statements
Next [counter]
```

নিম্নে For.....Next লুপ ব্যবহার করে ১ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত সংখ্যার গড় নির্ণয় করার একটি প্রজেক্ট বর্ণনা করা হয়েছে–

Do......Loop ব্যবহার করে যে প্রজেক্টটি তৈরি করা হয়েছে সে প্রজেক্টের Label1-এর ক্যাপশন পরিবর্তন করে Average for 1 to করতে হবে এবং Command Button-এর ক্যাপশন পরিবর্তন করে Average করতে হবে। অতঃপর Average বোতামের Click ইভেন্ট-এ নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে–

```
Private sub Command1_click ()
     Dim sum, avg As Double
     Dim i, j As Integer
     sum = o
     j= val (Text1.Text)
     For i = o To j
     sum = sum + i
     Next
     avg = sum / j
     Label2.Caption = str (avg)
End sub
```

এবার প্রজেক্ট রান করার জন্য টুলবারের start বোতামে ক্লিক করতে হবে। Form1-এর টেক্সট বক্সে যে কোনো সংখ্যা লিখে Average বোতামে ক্লিক করলে নিচে ১ থেকে টাইপ করা সংখ্যা পর্যন্ত সংখ্যার গড় দেখাবে।

For Next- এ দেওয়া উদাহরণের ব্যাখ্যা

এ প্রোগ্রামে avg এবং sum চলককে Double টাইপ হিসেবে declare করা হয়েছে কারণ avg এবং sum এর মান দশমিকে আসতে পারে।

For i = 1 to j: এখানে For ......Next লুপের নিয়মানুযায়ী i-এর মান এক থেকে শুরু করে j-এর মান যা হবে অর্থাৎ টেক্সট বক্সে যে সংখ্যা টাইপ করা হবে ততবার পর্যন্ত For ......Next লুপের ভেতরের কোড কাজ করবে। Next লেখাটি Execute করলে i-এর মান ১ বাড়াবে এবং For i = 2 To j লাইনে প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ফিরে যাবে। যদি j- এর মান ১ হয় সেক্ষেত্রে For ....Next লুপের অভ্যন্তরীণ কোড কাজ করবে না। Next লেখার নিচের লাইনগুলো কাজ করবে।

avg = sum/j : গড় বের করার জন্য sum চলকে রাখা সবগুলো সংখ্যার যোগফলকে j চলকে রাখা মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফল avg চলকে রাখা হয়েছে। Label 2 তে avg চলকে সংরক্ষিত সংখ্যাটি প্রদর্শন করা হয়েছে।

শর্তযুক্ত প্রোগ্রামিং

IF ....Then

এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট কোনো শর্তাধীনে কার্যকর করার জন্য IF ....Then ব্যবহার করা হয়। IF ....Then-এর সিনটেক্স নিম্নরূপ–

```
If condition Then
     Statements
End If
```

সাধারণভাবে condition-টি হল একটি তুলনার ভিত্তিতে প্রোগ্রাম রচনা করা। যেমন– কোনো পরীক্ষায় ৩৩ বা তার চেয়ে বেশি নম্বর পেলে পাস এবং ৩৩-এর কম নম্বর পেলে ফেল– এই শর্ত অনুযায়ী IF ....Then-এর সাহায্যে প্রোগ্রাম রচনা করার লক্ষ্যে ফরম ডিজাইন করার জন্য–

১. Form1-এ একটি লেবেল যুক্ত করতে হবে।
২. Label1-এর ক্যাপশন প্রোপার্টি থেকে Label1 লেখা মুছে Give your marks টাইপ করতে হবে।
৩. Label1-এর পাশে একটি টেক্সট বক্স স্থাপন করতে হবে।
৪. Text1-এর Text প্রোপার্টি থেকে Text1 লেখাটি মুছে ফেলতে হবে।
৫. Label1 ও Text1-এর নিচে একটি লেবেল স্থাপন করতে হবে।
৬. Label2-এর ক্যাপশন প্রোপার্টি থেকে Label2 লেখাটি মুছে ফেলতে হবে এবং Label2-কে মাউস পয়েন্টার দিয়ে টেনে বড় করতে হবে।
৭. Label2-এর নিচে একটি কমান্ড বাটন যুক্ত করতে হবে। কমান্ড বাটনের ক্যাপশন প্রোপার্টি থেকে Command1 মুছে Show Result লিখতে হবে।
৮. এবার Show Result বাটনের উপর ডবল-ক্লিক করে Command1-এর Click ইভেন্টে নিচের কোড লিখতে হবে–

```
Private Sub Command1_Click()
     Dim mark As Integer
     mark = Val(Text1.Text)
     Label2.Caption = "Failed"
     If (mark > 32) Then
     Label2.Caption = "You Have Passed"
     End If
End Sub
```

এবার প্রজেক্ট রান করার জন্য টুলবারের start বোতামে ক্লিক করতে হবে। Form1-এর টেক্সট বক্সে যে কোনো সংখ্যা লিখে Show Result বোতামে ক্লিক করলে নিচে শর্ত অনুযায়ী পাস অথবা ফেল দেখাবে।

If...Then...Else

If.....Then.....Else -এর গঠন নিম্নরূপ–

```
If condition1 Then
     [statemenblock 1]
ElseIf Condition2 Then
     [statemetblock  2]
Else
     [Ststemenblock n]
End If
```

ভিজ্যুয়াল বেসিক প্রথমে condition1 পরীক্ষা করে দেখে। যদি এটা মিথ্যা পায় তবে ভিজ্যুয়াল বেসিক condition2 এর দিকে অগ্রসর হয়। এভাবে প্রতিটি condition পরীক্ষা করে অগ্রসর হতে থাকে। যখন কোনো condition সত্য

পায় তখন ভিজ্যুয়াল বেসিক সংশ্লিষ্ট statementblock কার্যকর করে।

If.....Then.....Else ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনার লক্ষ্যে IF ....Then উদাহরণের মতোই একটি ফরম ডিজাইন করতে হবে। ফর্মটির Label1-এর ক্যাপশন প্রোপার্টি পরিবর্তন করে Type a number টাইপ করতে হবে। কমান্ড বাটনের ক্যাপশন প্রোপার্টি পরিবর্তন করে Even (জোড়)/Odd (বিজোড়) টাইপ করতে হবে।

এবার Even/Odd বাটনের উপর ডবল-ক্লিক করে Command1-এর Click ইভেন্টে নিচের কোড লিখতে হবে–

```
Private Sub Command1_Click()
     Dim mark As Integer
     mark = Val(Text1.Text)
     If (mark Mod 2 = 0) Then
     Label2.Caption = "Even"
     Else
     Label2.Caption = "Odd"
     End If
End Sub
```

এবার প্রজেক্ট রান করার জন্য টুলবারের start বোতামে ক্লিক করতে হবে। Form1-এর টেক্সট বক্সে জোড় অথবা বিজোড় সংখ্যা টাইপ করে Even/Odd বোতামে ক্লিক করলে নিচে শর্ত অনুযায়ী Even (জোড়)/Odd (বিজোড়) দেখাবে।

Select Case

অনেক স্টেটমেন্ট ব্লক থেকে একটি স্টেটমেন্ট ব্লক কার্যকর করার জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকে If.....Then.....Else-এর ন্যায় Select Case স্ট্রাকচার ব্যবহার করা যায়। If.....Then.....Else এর সাথে Select Case-এর উল্লেখযোগ্য মিল রয়েছে। এর সিনটেক্স হল–

```
Select Case testexpression
     Case [expressionlist]
     [statementblock-1]
     Case [expressionlist2]
     [statemenblock-2]
     Case Else
     [statemntblock-n]
End Select
```

প্রতিটি expressionlist হল এক বা একাধিক মানের একটি লিস্ট। যদি একটি লিস্টে একের অধিক মান থাকে তবে মানসমূহ কমা দিয়ে আলাদা করা হয়। প্রতিটি statement block শূন্য বা অধিক স্টেটমেন্ট ধারণ করে। পরবর্তীতে মূল প্রোজেক্টে এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

প্রজেক্ট : অগ্রগামী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভিজ্যুয়াল বেসিক এবং Microsoft Access-এর সমন্বয়ে অগ্রগামী বিদ্যালয় নামে একটি প্রজেক্ট তৈরি করা হবে। এ প্রজেক্টের মাধ্যমে অগ্রগামী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের তথ্য ছাড়াও শিক্ষকদের তথ্য, পরীক্ষার ফলাফল এবং প্রত্যেকের বকেয়া পরিশোধের তথ্য দেখা যাবে। প্রজেক্টটিকে দুটি অংশে বর্ণনা করা হয়েছে–ডাটাবেজ অংশ এবং প্রোগ্রামিং অংশ ।

ডাটাবেজ অংশ

১. ডাটাবেজ তৈরির জন্য প্রথমেই Microsoft Access নিয়ম মতো চালু করতে হবে । School Database নামে একটি ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। School Database-টি C:\Project\School Database.mdb-এই Address-এ সেভ করতে হবে।

২. School Database-এ Student9 নামে একটি টেবিল তৈরি করতে হবে যার Design হবে নিম্নরূপ–

Field Name	Data Type
StudentID	Text
Student_Name	Text
Father_Name	Text
Class	Text
Roll_Number	Number
Birth_Date	Date/Time

৩. Student9-এর ডাটাসেট হবে নিম্নরূপ–

Student9

StudentID	Student_Name	Father_Name	Class	Roll_Number	Birth_Date
111	Niaz Ahmed	Farid Ahmed	Nine	1	10/8/1995
112	Showel Hossain	Kowel Hossain	Nine	2	11/18/1994
113	Siam Khan	Arju Khan	Nine	3	9/26/1994
114	Shajib Ahmed	Kamal Ahmed	Nine	4	1/7/1995
115	Anwar Hossain	Sanowar Hossain	Nine	5	9/12/1994
116	Sultana Sayeda	Miraz Ahmed	Nine	6	12/12/1993
117	Masrun Nigar	Hasan Ashrafur	Nine	7	1/7/1995
118	Emdadul Islam	Mirazur Rahman	Nine	8	8/23/1994
119	Akila Shams	Hamidul Islam	Nine	9	3/9/1994
120	Azizul Haque	Sabbir Ahmed	Nine	10	12/31/1995

৪. School Database-এ Student10, Payment9, Payment10, Teacher, Result নামে আরও ৫টি টেবিল তৈরি করতে হবে ।

৫. Student10 টেবিলের Design হবে নিম্নরূপ–

Student10 : Table

Field Name	Data Type
StudentID	Text
Student_Name	Text
Father_Name	Text
Class	Text
Roll_Number	Number
Birth_Date	Date/Time

৬. Student10-এর ডাটাসেট হবে নিম্নরূপ–

Student10

StudentID	Student_Name	Father_Name	Class	Roll_Number	Birth_Date
221	Azad Rahman	Mazed Rahman	Ten	1	5/11/1993
222	Shahed Khan	Nabed Khan	Ten	2	10/24/1992
223	Babul Islam	Jahid Islam	Ten	3	9/14/1992
224	Nazrul Islam	Faruk Islam	Ten	4	12/29/1993
225	Rudra Shams	Jahir Shams	Ten	5	8/12/1993
226	Abdur Rahim	Zahangir Kabir	Ten	6	11/5/1992
227	Monir Khan	Khaled Khan	Ten	7	2/15/1992
228	Jahanara Islam	Naser Uddin	Ten	8	7/12/1993
229	Shuvro Saha	Bikash Saha	Ten	9	5/18/1993
230	Nadia Islam	Jamal Uddin	Ten	10	6/6/1991

৭. Payment9 টেবিলের Design হবে নিম্নরূপ–

Payment9 : Table

Field Name	Data Type
StudentID	Text
Student_Name	Text
Class	Text
January	Number
February	Number
March	Number
April	Number
May	Number
June	Number
July	Number
August	Number
September	Number
October	Number
November	Number
December	Number

৮. Payment9 টেবিলের ডাটাসেট হবে নিম্নরূপ–

Payment9

StudentID	Student_Name	Class	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
111	Niaz Ahmed	Nine	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
112	Showel Hossain	Nine	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
113	Siam Khan	Nine	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
114	Shajib Ahmed	Nine	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
115	Anwar Hossain	Nine	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
116	Sultana Sayeda	Nine	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Masrun Nigar	Nine	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
118	Emdadul Islam	Nine	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
119	Akila Shams	Nine	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
120	Azizul Haque	Nine	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

৯. Payment10 টেবিলের Design হবে নিম্নরূপ–

Payment10 : Table

Field Name	Data Type
StudentID	Text
Student_Name	Text
Class	Text
January	Number
February	Number
March	Number
April	Number
May	Number
June	Number
July	Number
August	Number
September	Number
October	Number
November	Number
December	Number

১০. Payment10 টেবিলের ডাটাসেট হবে নিম্নরূপ–

Payment10														
StudentID	Student_Name	Class	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
221	Azad Rahman	Ten	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
222	Shahed Khan	Ten	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
223	Babul Islam	Ten	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
224	Nazrul Islam	Ten	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
225	Rudra Shams	Ten	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
226	Abdur Rahim	Ten	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
227	Monir Khan	Ten	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
228	Jahanara Islam	Ten	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
229	Shuvro Saha	Ten	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0
230	Nadia Islam	Ten	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0

১১. Teacher টেবিলের Design হবে নিম্নরূপ–

Field Name	Data Type
TeacherID	Text
Teacher_Name	Text
Father_Name	Text
Adress	Text
Birth_Date	Date/Time
Married	Text
Religion	Text
Post	Text
Join_Date	Date/Time
Subjects	Text

১২. Teacher টেবিলের ডাটাসেট হবে নিম্নরূপ–

Teacher									
TeacherID	Teacher_Name	Father_Name	Adress	Birth_Date	Married	Religion	Post	Join_Date	Subjects
1010	Imran Khan	Dedarul Khan	...	10/15/1952	Married	Muslim	Headmaster	8/28/1977	Bangla, English
1015	Habibur Rahman	Jamal Ahmed	...	7/21/1950	Married	Muslim	Asst. Headmaster	7/15/1978	Math.
1135	Mehjabin Bahar	Ashiqur Rahman	...	9/2/1953	Married	Muslim	Asst. Teacher	1/2/1980	Phisics, Chemistry
1215	Golam Hafiz	Fahad Ahmed	.	12/19/1956	Single	Muslim	Asst. Teacher	10/18/1982	History, Social Science
1323	Miraz Ahmed	Tuhin Talukder	.	8/14/1960	Married	Muslim	Asst. Teacher	11/16/1985	Accounting

১৩. Result টেবিলের Design হবে নিম্নরূপ–

Field Name	Data Type
Year	Number
Candidates	Number
Passed	Number
GoldenA+	Number
A+	Number
A	Number
A-	Number
B+	Number
B	Number
B-	Number
C+	Number
C	Number
C-	Number
F	Number

১৪. Result টেবিলের ডাটাসেট হবে নিম্নরূপ–

Result

Year	Candidates	Passed	GoldenA+	A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	F
2003	800	750	0	15	122	211	202	63	17	32	80	8	50
2004	700	665	2	23	157	223	122	131	14	7	1	0	35
2005	750	720	8	45	200	256	89	43	19	45	15	0	30
2006	600	585	15	56	168	302	12	19	0	8	7	3	15
2007	680	680	20	72	189	278	96	13	12	0	0	0	0

প্রোগ্রামিং অংশ

১. প্রথমে নিয়ম মতো ভিজুয়াল বেসিক চালু করতে হবে।

২. New Project ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হলে তাতে Standard EXE সিলেক্ট থাকা অবস্থায় Open-এ ক্লিক করতে হবে।

৩. Form1-এ একটি লেবেল, দুটি কমান্ড বাটন ও একটি পিকচার বক্স সংযুক্ত করতে হবে।

৪. লেবেল, কমান্ড বাটন ও পিকচার বক্সের জন্য নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেট করতে হবে।

Label1:

Caption: Agragami High School

Font: Times New Roman Size: 20 Style: Bold

Command1:

Caption: School Database

Font: Palatino Linotype Size: 14 Style: Bold

Command2:

Caption: Exit

Font: Arial Size: 10 Style: Regular

Picture1:

Picture: C:\Project\School.bmp

৫. মেনু তৈরির জন্য ফরমের উপর রাইট ক্লিক করে Menu Editor সিলেক্ট করতে হবে।

৬. মেনু এডিটরের Caption টেক্সবক্সে Information এবং Name টেক্সট বক্সে infomenu টাইপ করতে হবে।

৭. Next বাটনে ক্লিক করে → এই বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৮. Caption টেক্সটবক্সে Students of Class এবং Name টেক্সটবক্সে sub1 টাইপ করতে হবে।

৯. Next বাটনে ক্লিক করে → এই বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১০. Caption টেক্সট বক্সে Nine এবং Name টেক্সট বক্সে sub1sub1 টাইপ করতে হবে।

১১. Next বাটনে ক্লিক করে Caption টেক্সট বক্সে Ten এবং Name টেক্সট বক্সে sub1sub2 টাইপ করতে হবে।

১২. Next বাটনে ক্লিক করে ← বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৩. Caption টেক্সট বক্সে Dues of Class এবং Name টেক্সট বক্সে sub2 টাইপ করতে হবে।

১৪. Next বাটনে ক্লিক করে → এই বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৫. Caption টেক্সট বক্সে Nine এবং Name টেক্সট বক্সে sub2sub1 টাইপ করতে হবে।

১৬. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। Caption টেক্সট বক্সে Ten এবং Name টেক্সট বক্সে sub2sub2 টাইপ করতে হবে।

১৭. Next বাটনে ক্লিক করে ← এই বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৮. Caption টেক্সট বক্সে Teacher এবং Name টেক্স বক্সে sub3 টাইপ করতে হবে ।

১৯. Next বাটনে ক্লিক করে Caption টেক্সট বক্সে Results এবং Name টেক্সট বক্সে sub4 টাইপ করতে হবে । তারপর Next বাটনে ক্লিক করে Caption টেক্সট বক্সে Exit এবং Name টেক্সট বক্সে sub5 টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করতে হবে ।

২০. ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর Form1 দেখতে নিম্নরূপ হবে :

২১. এবার ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে View → Code সিলেক্ট করে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে–

```
Private Sub Command1_Click() 'Command1 বাটনে ক্লিক করলে Form2 প্রদর্শন করবে
    Form2.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()        'Command2 বাটনে ক্লিক করলে প্রজেক্ট বন্ধ হবে
    End
End Sub
Private Sub sub1sub1_Click()        'Information মেনু থেকে Student's Of Class
    Form5.Show                      ' → Nine সিলেক্ট করলে Form5 প্রদর্শন করবে
End Sub
Private Sub sub1sub2_Click()        'Information মেনু থেকে Student's Of Class
    Form6.Show                      ' → Ten সিলেক্ট করলে Form6 প্রদর্শন করবে
End Sub
Private Sub sub2sub1_Click()        'Information মেনু থেকে Dues Of Class
    Form7.Show                      ' → Nine সিলেক্ট করলে Form7 প্রদর্শন করবে
End Sub
Private Sub sub2sub2_Click()        'Information মেনু থেকে Dues Of Class
    Form8.Show                      ' → Ten সিলেক্ট করলে Form8 প্রদর্শন করবে
```

```
End Sub
Private Sub sub3_Click()          'Information মেনু থেকে Teacher
    Form9.Show                    'সিলেক্ট করলে Form9 প্রদর্শন করবে
End Sub
Private Sub sub4_Click()          'Information মেনু থেকে Result
    Form10.Show                   'সিলেক্ট করলে Form10 প্রদর্শন করবে
End Sub
Private Sub sub5_Click()          'Information মেনু থেকে Exit
    End                           'সিলেক্ট করলে প্রজেক্ট বন্ধ হবে
End Sub
```

২২. নতুন একটি ফরমের জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Project→ Add Form সিলেক্ট করতে হবে। Add Form ডায়লগ বক্স এলে Form সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় ওপেন বোতামে ক্লিক করতে হবে।

২৩. Form2- তে একটি লেবেল, একটি কম্বো বক্স ও দু'টি Command Button যুক্ত করতে হবে।

২৪. লেবেল, কম্বোবক্স ও কমান্ড বাটনের জন্য নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেট করতে হবে–

Label1:
    Caption: Please Select Information Type
    Font: Palatino Linotype   Size: 18   Style: Italic

Combo1:
    Font: Palatino Linotype   Size: 14   Style: Regular
    Text: Information of

Command1:
    Caption: Back
    Font: Palatino Linotype   Size: 16   Style: Bold

Command2:
    Caption: Exit
    Font: Palatino Linotype   Size: 16   Style: Bold

ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর Form2 দেখতে নিম্নরূপ হবে–

২৫. এবার ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে View→Code সিলেক্ট করে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে।

```
Private Sub Command1_Click()          'Command1 বাটনে ক্লিক করলে পর্দায় দৃশ্যমান ফরমটি বন্ধ হবে।
   Unload Me                          'ফরমটি বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এর সমস্ত অবজেক্ট ও ইভেন্টের জন্য
End Sub                               'মেমোরিতে যে ডাটা সংরক্ষিত হয়েছিল তা মুছে যাবে।
Private Sub Command2_Click()          'Command2 বাটনে ক্লিক করলে প্রজেক্ট বন্ধ হবে
   End                                'যে প্রোজেক্ট রান করা হয়েছে তার সবগুলো ফরম বন্ধ হয়ে যাবে।
End Sub
Private Sub Form_Load()               'প্রোগ্রাম রান করলে ফরম লোড হওয়ার সময় এর অন্তর্ভুক্ত কোডসমূহ
                                      'কাজ করা বোঝায়।
   Combo1.AddItem "Students"          'AddItem হল একটি মেথড। এখানে কম্বোবক্সে
   Combo1.AddItem "Dues"              'Students নামে একটি স্ট্রিং আইটেম হিসেবে যোগ হবে।
   Combo1.AddItem "Teachers"
   Combo1.AddItem "Results"
   End Sub
Private Sub Combo1_Click()            'কম্বোবক্স থেকে কোনো আইটেম সিলেক্ট করলে এর অন্তর্ভুক্ত
                                      'কোডসমূহ কাজ করবে।
Select Case Combo1.ListIndex          'কম্বোবক্স থেকে যে আইটেম সিলেক্ট করা হবে তার ইনডেক্স বা
                                      'ক্রমিক নম্বর। এখানে ৪টি আইটেমের জন্য ইনডেক্সসমূহ হচ্ছে–
                                      '০, ১, ২, ৩
   Case  'Students                    'ComboBox  থেকে ১ম Item সিলেক্ট করলে
      Form2.Hide                      'Form2 নামে যে ফরমটি আছে পর্দায় সেটি দৃশ্যমান থাকলে অদৃশ্য
                                      হয়ে 'যাবে। কিন্তু ফরম Form2-এর অবজেক্ট ও ইভেন্টসমূহের জন্য
                                      মেমোরিতে 'যে তথ্য জমা হয়েছিল তা মুছে যাবে না।
   Form3.Show                         'Form3 পর্দায় প্রদর্শন করবে।
   Case 1  'Payments                  'ComboBox  থেকে ২য় Item সিলেক্ট করলে
   Form2.Hide
      Form4.Show
   Case 2  'Teachers                  'ComboBox  থেকে ৩য় Item সিলেক্ট করলে
      Form2.Hide
        Form9.Show
   Case 3  'S. S. C. Results          'ComboBox  থেকে ৪র্থ Item সিলেক্ট করলে
      Form2.Hide
      Form10.Show
   End Select
End Sub
```

২৬. ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Project→Add Form সিলেক্ট করে একটি নতুন ফরম সংযোজন করতে হবে।

২৭. Form3- তে একটি লেবেল, একটি কম্বোবক্স ও দুটি কমান্ড বাটন যুক্ত করতে হবে।

২৮. লেবেল, কম্বোবক্স ও কমান্ড বাটনের জন্য নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেট করতে হবে।

Label1:

Caption: Student's Information

Font: Times New Roman Size: 20 Style: Bold Italic

Combo1:

Font: Palatino Linotype Size: 14 Style: Regular

Text: Select Class

Command1:

Caption: Back

Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold

Command2:

Caption: Exit

Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold

ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর Form3 দেখতে নিম্নরূপ হবে–

২৯. এখন ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে View→Code সিলেক্ট করে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে।

```
Private Sub Command1_Click()            ' Command1 বাটনে ক্লিক করলে Form2 প্রদর্শন করবে
    Unload Me
    Form2.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()            'Command2 বাটনে ক্লিক করলে প্রজেক্ট বন্ধ হবে
    End
End Sub
Private Sub Form_Load()                 'ComboBox- এ ২টি Item যুক্ত হবে
    Combo1.AddItem "Nine"
    Combo1.AddItem "Ten"
End Sub
Private Sub Combo1_Click()
Select Case Combo1.ListIndex
    Case 0  'Nine                       'ComboBox থেকে ১ম Item সিলেক্ট করলে
```

```
    Form3.Hide                          'Form5 প্রদর্শন করবে
    Form5.Show
  Case 1  'Ten                          'ComboBox থেকে ২য় Item সিলেক্ট করলে
    Form3.Hide                          'Form6 প্রদর্শন করবে
    Form6.Show
    End Select
End Sub
```

৩০. ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Project →Add Form সিলেক্ট করে একটি নতুন ফরম সংযোজন করতে হবে।

৩১. Form 4- এ একটি লেবেল, একটি কম্বোবক্স ও দুটি কমান্ড বাটন সংযুক্ত করতে হবে।

৩২. লেবেল, কম্বোবক্স ও কমান্ড বাটনের জন্য নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেট করতে হবে।

Label1:
 Caption: Dues Information
 Font: Times New Roman Size: 20 Style: Bold Italic

Combo1:
 Font: Palatino Linotype Size: 14 Style: Regular
 Text: Select Class

Command1:
 Caption: Back
 Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold

Command2:
 Caption: Exit
 Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold
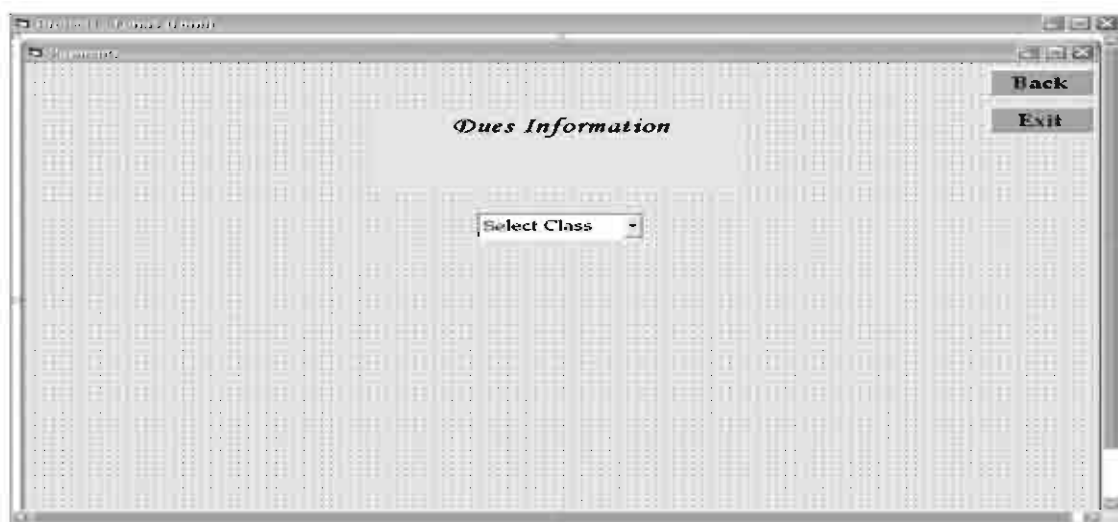
ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর Form4 দেখতে নিম্নরূপ হবে–

৩৩. এবার ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে View →Code সিলেক্ট করে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে।

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
     Unload Me
     Form2.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()
     End
End Sub
Private Sub Form_Load()
     Combo1.AddItem "Nine"
     Combo1.AddItem "Ten"
End Sub
Private Sub Combo1_Click()
Select Case Combo1.ListIndex
    Case 0  'Nine
        Form4.Hide
        Form7.Show
    Case 1  'Ten
        Form4.Hide
        Form8.Show
    End Select
End Sub
```

৩৪. এখন ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Project→Add Form সিলেক্ট করে পর পর দুটি ফরম সংযোজন করতে হবে। ফরমগুলোর নাম হবে Form5 Ges Form6 ।

৩৫. Form5 এবং Form6-এর ডিজাইন হবে একই রকম কিন্তু কোড হবে কিছুটা ভিন্ন। তাই Form5- এ ডিজাইন সম্পন্ন করে Form5- এর সবকিছু Form6- এ কপি করতে হবে ।

৩৬. টুলবক্সে Adodc এবং DataGrid সংযুক্ত করার জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Project→Components সিলেক্ট করতে হবে। Components ডায়লগ বক্সের Control থেকে Microsoft ADO Data Control 6.0 Ges Microsoft Data Grid Control 6.0 সিলেক্ট করে OK ক্লিক করতে হবে।

৩৭. এবার Form5-এ টুলবক্স হতে ২টি লেবেল, একটি টেক্সট বক্স, চারটি Command বাটন, একটি ফ্রেম, একটি Adodc এবং একটি DataGrid কন্ট্রোল সংযুক্ত করতে হবে।

৩৮. Form5-এ সংযুক্ত অবজেক্ট-সমূহের জন্য নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেট করতে হবে–

Label1:
    Caption: Student Information (Class Nine)
    Font: Times New Roman   Size: 20   Style: Bold Italic
Label2:
    Caption: Input Here Student's Name to Search
    Font: Palatino Linotype   Size: 11   Style: Bold
Text1:
    Font: Palatino Linotype Size: 11 Style: Bold
    Text:
(Name): Text57
Command1:
Caption: Search
Font: Palatino Linotype   Size: 11   Style: Bold
Command2:

Caption: Back
Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold

Command3:
Caption: Exit
Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold

Command4:
Caption: Table (All Data)
Font: Palatino Linotype Size: 11 Style: Bold

DataGrid1:
Font: Palatino Linotype Size: 10 Style: Bold

Frame1:
Caption:
Visible: False

৩৯. Gevi Frame1-এর ভেতর ৭টি লেবেল এবং ৫৬টি টেক্সট বক্স স্থাপন করতে হবে। টেক্সট বক্সগুলো সারি অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজিয়ে বসাতে হবে।

৪০. Frame1-এ সংযুক্ত লেবেলগুলোর Caption প্রপার্টি নিচের মতো করে পরিবর্তন করতে হবে।

Label2:
Caption: Student ID
Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label3:
Caption: Student's Name
Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label 4:
Caption: Father's Name
Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label5:
Caption: Class
Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label 6:
Caption: Roll Number
Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label 7:
Caption: Birth Date
Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label 8:
Caption: Age Today
Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

৪১. প্রতিটি টেক্সট বক্সের টেক্সট প্রপার্টি হতে টেক্সট মুছে ফেলতে হবে। Frame1-এর প্রতিটি Textbox-এর Font প্রপার্টি পরিবর্তন করে নিচের মতো করতে হবে।

Font: MS Sars Serif Size: 10 Style: Bold

৪২. ভিজ্যুয়াল বেসিকের সাথে Microsoft Access-এর Connection দেওয়ার জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু

থেকে Project→References সিলেক্ট করতে হবে। Available References থেকে Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Library সিলেক্ট করে OK ক্লিক করতে হবে।

ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর Form5 দেখতে নিম্নরূপ হবে–

৪৩. এবার ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে View"Code সিলেক্ট করে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে।

```
Dim cnn As New ADODB.Connection          'ভিজ্যুয়াল বেসিকের সাথে Provider-এর মাধ্যমে
                                         'মাইক্রোসফট এক্সেসের নির্দিষ্ট ডাটাবেজের সাথে যুক্ত করার মাধ্যম।
Dim rs As New ADODB.Recordset            'মাইক্রোসফট এক্সেসের ডাটাবেজ থেকে প্রাপ্ত কোনো একটি টেবিলের
                                         'ডাটা সাময়িকভাবে ধারণ করার মাধ্যম।
Private Sub Command1_Click()             'ডাটাবেজের সাথে Connect করা, ডাটাবেজ থেকে ডাটা Adodc1-এর
Frame1.Visible = False                   'মাধ্যমে DataGrid1-এ প্রদর্শন করা।
If (Text57.Text <> "") Then              'যদি TextBox57-এ Empty টেক্সট না থাকে তবে
Dim sql As String
 sql = "Select Student9.StudentID, Student9.Student_Name,
   Student9.Father_Name, Student9.Class, Student9.Roll_Number,
   Student9.Birth_Date from Student9 Where Student9.Student_Name like '"&
   Text57.Text &"%'"
                                         'ডাটাবেজ থেকে ডাটা রিড করার পদ্ধতি।
                                         'এখানে "& Text57.Text &" হচ্ছে
                                         'TextBox57 থেকে যে টেক্সট পাওয়া যাবে সেই Text
                                         'সাধারণত ডবল কোটেশনের ভেতরের লেখাকে স্ট্রিং হিসেবে ধরা হয়।
                                         'স্ট্রিংয়ের ভেতরে মেথড বোঝানোর জন্য এভাবে লিখতে হয়।
Adodc1.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data
   Source=C:\Project\School Database.mdb; Persist Security Info=False"
                                         'মাইক্রোসফট এক্সেসের নির্দিষ্ট ডাটাবেজের সাথে Provider-এর
                                         'মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল বেসিককে যুক্ত করার স্ট্রিং।
Adodc1.RecordSource = sql                'Adodc1-কে ডাটাবেজের উৎসের সাথে সংযুক্ত করা।
Set DataGrid1.DataSource = Adodc1 'Adodc1-এর মাধ্যমে DataGrid1-এ প্রদর্শনের জন্য ডাটার উৎস
```

```
                                                 'নির্ধারণ করা।
 Adodc1.Refresh                                  'Refresh একটি মেথড। এটি ব্যবহার করা হয় আপটুডেট ডাটার জন্য।
 DataGrid1.Visible = True
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me
Form3.Show
End Sub
Private Sub Command3_Click()
End
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Frame1.Visible = True                            'Frame1-কে  Form-এ দৃশ্যমান করা
DataGrid1.Visible = False                        'DataGrid1-কে Form-এ অদৃশ্য করা
End Sub
Private Sub Form_Load()
With cnn                                         'cnn এর মাধ্যমে ডাটাবেজের সাথে Connect করা
                                                 'এবং School Database.mdb active করা
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
End With
With rs                                          'rs এর মাধ্যমে ডাটাবেজ থেকে Student9 টেবিল Open করা
   .Open "Student9", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
End With
With rs
    Text1.Text = .Fields(0)                      '.Fields(0) দ্বারা Open করা টেবিল-এর ১ম
  Text2.Text = .Fields(1)                        'কলামের ১ম সারির তথ্য নির্দেশ করে
   Text3.Text = .Fields(2)
    Text4.Text = .Fields(3)                      'Text মেথডের মাধ্যমে TextBox4-এ .Fields(3) থেকে পাওয়া
                                                 'টেক্সট্ সেট করবে
   Text5.Text = .Fields(4)
    Text6.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext                                      'Active করা টেবিল-এর এক সারি থেকে পরবর্তী সারিতে গমন
Text8.Text = .Fields(0)                          '.Fields(0) দ্বারা Open করা টেবিল-এর ১ম কলামের
Text9.Text = .Fields(1)                          '২য় সারির তথ্য নির্দেশ করে
Text10.Text = .Fields(2)
Text11.Text = .Fields(3)
Text12.Text = .Fields(4)
Text13.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
Text15.Text = .Fields(0)
Text16.Text = .Fields(1)
Text17.Text = .Fields(2)
Text18.Text = .Fields(3)
Text19.Text = .Fields(4)
Text20.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
```

```
Text22.Text = .Fields(0)
Text23.Text = .Fields(1)
Text24.Text = .Fields(2)
Text25.Text = .Fields(3)
Text26.Text = .Fields(4)
Text27.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
Text29.Text = .Fields(0)
Text30.Text = .Fields(1)
Text31.Text = .Fields(2)
Text32.Text = .Fields(3)
Text33.Text = .Fields(4)
Text34.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
Text36.Text = .Fields(0)
Text37.Text = .Fields(1)
Text38.Text = .Fields(2)
Text39.Text = .Fields(3)
Text40.Text = .Fields(4)
Text41.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
Text43.Text = .Fields(0)
Text44.Text = .Fields(1)
Text45.Text = .Fields(2)
Text46.Text = .Fields(3)
Text47.Text = .Fields(4)
Text48.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
Text50.Text = .Fields(0)
Text51.Text = .Fields(1)
Text52.Text = .Fields(2)
Text53.Text = .Fields(3)
Text54.Text = .Fields(4)
Text55.Text = .Fields(5)
End With

Dim tdate(10) As Date
tdate(0) = CDate(Text6.Text)          'টেক্সট বক্স ৬ থেকে পাওয়া String কে CDate() ফাংশনের মাধ্যমে
tdate(1) = CDate(Text13.Text)         'Date-এ রূপান্তর করে tdate চলকে রাখা।
tdate(2) = CDate(Text20.Text)
tdate(3) = CDate(Text27.Text)
tdate(4) = CDate(Text34.Text)
tdate(5) = CDate(Text41.Text)
tdate(6) = CDate(Text48.Text)
tdate(7) = CDate(Text55.Text)
Dim i, age(10), big, small(10) As Integer
big = Year(Date)
For i=0 To 7
  small(i) = Year(tdate(i)) 'Date-এর চলক থেকে শুধু সাল নিয়ে Integer হিসেবে define
```

```
     age(i) = big - small(i)
Next

Text7.Text = CStr(age(0)) + "  years"
                                    'age(0) একটি Integer টাইপের চলকের ১ম Element। age(0)'চলকের সংরক্ষিত
                                    মানকে CStr() ফাংশন ব্যবহার করে String-এ 'রূপান্তর করা হয়েছে । রূপান্তরিত String
                                    -এর সাথে years 'লেখাটি(String) যোগ করা হয়েছে । সম্পূর্ণ লেখা(String)
                                    'TextBox7-এ প্রদর্শনের জন্য Text মেথড ব্যবহার করা হয়েছে ।
Text14.Text = CStr(age(1)) + "  years"
Text21.Text = CStr(age(2)) + "  years"
Text28.Text = CStr(age(3)) + "  years"
Text35.Text = CStr(age(4)) + "  years"
Text42.Text = CStr(age(5)) + "  years"
Text49.Text = CStr(age(6)) + "  years"
Text56.Text = CStr(age(7)) + "  years"
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 'প্রোগ্রাম রান করার পর পর্দায় যে ফরমটি দৃশ্যমান থাকে
                                            'সেটি বন্ধ করলে এই প্রসিডিউরের কোড কাজ করবে ।
     rs.Close                               'Form বন্ধ করার সাথে সাথে ডাটাবেজের সংযোগ
                                            'বিচ্ছিন্ন করার জন্য কানেকশন এবং রেকর্ড সেট বন্ধ করা
     cnn.Close
End Sub
```

বিঃদ্রঃ

ক. Adodc হচ্ছে ভিজ্যুয়াল বেসিকের সাথে মাইক্রোসফট এক্সেসকে সংযুক্ত করে ডাটাবেজ থেকে ডাটা DataGrid -এ পৌঁছে দেওয়ার একটি অবজেক্ট ।

খ. DataGrid হচ্ছে ডাটাবেজ থেকে প্রাপ্ত ডাটা ফরমে প্রদর্শনের একটি টুল ।

গ. মাইক্রোসফটের এক্সেস ডাটাবেজটি Jet ইঞ্জিন দিয়ে তৈরি এবং OLEDB একটি Data Access Method. Provider-এর কাজ হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেসের নির্দিষ্ট ডাটাবেজে প্রবেশ করা ।

৪৪. এখন Form5-এর সবকিছু Form6-এ কপি করার জন্য Form5 একটিভ থাকা অবস্থায় ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Edit→Select All সিলেক্ট করতে হবে । পুনরায় মেনু থেকে Edit→Copy সিলেক্ট করতে হবে । এখন Form6-এ গিয়ে মেনু থেকে Edit→Paste সিলেক্ট করলে Form5-এর সবকিছু Form6 -এ কপি হবে ।

৪৫. Form6-এ Label1-এর Caption প্রপার্টি পরিবর্তন করে Student's Information (Class: Ten) করতে হবে ।

৪৬. Form 6-এর Code উইন্ডোতে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে ।

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Private Sub Command1_Click()
Frame1.Visible = False
If (Text71.Text <> "") Then
Dim sql As String
sql = "Select Student10.StudentID,Student10.Student_Name,
```

```
Student10.Father_Name, Student10.Class, Student10.Roll_Number,
   Student10.Birth_Date from Student10 Where Student10.Student_Name like
   '"   & Text71.Text & "%'"
Adodc1.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data
   Source=C:\Project\School Database.mdb; Persist Security Info=False"
Adodc1.RecordSource = sql
    Set DataGrid1.DataSource = Adodc1
    Adodc1.Refresh
DataGrid1.Visible = True
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me
Form3.Show
End Sub
Private Sub Command3_Click()
End
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Frame1.Visible = True
DataGrid1.Visible = False
End Sub
Private Sub Form_Load()
With cnn
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
End With
With rs
    .Open "Student10", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
End With
With rs
    Text1.Text = .Fields(0)
    Text2.Text = .Fields(1)
    Text3.Text = .Fields(2)
    Text4.Text = .Fields(3)
    Text5.Text = .Fields(4)
    Text6.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
    Text8.Text = .Fields(0)
    Text9.Text = .Fields(1)
    Text10.Text = .Fields(2)
    Text11.Text = .Fields(3)
    Text12.Text = .Fields(4)
    Text13.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
    Text15.Text = .Fields(0)
    Text16.Text = .Fields(1)
    Text17.Text = .Fields(2)
    Text18.Text = .Fields(3)
```

```
    Text19.Text = .Fields(4)
    Text20.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
    Text22.Text = .Fields(0)
    Text23.Text = .Fields(1)
    Text24.Text = .Fields(2)
    Text25.Text = .Fields(3)
    Text26.Text = .Fields(4)
    Text27.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
Text29.Text = .Fields(0)
    Text30.Text = .Fields(1)
    Text31.Text = .Fields(2)
    Text32.Text = .Fields(3)
    Text33.Text = .Fields(4)
    Text34.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
    Text36.Text = .Fields(0)
    Text37.Text = .Fields(1)
    Text38.Text = .Fields(2)
    Text39.Text = .Fields(3)
    Text40.Text = .Fields(4)
    Text41.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
    Text43.Text = .Fields(0)
    Text44.Text = .Fields(1)
    Text45.Text = .Fields(2)
    Text46.Text = .Fields(3)
    Text47.Text = .Fields(4)
    Text48.Text = .Fields(5)
rs.MoveNext
Text50.Text = .Fields(0)
    Text51.Text = .Fields(1)
    Text52.Text = .Fields(2)
    Text53.Text = .Fields(3)
    Text54.Text = .Fields(4)
    Text55.Text = .Fields(5)
End With
Dim tdate(10) As Date
tdate(0) = CDate(Text6.Text)
tdate(1) = CDate(Text13.Text)
tdate(2) = CDate(Text20.Text)
tdate(3) = CDate(Text27.Text)
tdate(4) = CDate(Text34.Text)
tdate(5) = CDate(Text41.Text)
tdate(6) = CDate(Text48.Text)
tdate(7) = CDate(Text55.Text)
Dim i, age(10), big, small(10) As Integer
big = Year(Date)
```

```
For i=0 To 7
small(i) = Year(tdate(i))
age(i) = big - small(i)
Next

Text7.Text = CStr(age(0)) + "  years"
Text14.Text = CStr(age(1)) + "  years"
Text21.Text = CStr(age(2)) + "  years"
Text28.Text = CStr(age(3)) + "  years"
Text35.Text = CStr(age(4)) + "  years"
Text42.Text = CStr(age(5)) + "  years"
Text49.Text = CStr(age(6)) + "  years"
Text56.Text = CStr(age(7)) + "  years"

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    rs.Close
    cnn.Close
End Sub
```

৪৭. ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Project→Add Form সিলেক্ট করে পরপর দুটি ফরম সংযোজন করতে হবে। ফরমগুলোর নাম হবে Form7 এবং Form8

৪৮. Form7 & Form8 -এর ডিজাইন হবে একই রকম কিন্তু কোড হবে ভিন্ন। তাই Form7-এ ডিজাইন সম্পন্ন করে Form7-এর সবকিছু Form8-এ কপি করতে হবে ।

৪৯. এবার Form7-এ টুলবক্স হতে ৪টি লেবেল, ২টি ফ্রেম, ১টি কম্বোবক্স, ১৩টি টেক্সট বক্স এবং ২টি কমান্ড বাটন সংযুক্ত করতে হবে। টেক্সট বক্সগুলো সারি অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজাতে হবে।

৫০. প্রথমে Frame1-এর উপর ৬টি লেবেল সংযুক্ত করতে হবে অতঃপর Frame2- এর উপরও ৬টি লেবেল সংযুক্ত করতে হবে ।

৫১. Form7 -এ সংযুক্ত অবজেক্টসমূহের জন্য নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেট করতে হবে।

Label1:
 Caption: Due Payment Information of Class Nine
 Font: Times New Roman Size: 20 Style: Bold Italic

Label2:
 Caption: Please Select Student ID to see Due Payment Information
 Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold Italic

Label3:
 Caption: Student ID
 Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label4:
 Caption: Student’s Name
 Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Frame1:
 Caption: Monthly Due Payment
 Font: Palatino Linotype Size: 11 Style: Bold

Frame2:
 Caption: Monthly Due Payment

Font: Palatino Linotype Size: 11 Style: Bold

Combo1:

Text: Select Student ID

Font: Palatino Linotype Size: 11 Style: Bold

Command1:

Caption: Back

Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold

Command2:

Caption: Exit

Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold

Frame1 -এ সংযুক্ত লেবেল সমূহের প্রপার্টি হবে নিম্নরূপ:

Lebel5:

Caption: January

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label6:

Caption: February

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label7:

Caption: March

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label8:

Caption: April

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label9:

Caption: May

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label10:

Caption: June

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Frame2 -এ সংযুক্ত লেবেল সমূহের প্রপার্টি হবে নিম্নরূপ:

Label11:

Caption: July

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label12:

Caption: August

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label13:

Caption: September

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label14:

Caption: October

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label 15:

Caption: November

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

Label16:

Caption: December

Font: MS Sans Serif Size: 10 Style: Bold

৫২. Frame1এবং Frame2-তে সংযুক্ত ১৩ টি টেক্সট বক্সের টেক্সট প্রপার্টি হতে টেক্সট মুছে ফেলতে হবে। প্রতিটি

TextBox-এর Font প্রপার্টি পরিবর্তন করে নিচের মতো করতে হবে।

Font: MS Sons Serif Size: 10 Style: Bold

ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর Form7 দেখতে নিম্নরূপ হবে–

৫৩. এবার ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে View→Code সিলেক্ট করে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে।

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim cnn2 As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim rs2 As New ADODB.Recordset

Sub Fill_TextBox()
With cnn2
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
 End With

 Dim id As Integer
 id = Combo1.Text

 With rs2
    .Open "Select * from Payment9 Where Payment9.StudentID='" & id & "'",
   cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
 End With
   With rs2
           Text1.Text = .Fields(1)
           Text2.Text = .Fields(3)
           Text3.Text = .Fields(4)
           Text4.Text = .Fields(5)
```

```
            Text5.Text = .Fields(6)
            Text6.Text = .Fields(7)
            Text7.Text = .Fields(8)
            Text8.Text = .Fields(9)
            Text9.Text = .Fields(10)
            Text10.Text = .Fields(11)
            Text11.Text = .Fields(12)
            Text12.Text = .Fields(13)
            Text13.Text = .Fields(14)
    End With

    cnn2.Close
    rs2.Close
End Sub
```

(Sub Fill_TextBox() একটি প্রোগ্রামার কর্তৃক প্রদত্ত সাব-প্রসিডিউর। প্রোগ্রামে একই কোড বারবার লেখার প্রয়োজন হলে তা বারবার না লিখে একটি সাব-প্রসিডিউরের ভেতর একবার লেখা হয়। যেখানে সাব-প্রসিডিউরের ভেতরের কোড প্রয়োজন হয় সেখানে ঐ সাব-প্রসিডিউরটাকে কল করা হয়। ভিজ্যুয়াল বেসিক যেখানে Call Fill_TextBox স্টেটমেন্ট পাবে তখন সে Sub Fill_TextBox() সাব-প্রসিডিউরে যা লেখা আছে সে কোডগুলো নিয়ে কাজ করবে এবং কাজ শেষে Call Fill_TextBox-এর নিচের লাইনে ফিরে আসবে।)

```
Sub
Private Sub Command1_Click()
Form7.Hide
Form4.Show
End Sub

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
With cnn
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
End With

With rs
     .Open "Select Payment9.StudentID from Payment9 Where
Payment9.Class='Nine'", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
End With

With rs
    Dim str As String
    Dim record, i, field As Integer
     record = rs.RecordCount               'Active-করা টেবিল থেকে সারি সংখ্যা বের করা
     For i = 0 To record - 1               'লুপের মাধ্যমে টেবিলের প্রতিটি সারির ১ম কলামের
     field = .Fields(0)                    'তথ্য String-এ রূপান্তর করে ComboBox-এর
     str = CStr(field)                     'Item হিসেবে যুক্ত করা
     Combo1.AddItem str
       rs.MoveNext
```

```
    Next
 End With
End Sub
Private Sub Combo1_Click()
Select Case Combo1.ListIndex
    Case 0
        Call Fill_TextBox
    Case 1
        Call Fill_TextBox
    Case 2
        Call Fill_TextBox
    Case 3
        Call Fill_TextBox
    Case 4
        Call Fill_TextBox
    Case 5
        Call Fill_TextBox
    Case 6
        Call Fill_TextBox
    Case 7
        Call Fill_TextBox
    Case 8
        Call Fill_TextBox
    Case 9
        Call Fill_TextBox
    End Select
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    rs.Close
    cnn.Close
End Sub
```

৫৪. এখন Form7 একটিভ থাকা অবস্থায় ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Edit→Select All সিলেক্ট করতে হবে। আবার মেনু থেকে Edit→Copy সিলেক্ট করতে হবে। এখন Form8-এ গিয়ে মেনু থেকে Edit→Paste সিলেক্ট করলে Form7-এর সবকিছু Form8-এ কপি হবে।

৫৫. Form8-এ Label1-এর Caption প্রপার্টি পরিবর্তন করে Due Payment Information of Class Ten করতে হবে।

৫৬. Form8-এর Code উইন্ডোতে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে।

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim cnn2 As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim rs2 As New ADODB.Recordset

Sub Fill_TextBox()
 With cnn2
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
End With
 Dim id As Integer
```

```
 id = Combo1.Text                          'ComboBox থেকে সিলেক্টেড আইটেমের টেক্সট্ নিয়ে
                                           'id তে define করা
With rs2
    .Open "Select * from Payment10 Where Payment10.StudentID='" & id &
   "'", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
 End With
    With rs2
            Text2.Text = .Fields(1)
            Text3.Text = .Fields(3)
            Text4.Text = .Fields(4)
            Text5.Text = .Fields(5)
            Text6.Text = .Fields(6)
            Text7.Text = .Fields(7)
            Text8.Text = .Fields(8)
            Text9.Text = .Fields(9)
            Text10.Text = .Fields(10)
            Text11.Text = .Fields(11)
            Text12.Text = .Fields(12)
            Text13.Text = .Fields(13)
            Text14.Text = .Fields(14)
    End With
    cnn2.Close
    rs2.Close

End Sub
Private Sub Command1_Click()
Form8.Hide
Form4.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
Private Sub Form_Load()
With cnn
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
 End With
 With rs
  .Open "Select Payment10.StudentID from Payment10 Where
   Payment10.Class='Ten'", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
 End With
 With rs
    Dim str As String
    Dim record, i, field As Integer
```

```
    record = rs.RecordCount
    For i = 0 To record - 1
       field = .Fields(0)
       str = CStr(field)
       Combo1.AddItem str
       rs.MoveNext
    Next
 End With
End Sub
Private Sub Combo1_Click()
Select Case Combo1.ListIndex
    Case 0
        Call Fill_TextBox
    Case 1
        Call Fill_TextBox
    Case 2
        Call Fill_TextBox
    Case 3
        Call Fill_TextBox
    Case 4
        Call Fill_TextBox
    Case 5
        Call Fill_TextBox
    Case 6
        Call Fill_TextBox
    Case 7
        Call Fill_TextBox
    Case 8
        Call Fill_TextBox
    Case 9
        Call Fill_TextBox
    End Select
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    rs.Close
    cnn.Close
End Sub
```

৫৭. নতুন একটি ফরম সংযোজন করতে ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Project→ Add Form সিলেক্ট করতে হবে । ফরমটির নাম হবে Form9.

৫৮. Form 9-এ দুটি কমান্ড বাটন, ১৪টি লেবেল, ১টি কম্বোবক্স এবং ১০টি টেক্সট বক্স সংযুক্ত করতে হবে ।

৫৯. Form 9-এ সংযুক্ত অবজেক্টসমূহের জন্য নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেট করতে হবে ।

Label1:
Caption: Teacher's Information
Font: Times New Roman Size: 20 Style: Bold Italic

Label 2:
Caption: Teacher's Name
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold

Label3:
Caption: Father's Name
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label4:
Caption: Address:
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label5:
Caption: Data of Birth:
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label6:
Caption: Age Today:
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label7:
Caption: Marital Status
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label 8:
Caption: Religion:
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label9:
Caption: Post
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label10:
Caption: Joining Date:
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label11:
Caption: Job Period
Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Visible: False

Label12:
    Caption: Teaching Subjects:
    Font: Palatino Linotype   Size: 12   Style: Bold
    Visible: False
Label13:
    Caption: Today's Date
    Font: Palatino Linotype   Size: 12   Style: Bold
Label14:
    Caption:
    Font: Palatino Linotype   Size: 12   Style: Bold
Combo1:
    Caption: Select Teacher's Name
    Font: Palatino Linotype   Size: 12   Style: Bold
Command1:
    Caption: Back
    Font: Palatino Linotype   Size: 16   Style: Bold
Command2:
    Caption: Exit
    Font: Palatino Linotype   Size: 16   Style: Bold

৬০. ১০টি টেক্সট বক্সের Text প্রপার্টি হতে Text মুছে ফেলতে হবে ।প্রতিটি টেক্সট বক্সের Font প্রপার্টি এবং Visible প্রপার্টি পরিবর্তন করে নিচের মতো করতে হবে ।

    Font: Palatino Linotype   Size: 11   Style: Bold
    Visible: False

ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর Form9 দেখতে নিম্নরূপ হবে–

৬১. এখন ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে View→Code সিলেক্ট করে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে–

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim cnn2 As New ADODB.Connection
```

```
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim rs2 As New ADODB.Recordset
Sub Fill_TextBox()
With cnn2
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
 End With
Dim id, monthtx, yeartx, monthtj As String
id = Combo1.Text
Dim month1, month2, monthtd, monthbd, monthjob As Integer
Dim year1, year2, yeartd, yearbd, yearjob As Integer
Dim datebd, datejob As Date
With rs2
    .Open "Select * from Teacher Where Teacher.Teacher_Name='" & id & "'",
   cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
End With
    With rs2
            Text1.Text = .Fields(2)
            Text2.Text = .Fields(3)
            Text3.Text = .Fields(4)
            Text5.Text = .Fields(5)
            Text6.Text = .Fields(6)
            Text7.Text = .Fields(7)
            Text8.Text = .Fields(8)
            Text10.Text = .Fields(9)
            monthtx = Text3.Text
            datebd = CDate(monthtx)
    yeartd = Year(Date)
   yearbd = Year(datebd)
   year1 = yeartd - yearbd
```

'বর্তমান তারিখ থেকে জন্ম তারিখ বাদ দিয়ে বয়স বের
'করতে বছর ও মাস আলাদা করে বের করা। টেক্সটবক্স
'৩ থেকে প্রাপ্ত তারিখ স্ট্রিং হিসেবে monthtx চলকে
'সংরক্ষণ করবে। datebd নামক Date টাইপের চলকে
monthtx-এর স্ট্রিংকে CDate ফাংশনের সাহায্যে Date
টাইপে রূপান্তর করে জমা করবে। yeartd চলকে
বর্তমান তারিখ (Date) থেকে Year() ফাংশনের
সাহায্যে শুধু সাল আলাদা করে জমা করবে। yearbd
চলকে datebd চলকে রাখা তারিখ থেকে Year()
ফাংশনের সাহায্যে সাল আলাদা করে জমা করবে।
বর্তমান সাল (yeartd) থেকে জন্ম সাল (yearbd)
বিয়োগ করে year1-এ রাখবে।

```
 monthbd = Month(datebd)
            monthtd = Month(Date)
```

```
        month1 = monthtd - monthbd
        If month1 < 0 Then
            monthtd = monthtd + 12
            month1 = monthtd - monthbd
            year1 = year1 - 1
        End If
       Text4.Text = CStr(year1) + " years " + CStr(month1) + " months"
                                  'বছর ও মাস TextBox4-এ প্রদর্শনের জন্য year1 ও
                                  'month1 চলককে String-এ রূপান্তর করে এদের
                                  'সাথে যথাক্রমে years ও months লেখা যোগ করা ।
        monthtj = Text8.Text
        datejob = CDate(monthtj)
        yearjob = Year(datejob)
        year2 = yeartd - yearjob
        monthjob = Month(datejob)
        monthtd = Month(Date)
        month2 = monthtd - monthjob
        If month2 < 0 Then
            monthtd = monthtd + 12
            month2 = monthtd - monthjob
            year2 = year2 - 1
        End If
        Text9.Text = CStr(year2) + " years " + CStr(month2) + " months"
        Text1.Visible = True 'TextBox-কে Form-এ দৃশ্যমান করা
        Text2.Visible = True
        Text3.Visible = True
        Text4.Visible = True
        Text5.Visible = True
        Text6.Visible = True
        Text7.Visible = True
        Text8.Visible = True
        Text9.Visible = True
        Text10.Visible = True
        Label3.Visible = True 'Label-কে Form-এ দৃশ্যমান করা
        Label4.Visible = True
        Label5.Visible = True
        Label6.Visible = True
        Label7.Visible = True
        Label8.Visible = True
  Label9.Visible = True
  Label10.Visible = True
  Label11.Visible = True
```

```
      Label12.Visible = True
    End With
    cnn2.Close
        rs2.Close
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Unload Me
Form2.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Label14.Caption = Date 'Label14-G eZ©gvb ZvwiL String wn‡m‡e †mU K†i
   cÖ`k©b
    With cnn
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
 End With
 With rs
    .Open "Select Teacher.Teacher_Name from Teacher", cnn, adOpenKeyset,
   adLockOptimistic
 End With
 With rs
    Dim str As String
    Dim record, i As Integer
    record = rs.RecordCount
    For i = 0 To record - 1
       str = .Fields(0)
       Combo1.AddItem str
       rs.MoveNext
    Next
 End With
End Sub
Private Sub Combo1_Click()
Select Case Combo1.ListIndex
    Case 0
        Call Fill_TextBox
     Case 1
        Call Fill_TextBox
```

```
    Case 2
        Call Fill_TextBox

    Case 3
        Call Fill_TextBox
            Case 4
        Call Fill_TextBox
    End Select
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    rs.Close
    cnn.Close
End Sub
```

৫২. ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Project→Add Form সিলেক্ট করে নতুন একটি ফরম সংযোজন করতে হবে। ফরমটির নাম হবে Form10.

৬৩. Form10 এ টুল বক্স হতে একটি লেবেল, দুটি ফ্রেম ও তিনটি কমান্ড বাটন যুক্ত করতে হবে।

৬৪. Form10-এ সংযুক্ত অবজেক্টসমূহের জন্য নিম্নলিখিত প্রোপার্টি সেট করতে হবে–

Label1:
  Caption: S.S.C Results
  Font: Times New Roman Size: 20 Style: Bold Italic
Frame1:
  Caption:
Frame2:
  Caption:
  Visible: False
Command1:
  Caption: Back
  Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold
Command2:
  Caption: Exit
  Font: Palatino Linotype Size: 16 Style: Bold
Command3:
  Caption: Show All
  Font: Palatino Linotype Size: 14 Style: Bold

৬৫. Frame 2-এ তিনটি লেবেল, একটি ফ্রেম, ৫৫টি টেক্সট বক্স সংযুক্ত করতে হবে। টেক্সট বক্সগুলো সারি অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।

৬৬. Frame 2-তে সংযুক্ত অবজেক্টসমূহের জন্য নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেট করতে হবে।

Label2:
  Caption: Exam Year
  Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold
Label3:
  Caption: Number of Candidates
  Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold

Label4:

Caption: Number of Passed Students

Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold

Frame3:

Caption: Results (in number)

Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold

৬৭. Frame 2-তে সংযুক্ত ৫৫টি টেক্সট বক্সের Text প্রপার্টি হতে Text মুছে ফেলতে হবে। প্রতিটি টেক্সট বক্সের Font প্রপার্টি পরিবর্তন করে নিচের মতো করতে হবে–

Font: Palatino Linotype Size: 12 Style: Bold

৬৮. Frame 3-এর মধ্যে একটি লেবেল সংযুক্ত করতে হবে। লেবেলটির প্রপার্টি হবে নিম্নরূপ–

Label5:

Caption: Percentage | Golden A+ | A+ | A | A- | B+ | B | B-

Font: Palatino Linotype Size: 10 Style: Bold

৬৯. Frame1-এর ভিতর ৩টি লেবেল, ১টি ফ্রেম, ১টি কম্বোবক্স ও ১০টি টেক্সটবক্স সংযুক্ত করতে হবে।

৭০. Frame1-এ সংযুক্ত অবজেক্টসমূহের জন্য নিম্নলিখিত প্রোপার্টি সেট করতে হবে।

Label6:

Caption: Exam Year

Font: Palatino Linotype Size: 10 Style: Bold

Label7:

Caption: Number of Candidates

Font: Palatino Linotype Size: 10 Style: Bold

Label8:

Caption: Number of Passed Students

Font: Palatino Linotype Size: 10 Style: Bold

Frame 4

Caption: Results (in number)

Font: Palatino Linotype Size: 10 Style: Bold

৭১. Frame1-এ সংযুক্ত ১০টি টেক্সট বক্সের টেক্সট প্রোপার্টি হতে টেক্সট মুছে ফেলতে হবে। প্রতিটি টেক্সট বক্সের Font প্রপার্টি পরিবর্তন করে নিচের মতো করতে হবে–

Font: Palatino Linotype Size: 10 Style: Bold

৭২. Frame 4 এর মধ্যে একটি লেবেল সংযুক্ত করতে হবে। যার প্রপার্টি হবে নিম্নরূপ–

Label9:

Caption: Percentage | Golden A+| A+ | A | A- | B+| B | B-

Font: Palatino Linotype Size: 10 Style: Bold

ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর Form10 পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নমুনার মতো দেখাবে–

৭৩. এখন ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে View→Code সিলেক্ট করে নিম্নলিখিত কোড লিখতে হবে।

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim cnn2 As New ADODB.Connection
Dim cnn3 As New ADODB.Connection
```

```
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim rs2 As New ADODB.Recordset
Dim rs3 As New ADODB.Recordset
Sub Fill_TextBox()
With cnn2
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
 End With
 Dim id As Integer
 id = Combo1.Text
 With rs2
    .Open "Select * from Result Where Result.Year=" & id & "", cnn,
   adOpenKeyset, adLockOptimistic
 End With
    With rs2
            Text56.Text = .Fields(1)
            Text57.Text = .Fields(2)
            Text59.Text = .Fields(3)
            Text60.Text = .Fields(4)
            Text61.Text = .Fields(5)
            Text62.Text = .Fields(6)
            Text63.Text = .Fields(7)
            Text64.Text = .Fields(8)
            Text65.Text = .Fields(9)
```

```
    End With
    Dim percent, big, small As Long
    big = CLng(Text56.Text)
                                        'TextBox56 I TextBox57-থেকে তথ্য নিয়ে
    small = CLng(Text57.Text)           'Percentage বের করা
    percent = (small * 100) / big
    Text58.Text = CStr(percent) + " %"
    cnn2.Close
    rs2.Close
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Unload Me
Form2.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
Private Sub Command3_Click()
With cnn3
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
 End With
With rs3
    .Open "Result", cnn3, adOpenKeyset, adLockOptimistic
 End With
 With rs3
    Text1.Text = .Fields(0)
    Text2.Text = .Fields(1)
    Text3.Text = .Fields(2)
    Text5.Text = .Fields(3)
    Text6.Text = .Fields(4)
    Text7.Text = .Fields(5)
    Text8.Text = .Fields(6)
    Text9.Text = .Fields(7)
    Text10.Text = .Fields(8)
    Text11.Text = .Fields(9)
    rs3.MoveNext
    Text12.Text = .Fields(0)
    Text13.Text = .Fields(1)
    Text14.Text = .Fields(2)
    Text16.Text = .Fields(3)
```

```
Text17.Text = .Fields(4)
Text18.Text = .Fields(5)
Text19.Text = .Fields(6)
Text20.Text = .Fields(7)
Text21.Text = .Fields(8)
Text22.Text = .Fields(9)
rs3.MoveNext
Text23.Text = .Fields(0)
Text24.Text = .Fields(1)
Text25.Text = .Fields(2)
Text27.Text = .Fields(3)
Text28.Text = .Fields(4)
Text29.Text = .Fields(5)
Text30.Text = .Fields(6)
Text31.Text = .Fields(7)
Text32.Text = .Fields(8)
Text33.Text = .Fields(9)
rs3.MoveNext
Text34.Text = .Fields(0)
Text35.Text = .Fields(1)
Text36.Text = .Fields(2)
Text38.Text = .Fields(3)
Text39.Text = .Fields(4)
Text40.Text = .Fields(5)
Text41.Text = .Fields(6)
Text42.Text = .Fields(7)
Text43.Text = .Fields(8)
Text44.Text = .Fields(9)
rs3.MoveNext
Text45.Text = .Fields(0)
Text46.Text = .Fields(1)
Text47.Text = .Fields(2)
Text49.Text = .Fields(3)
Text50.Text = .Fields(4)
Text51.Text = .Fields(5)
Text52.Text = .Fields(6)
Text53.Text = .Fields(7)
Text54.Text = .Fields(8)
Text55.Text = .Fields(9)
Dim str1(6), str2(6) As String
str1(0) = Text2.Text
str1(1) = Text13.Text
str1(2) = Text24.Text
```

```
    str1(3) = Text35.Text
    str1(4) = Text46.Text
    str2(0) = Text3.Text
    str2(1) = Text14.Text
    str2(2) = Text25.Text
    str2(3) = Text36.Text
    str2(4) = Text47.Text
    Dim i, percent(6), big(6), small(6) As Long
    For i=0 To 4
    big(i) = CLng(str1(i))
    small(i) = CLng(str2(i))
   percent(i) = (small(i) * 100) / big(i)
    Next
    Text4.Text = CStr(percent(0)) + " %"
    Text15.Text = CStr(percent(1)) + " %"
    Text26.Text = CStr(percent(2)) + " %"
    Text37.Text = CStr(percent(3)) + " %"
    Text48.Text = CStr(percent(4)) + " %"
End With
Frame2.Visible = True
Frame1.Visible = False
Command3.Visible = False
End Sub
Private Sub Form_Load()
With cnn
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "C:\Project\School Database.mdb"
    .Open
 End With
 With rs
    .Open "Select Result.Year from Result", cnn, adOpenKeyset,
   adLockOptimistic
 End With
 With rs
    Dim str As String
    Dim record, i, field As Integer
    record = rs.RecordCount
    For i = 0 To record - 1
       field = .Fields(0)
       str = CStr(field)
       Combo1.AddItem str
```

```
        rs.MoveNext
     Next
   End With
End Sub
Private Sub Combo1_Click()
Select Case Combo1.ListIndex
    Case 0
        Call Fill_TextBox
    Case 1
        Call Fill_TextBox
    Case 2
        Call Fill_TextBox
    Case 3
        Call Fill_TextBox
    Case 4
        Call Fill_TextBox
    End Select
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    rs.Close
    cnn.Close
    rs3.Close
    cnn3.Close
End Sub
```

৭৪. প্রজেক্টটি রান করার জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিকের মেনু থেকে Run→Start সিলেক্ট করতে হবে।

৭৫. এ যাবৎ সম্পাদিত প্রোগ্রামে অগ্রগামী উচ্চ বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয়ের প্রোজেক্ট তৈরি করা হয়েছে। এ প্রোজেক্টটি ইংরেজি Advance High School নামে সেভ করা যেতে পারে। প্রোজেক্টটির যাবতীয় কাজ শেষ হলে প্রজেক্টটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি এ্যাপ্লিকেশনে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এ জন্য File>Make Advance High School.exe ... সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে Make Project ডায়লগ বক্স আসবে। তাতে লোকেশন এবং ফাইলের নাম পরিবর্তন করে OK করতে হবে।

৭৬. Advance High School.exe নামক যে এ্যাপ্লিকেশন ফাইলটি তৈরি হয়েছে তার উপর ডবল-ক্লিক করলে এ্যাপ্লিকেশনটি রান করবে।

৭৭.সদ্য তৈরি করা Advance High School.exe এ্যাপ্লিকেশনটি সমাপ্ত করার জন্য তাতে অবস্থিত Exit বোতামে ক্লিক করতে হবে।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জ্ঞান মানুষের অন্তরকে
আলোকিত করে।

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জ্ঞান মানুষের অন্তরকে
আলোকিত করে।

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য